গিরিশচন্দ্র

অমরেন্দ্রনাথ

অৰ্দ্ধেন্দুশেখর

গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথ অর্দ্ধেন্দুশেখর

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ



পারুল প্রকাশনী

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৬৪৭৪

আখাউড়া রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১, ফোন : ২৩৮৬৯৪৭

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ শিবেন্দু সরকার

অক্ষরবিন্যাস এ.বি.সি. কম্পিউটার সেন্টার ৩২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০ ০০৯

পারুল প্রকাশনীর পক্ষে ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীমতী রত্না সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
চারু প্রেস ১১৩/বি ধনদেবী খান্না রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪
থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

"ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি জাতীয় সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার সম্পূর্ণ পরিচায়ক।" "চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে নাটক সর্বোত্তম; ভাষার চরমোৎকর্ষের নিদর্শন নাটকের ভিতরেই মিলে।" "নাট্যবিদ্যা সাহিত্যের পূর্ণ পরিপুষ্টির পরিচায়ক।" "রঙ্গালয় একটি বিশিষ্ট শিক্ষাস্থান, বিলাস বিভ্রমের আসর নহে। স্কুল কলেজের অধ্যয়ন অপেক্ষা এখানকার পাঠাভ্যাস গুরুতর।" "বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকের অপেক্ষা একজন নাট্যাচার্যের প্রতিভা কোনও অংশে ন্যূন নহে।" "জাতীয় নাট্যকলাই জাতীয় ভাষার চরমোৎকর্ষের নিদর্শন এবং অভিনেতৃগণ উহার প্রধানতম বিশ্লেষণকর্তা।" "বিনোদিনী, তারাসুন্দরী ও তিনকড়ির ন্যায় অভিনেত্রীদের অভিনয় প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য কোনো বিদ্যাবানের প্রতিভার দীপ্তি হইতে ন্যূন নয়।"

উপরোক্ত সাহসী, সুচিন্তিত এবং বাঙালি শিক্ষিত সমাজে অপ্রচলিত প্রস্তাবগুলি গত শতকের প্রথম পাদে যিনি লিখেছিলেন তিনি নিজে ছিলেন সে যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মনীষী— চল্লিশ বছর ধরে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশব্যাপৃত। রায়েরকাঠি রাজবংশের সন্তান উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৮৬৭-১৯৫৯) উচ্চশিক্ষার অভিলাষে প্রথম যৌবনে কলকাতায় আসেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পান। 'বিদ্যাভূষণশাস্ত্রী' উপাধি অর্জনের পর তাঁর অধ্যাপনার জীবন শুরু হয়। সহকর্মী এবং বন্ধু ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭-১৯০৮)। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হেরম্বচন্দ্রের মত রঙ্গমঞ্চবিদ্বেষী ছিলেন না। একদিকে যেমন সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত ইতিহাস বিষয়ে তাঁর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য বলে নির্বাচিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই তাঁর সমকালের প্রধান প্রধান নাট্যকার, নাট্যাচার্য এবং নটনটীদের সঙ্গেও তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভাবতে কিছুটা বিস্ময় লাগে যে রঙ্গজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সিটি কলেজে তিনি চার দশক আপন বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক পদে সবিশেষ সম্মানের সঙ্গে শিক্ষাদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রোজ্জ্বল চরিত্র সম্পর্কে কখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

আমি উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কনিষ্ঠ সন্তান এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত তাঁর মুখ্য বইগুলি আমার জন্মের কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে লন্ডনে গবেষণা কালে আমি প্রথম বাংলায় রচিত তাঁর এই বইগুলির সন্ধান পাই I.F. Blumhardt and

I.V.S. Wilkinson সম্পাদিত Second Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum Acquired During the years 1911-1920 তালিকা সংকলন গ্রন্থে।

এই তালিকাতে উপেন্দ্রনাথ রচিত পাঁচটি গ্রন্থের উল্লেখ ছিল : **গিরিশচন্দ্র** ১৩২১ (১৯১৯), **তিনকড়ি,** ১৩২৬ (১৯১৯), **অমরেন্দ্রনাথ** ১৩২৬ (১৯২০), **বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী** ১৩২৬ (১৯২০) এবং **দ্বিজেন্দ্রলাল**, ১৩২৬ (১৯২০)। পরে তাঁর রচিত **অর্দ্ধেন্দুশেখর** (১৩২৭) বইটির সন্ধান পাওয়া যায়। আমার উদ্যোগী এবং তন্নিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী অশোককুমার রায়ের প্রচেষ্টায় **তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী**র প্রথম সংস্করণের কপি সংগৃহীত হয়ে একত্রে গ্রন্থিত রূপে ১৯৮৫ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পূর্বে **দ্বিজেন্দ্রলাল** গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এবারে আবার শ্রীমান অশোকেরই উদ্যোগে **গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ** এবং **অর্দ্ধেন্দুশেখর** একত্রে গ্রথিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

॥ ২ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ছিলেন সর্বস্বীকৃতভাবে তাঁর যুগের প্রধান নট, নাট্যাচার্য এবং অন্যতম প্রধান নাট্যকার। তাঁকে স্বশিক্ষিতই বলা চলে; সে যুগের এনট্রান্স পরীক্ষার বেড়া তিনি পার হতে পারেননি। কিন্তু নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যশাস্ত্র নিয়ে তিনি গভীরভাবে চর্চা করেছিলেন এবং প্রতিভার সামর্থ্যে তিনি সমকালে যেমন ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তেমনই ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁর চরিত্রে গভীর স্ববিরোধ ছিল। উপেন্দ্রনাথ তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি। কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে তিনি পূর্ণ মূল্য দিয়েছেন। আমার মার কাছে শুনেছি বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। স্বশিক্ষিত গিরিশচন্দ্র তাঁর কোন কোন নাটকের পাণ্ডুলিপি (যা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মুখে শুনে অন্য কেউ কপি করে দিত) নিয়ে দুই দশকের বেশি বয়োকনিষ্ঠ অধিবিদ্য অনুরাগীটির কাছে আসতেন- -কখনো বানান কখনো ব্যাকরণ কখনো অলঙ্কার, কখনো ছন্দ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শের জন্য। উপেন্দ্রনাথ শুধু গিরিশচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত লেখেননি, নাট্যকার হিসাবে তাঁর কৃতি এবং বিকাশের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনা অনুসারে গিরিশপ্রতিভার বিকাশে তিনটি পর্ব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বিচারে "গিরিশ নাট্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বঙ্গ রঙ্গালয়ে ইয়ুরোপীয় নাট্যকলার অনুপ্রবেশনে বঙ্গ নাট্যাবলী ও রঙ্গালয়ের অপ্রত্যাশিত রূপ অভ্যুন্নতিই প্রধান লক্ষণ।" এই অনুপ্রবেশ কাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেলকে এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে নানাভাবে সম্পন্নতা দান করে। গিরিশ পূর্বোক্তদের মতো বহুবিদ্য না হওয়া সত্ত্বেও এই অনুপ্রবেশ তাঁর ক্ষেত্রেও বিশেষ সুফলপ্রসূ হয়।

বাংলায় নাট্যজগতে গিরিশ প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল পর্বে পর্বে। তাঁর চাইতে বয়সে বত্রিশ বৎসরের কনিষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) দেখা দিয়েছিলেন মহাগতিশীল প্রোজ্জ্বল উল্কারূপে। প্রচণ্ড তাঁর প্রতিভার পিছনে ছিল ফ্রয়েড যাকে বলেছেন Thanatos

বা মর্তুকাম বৃত্তি। অপরপক্ষে তাঁর অগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) ছিলেন স্থিতধী, মধ্যপন্থী দার্শনিক ও অ্যাটর্নি। হীরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত পুত্র কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০) ইংরাজীতে লেখা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পিতা এবং পিতৃব্যের অবিস্মরণীয় দুটি ছবি রেখে গেছেন। সেখানে স্পষ্ট যে প্রাজ্ঞ পিতাকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করলেও উদ্দাম ও বেহিসেবী খুল্লতাত তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছিলেন। অমরেন্দ্র অল্প বয়সেই মনস্থির করেন রঙ্গমঞ্চে সাধনাই তাঁর জীবনের উপজীব্য। নানা বাধা এবং ওঠাপড়ার ভিতর দিয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে নট, নাট্যাচার্য এবং নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে প্রতিভার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার মিশ্রণ ঘটেছিল। অভিনেতা হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু অমিতাচারের ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং নিতান্ত অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। উপেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রের চারিত্রিক ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিনয়-প্রতিভা এবং রঙ্গমঞ্চ সাধনায় একাগ্রতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। অমরেন্দ্রনাথ "সর্ববিধ অভিনয়-কলা এবং থিয়েটার পরিচালনায় অসাধারণ শক্তিমত্তার প্রদর্শনে নাট্যামোদি মাত্রেরই হৃদয়-কন্দরে পূর্ণ আনন্দ বিধান করিয়া গিয়াছেন"। দুর্ভাগ্য বশত উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষার অভাবে অকালে তাঁর প্রতিভার পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি অনেকগুলি নাটক, গীতিনাট্য, গীতিকবিতা এবং একাধিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উৎকষ অর্জন করেনি।

উপেন্দ্রনাথ তৃতীয় যে মানুষটিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১৮৫০-১৯০৯) ছিলেন একাধারে গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহকর্মী এবং মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি নাট্যকার ছিলেন না, কিন্তু নট এবং নাট্যাচার্য হিসাবে তাঁর খ্যাতি সমতুল্য ছিল। তবে দুজনের অভিনয় রীতিতে পার্থক্য ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরের গুণাবলীকে বিশেষ মূল্য দিতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রে অভিনয় করতেন। তবে কৌতুক অভিনয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাছাড়া "সাহেব" চরিত্র অভিনয়েও তাঁর জুড়ি ছিল না।

উপেন্দ্রনাথের এই তিনটি জীবনী গ্রন্থে বাংলার রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগের অনেকটাই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তবে জীবনী ছাড়াও এখানে নাটক এবং অভিনয় বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং আলোচনা আছে। সৌভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে সমকালীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহেন্দ্রকুমার মিত্র এবং উপেন্দ্রকুমার মিত্র ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং সুহৃদ, আর মনোমোহন পাঁড়ে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। নট, নাট্যকার এবং নাট্যাগারের কর্তৃপক্ষ সকলেই তাঁর সুচিন্তিত মতামতকে বিশেষ মূল্য দিতেন। আমার শৈশব এবং কৈশোর কালে আমি পিতার সঙ্গে নিয়মিত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গেছি, এবং সেই সূত্রে রঙ্গমঞ্চ যে বিচিত্র শিল্পকলার এক মহাসমৃদ্ধ সমাবেশ তা ক্রমে বুঝতে শিখেছি। উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নাটক পাঠে পাঠকের চিত্তে যে ভাবের খানিকটামাত্র উন্মেষ হয়, অভিনয় দর্শনে তাহা পূর্ণোদ্বেলিত হইয়া লহরে লহরে সমস্ত চিত্তকন্দর ছাপাইয়া ফেলে। অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শক

তন্ময় হইয়া যায়। তাই সমগ্র কাব্য সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের স্থান সর্বপ্রথম। এসকাইলাস, সফক্লিস, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্‌স্‌পীয়র, মলিয়ের, রাসিন, ইবসেন, মেতরলিঙ্ক, কল্ডিরন প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যকারগণ বিশ্বপূজ্য।" আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে প্রতিভাবান নটনটীর অভাব না ঘটলেও এখনও পর্যন্ত খুব বেশী উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নি। অবশ্য এটি আমার নিজের ধারণা। পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নাট্যকার হিসাবে খুবই উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন।

শ্রীমান অশোক এবং পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত গৌরদাস সাহা মহাশয় উদ্যোগী হয়ে এই দুর্লভ এবং মূল্যবান বই তিনটি একত্রে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য বঙ্গ সংস্কৃতির অনুরাগী মাত্রেরই তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

—শিবনারায়ণ রায়

রুদ্র-পলাশ
৬৩, পূর্বপল্লী,
শান্তিনিকেতন
১৪.০২.২০০৭

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী (১৮৬৭-১৯৫৯)
জীবনকথা

বঙ্গ-ভারতীয় একনিষ্ঠ সাধক, স্বনামধন্য সংস্কৃতবিদ্, আদর্শ শিক্ষাব্রতী, বাংলায় সর্বস্তরে সর্বজাতির জন্য সংস্কৃত শিক্ষার তথা বেদপাঠের অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ, বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় ন্যূনাধিক অর্ধশত গ্রন্থের রচয়িতা এবং বেদ, বেদান্ত, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর বরিশাল জেলার অন্তর্গত রায়ের কাঠির রাজ-পরিবারে। বাংলার বারভূঞিয়াদের অন্যতম এই পরিবারের রাজা কিঙ্কর, রাজা শ্রীরাম, রাজা রুদ্রনারায়ণ ও রাজা জয়নারায়ণ রায়চৌধুরীর পাণ্ডিত্য, বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্মপরায়ণতা এবং সামাজিক হিতৈষণার প্রতীক রূপে বঙ্গের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সেই বংশেরই উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং উদারতা একদিকে যেমন উপেন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে অন্যদিকে কিশোর উপেন্দ্রনাথের একদা (কলিকাতায়) অভিভাবক তথা শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় সংস্কৃত কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের কাছে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ গ্রহণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রক্ষিত হয়েছে সারা জীবন।

রায়ের কাঠি রাজবংশ অতীতে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং প্রতিপত্তিপূর্ণ থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতেই দানশীলতা ও নানা বিপর্যয়ের ফলে তাঁর পিতা রাজা শশিভূষণ পূর্বের রাজ ঐতিহ্য বজায় বাখতে পারেননি। মেধাবী ছাত্র উপেন্দ্রনাথ বরিশাল জেলাস্কুল, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যখন যেখানেই ছাত্র ও গবেষকরূপে জ্ঞানার্জনে যুক্ত ছিলেন, সরকারি বৃত্তিসহ নানা কৃতিত্বের সাক্ষরস্বরূপ পুরস্কার, পদক লাভ করেছিলেন। জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টর গোল্ডস্টুকারের অধীনে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও ব্যাখ্যা নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেন তা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে বিদ্বজ্জন সমাজে ভূয়সী প্রশংসিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃতে উভয় বিষয়ে প্রথম শ্রেণির অনার্স প্রাপ্ত হন বি. এ. পরীক্ষায়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী প্রমুখ অধ্যাপকগণের সুপারিশক্রমে সংস্কৃত কলেজ থেকে ভারত সরকারের শিক্ষা-সচিবের অনুমোদন ক্রমে বিদ্যাভূষণ ও শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন। কৃতী ছাত্র উপেন্দ্রনাথের কর্মজীবনও উজ্জ্বল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৮-র মধ্যভাগ পর্যন্ত অধুনালুপ্ত কলিকাতার সেঞ্চুরি কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মনীষী আনন্দমোহন বসুর আহ্বানে নব প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃথক বিভাগ [অনার্স] খোলা হলে তিনি সংস্কৃত বিভাগের সঙ্গে বাংলা বিভাগেরও প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের অবসর গ্রহণের

সূচি

গিরিশচন্দ্র



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সূচনা

জন্ম ও শৈশব

"God manifests himself to us in the first degree through the life of the universe and in the second through the thought of man. The second manifestation is not less holy than the first. The first is named *Nature*, the second is named *Art*. Hence this reality : The poet is a priest. Art is the second branch of Nature. Art is as natural as Nature. God creates Art by man, having for a tool the human intellect. The great workman has made this tool for himself."—Victor Hugo.

'অষ্টম গর্ভেতে জন্ম দৈবকী-নন্দন।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জননী দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টমগর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই জননীর অষ্টম গর্ভে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার জীবন কোন না কোন একটা বিশেষত্বে মণ্ডিত হইয়া উঠে। আজ আমরা যে মহাপুরুষের কথার অবতারণা করিতে যাইতেছি, তিনিও জননীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। তিনি যে অপূর্ব্ব অলোকসামান্য নিত্য নবভাবোন্মেষিণী ঐশী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার ক্রমবিকাশে বাঙ্গালায় নাট্যসাহিত্য শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনের পূর্ণোচ্ছ্বাসে এক্ষণে জগতের সৎসাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,— এমন কি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যশঃ-সৌরভে কেবল বাঙ্গালা নহে, ভারতবর্ষ নহে, সুদূর ইয়ুরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত আমোদিত, তাহার সেই দিব্য প্রতিভা-প্রসূত অমল ধবল কীর্ত্তিকৌমুদী, যতদিন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বিদ্যার আসন সর্ব্বোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে বিশ্বসমাজে অক্ষয়, অবিনশ্বর বরেণ্য করিয়া রাখিবে। বস্তুতঃ জীবদেহ কালের করাল কবলে ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু তদীয় অমরকীর্ত্তি চিরস্থায়ী। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, সেক্সপীয়র কত শত বৎসর হইল ভবধাম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরদিন তাহাদিগকে লোকসমাজে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিবে, কেননা 'কীর্ত্তিযস্য স জীবতি।'

এক ভ্রাতা ও ছয় ভগিনীর জন্মগ্রহণের পর জননীর অষ্টম গর্ভে ১২৫০ সাল, ১৫ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথি, রোহিণী নক্ষত্রে অতি শুভদিনে শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমান্বয় ছয় কন্যার জন্মের পর আবার পুত্র, কাজেই সে পুত্রের জন্মে বাড়ীর সকলেই এক মহানন্দে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জ্যেঠামহাশয় একজন সেকালের উদার প্রাণ সদানন্দ লোক ছিলেন। তিনি শিশুর জন্ম-সংবাদ পাইবামাত্র আনন্দে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'ওরে এ ছেলে নিশ্চয়ই আমাদের বংশ উজ্জ্বল কর্ব্বে। এই তিথি নক্ষত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, তফাৎ কেবল এ শুক্লপক্ষ আর সে কৃষ্ণপক্ষ।' তিনি শিশুর জন্মগ্রহণে এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, সে দিন যে যাহা চাহিয়াছিল, তাহাকেই তাহা মুক্তহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন,—এমন কি প্রবাদ আছে তিনি বাদ্যকরগণকে গায়ের শাল পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়াছিলেন। এই সংবাদ লোক মুখে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় নানাস্থান হইতে বাদ্যকরগণ আসিয়া প্রায় একমাস কাল কলিকাতার বাগবাজারস্থিত বসুপাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ জননীর স্তন্যপান গিরিশচন্দ্রের জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জননীর কঠিন পীড়া হয়। সে রোগ দিন দিন এমনি বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই নবশিশুকে লালন পালন করিবার জন্য সূতিকাগারে একটা স্ত্রীলোকের আবশ্যক হয়। বাটীতে উমা নামে এক বাগ্‌দীর মেয়ে বাসন মাজিত, সে কাজ হইতে অবসর দিয়া, নবশিশুর লালন পালনের ভার তাহারই উপর অর্পিত হইল। গিরিশচন্দ্র সেই উমা বাগ্‌দিনীর স্তন্যপানে দিন দিন এই বিশ্বের বুকের উপর ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিলেন।*

আদর যত্নের কোনও অভাব না থাকিলেও দুঃখ গিরিশচন্দ্রের নিত্য সহচর ছিল। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই দুঃখ যেন তাহাকে এক মহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সূতিকাগারে মাতৃস্তন্য পানে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাহার পর যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এক একটী নূতন আঘাতে তাঁহার সুকুমার শিশু-হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার মত হইয়াছিল।

তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই সংসারের মাথা তাঁহার জ্যেঠা মহাশয় ও ছোট ঠাকুরদাদা সমস্ত সংসারে হাহাকার তুলিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাহার পর হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি যে কত আঘাত সহ্য করিয়াছেন

---

* 'গোবরা' শীর্ষক গল্পে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিজের নব শৈশবের আভাস দিয়াছেন—'গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ, ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে নবজাত শিশুর নিমিত্ত 'মাই-দিউনী' পাওয়া যায় না। এক মা বাগ্‌দিনী,—মণি তার নাম, হাসপিটালে প্রসব করিয়া সেই দিনই আসিয়াছে ছেলেটা দুই ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল মাত্র। বাগ্‌দিনী নব শিশুর মাই-দিউনী হইল।' গিরিশচন্দ্র অনেক সময়ে দাস-দাসীদের অপরাধে গুরুতর ভর্ৎসনা করিয়া আবার ক্রোধ থামিয়া গেলে হাসিয়া বলিতেন—'বাগ্‌দিনীর দুধ পেয়েছি বলে এমনি স্বভাব হয়েছে নাকি।' গিরিশ প্রসঙ্গ—১৪০ পৃষ্ঠা।

তাহার সংখ্যা হয় না। তথাপি তিনি একদিনের জন্যও নিজের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই, আজীবন নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহারা কাল-চক্রে নিয়ত পরিবর্ত্তমান এই সংসারে উজ্জ্বল অবিনশ্বর কীর্ত্তিময়ূখ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই জীবনযাত্রা প্রভাত হইতেই তুমুল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, কেহই স্নিগ্ধ মসৃণ নির্দ্বন্দ্ব শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। অনন্ত লীলাময় জগদীশ্বরের বোধ হয় লোক-পরীক্ষার এ এক অদ্ভুত লীলা। সেক্‌স্‌পীয়র, মোলেয়ার, ষ্টিফেনসন, ওয়াট, গুরুদাস, বিদ্যাসাগর সকলকেই জীবনে প্রতিপদে সংসারের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ অমাবস্যার অঞ্জন-নিবিড় তিমিরের অবসানে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ সুধা-ধবল কিরণমালার ন্যায় দারুণ দুঃখান্তে বিমল সুখধারা বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর, বড় হৃদয়ঙ্গম, বড় উপভোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাল্যে গিরিশচন্দ্রের আদর ও যত্নের অভাব ছিল না। বাটীর সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, ভাল বাসিতেন। পিতার তিনি 'নয়নের মণি' ছিলেন। কোন দিনই তাহার কোন আবদার পিতার নিকট অগ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিশচন্দ্রের কেমন যেন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, জননী তাঁহাকে একেবারেই দেখিতে পারেন না। সে ধারণা হইবার যে কোন হেতু ছিল না তাহা নহে। তিনি যখনই তাঁহার জননীর নিকট একটু আদর পাইবার আশায় গমন করিতেন তখনই তিনি তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। যদি কোন দিন গিরিশচন্দ্রের জননী শুনিতেন যে তিনি কাহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। জননী নানাবিধ তিরস্কার করিয়া, অবশেষে তাহার মুখে গোময় পুরিয়া দিতেন। জননী তাহাকে দেখিতে পারেন না, ভালবাসেন না—এইটাই ছিল গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা মনের দুঃখ—প্রাণের আফসোস। কিন্তু তাঁহার এই দুঃখ কেমন করিয়া ঘুচিয়াছিল, সেই ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন কিছুতেই আমরা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় নয় বৎসর, সুতরাং লোকের কথাবার্ত্তার সারগ্রহণ করিবার মোটামুটি ক্ষমতা জন্মিয়াছে। সহসা একদিন তাঁহার গাল-গলা ফুলিয়া ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়া পড়ে। জ্বরের 'অঘোরে' তিনি শুনিলেন তাঁহার জননী তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন, "তুমি যেমন করে পার গিরিশকে বাঁচাও।" গিরিশচন্দ্রের পিতাও জানিতেন তাঁহার স্ত্রী গিরিশকে দেখিতে পারেন না। সুতরাং এই কথা শুনিয়া তিনি যেন একটু বিস্মিত স্বরে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিত গিরিশকে মোটেই দেখতে পার না, তুমি তবে এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন?" পতির এই প্রশ্নে স্নেহময় জননীর নয়নপল্লব অশ্রুজলে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল। তিনি অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি রাক্ষসী, একপুত্র খেয়েছি। গিরিশ আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান, পাছে আমার দৃষ্টিতে কোনও অমঙ্গল হয়, তাই আমি ওকে কাছে আসতে দিতুম না, এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম। কোন দিন কোলে করিনি, কখনও একটা মিষ্টি কথা বলিনি,

আমার 'হেনেস্তায়' বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" * জননীর প্রাণফাটা কথাগুলি শুনিয়া এক অভিনব আনন্দে গিরিশচন্দ্রের সমস্ত প্রাণটী ভরিয়া গেল, তাঁহার নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়িয়া পড়িতে লাগিল। এতদিনে তাঁহার বিষম ভুল ভাঙ্গিল, তিনি বুঝিলেন, জননী তাহাকে কত ভাল বাসেন। মাতার এই অসীম অনুপম ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া তিনি রোগের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রের জীবনে দুঃখ ও বিপদের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু স্নেহ ও ভালবাসার অভাব কোন দিনই তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। শেষ দিন পর্য্যন্ত ভক্তি, স্নেহ ও ভালবাসা তাঁহাকে ঘিরিয়াছিল। এ সৌভাগ্য হইতে তিনি কোন দিন বঞ্চিত হন নাই।

পিতা নীলকমলের গিরিশই ছিলেন প্রাণ। পুত্রের মুখ ভার দেখিলে তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিতেন। একদিন তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গিরিশ কাঁদিতেছে। পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া নীলকমল বাবুর মেজাজ একেবারে খারাপ হইয়া গেল। তিনি সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন 'গিরিশ কাঁদ্‌ছে কেন?'

নীলকমল বাবুর জ্যেষ্ঠ ভাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিই দেবরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—'কি জানি ঠাকুরপো, তেষ্টা পেয়েছে বল্‌ছে, কিন্তু জল দিলে খাবে না, বড় বেয়াড়া ছেলে।'

নীলকমল বাবু পুত্রের দিকে ফিরিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরি, তেষ্টা পেয়েছে, তবে জল খাচ্ছিস নি কেন?"

গিরিশ অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "জল খাবার তেষ্টা নয়, বাবা!"

নীলকমল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি খাবার তেষ্টা রে?"

গিরিশচন্দ্র মুখ ভার করিয়া উত্তর দিল—"শশা খাবার তেষ্টা।"

নীলকমল বাবু তখনই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, শিগ্‌গির বাজার থেকে একটা শশা কিনে নিয়ে আয়।"

গিরিশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আমার বাজারের শশার তেষ্টা নয়, বাবা।"

পুত্রের কথায় নীলকমল বাবুর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল, তিনি জিজ্ঞাসিলেন "তবে আবার কি শশা?"

গিরিশচন্দ্র ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলেন—"খিড়্‌কীর বাগানে যে শশা হয়েছে।"

---

* 'গোবরা' গল্পেও গোবরার মা' তা'র স্বামীকে বলিতেছে—'উমো (অর্থাৎ গোবরা) বড় অভাগা, এক দিনও স্তন দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম।" গিরিশচন্দ্রের অশোক নাটকেও কবিবর একই কথা, অশোখ জননী সুভদ্রাঙ্গীর মুখে অশোককে শুনাইয়াছেন। অশোক ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক দেখ।

খিড়্কীর বাগানের শশার কথা শুনিয়া নীলকমল বাবু ভৃত্যকে খিড়্কীর বাগান হইতে শশা তুলিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু এই শশাটা গিরিশচন্দ্রের জ্যাঠাইমা বাটীর বিগ্রহ শ্রীধরকে দিবেন সঙ্কল্প করিয়া বাটীর প্রত্যেক বালক বালিকাকে বিশেষ শাসন বাক্যে বলিয়া দিয়াছিলেন, এই শশাটীতে কেহ যেন হাত না দেয়, গাছের প্রথম ফল, এটী তিনি শ্রীধরকে দিবেন। গিরিশচন্দ্রের সেই শশা খাইবার 'তেষ্টা' শুনিয়া তিনি মহা রাগতস্বরে বলিলেন, "ও শশা আমি শ্রীধরকে দেব বলে রেখেছি। ওমা, সেই শশা খাবার জন্যে কান্না? ঠাকুর পো, ও শশা তুমি ওকে দিও না, যা ধরবে তাই!"

পুত্রবৎসল পিতা ভ্রাতৃজায়ার কথার উত্তরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বড় বউ, বালক যার জন্যে এত করে কাঁদ্ছে, ঠাকুর কি তা কখন তৃপ্তি করে খাবেন?"

দেবরের কথায় বড় বৌ আর কোন কথা কহিলেন না, তিনি কেবল মুখখানি ভার করিলেন।

ভৃত্য যাইয়া শশা তুলিয়া আনিল। গিরিশচন্দ্র শশাটী খাইয়া তবে সুস্থ হইলেন।

গিরিশচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই কেমন যেন স্বভাব ছিল, তাঁহাকে যেটী নিষেধ করা যাইত, সেইটীই করিবার জন্য তিনি একেবারে ব্যগ্র, অস্থির হইয়া উঠিতেন। শেষজীবন পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে চালিত হইয়া আসিয়াছেন।†

গিরিশচন্দ্রের খুল্ল পিতামহী অর্থাৎ ছোট ঠাকুর মা অতি চমৎকার রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প বলিতে পারিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বাটীর বালক বালিকারা তাহাকে ঘিরিয়া বসিত। তিনি তাহাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে নানাবিধ গল্প বলিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার ছোট ঠাকুর মা গল্প করিতে করিতে বলিলেন, 'কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন।' বালক গিরিশচন্দ্র তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে এলেন?"

পিতামহী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আবার কবে এলেন কিরে! আর তিনি এলেন না।"

গিরিশচন্দ্রের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর এলেন না?"

পিতামহী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

বার বার তিনবার একই উত্তর শুনিয়া গিরিশচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার আর গল্প শোনা হইল না, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

অনেক পীড়া-পীড়ি সত্ত্বেও তিনি বহুদিন আর তাঁহার ছোট ঠাকুরমার নিকটে গল্প

---

† গিরিশচন্দ্র নিজের এই ভাবটি তাঁহার চৈতন্যলীলায় নিমাই-এর বাল্যলীলায় বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শুনিতে যান নাই, এমন কি তৎপরে বহুশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করা সত্ত্বেও প্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত কোন দিন তিনি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-লীলা পাঠ করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মকথা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কোন দিনই তাহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত আগা-গোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এমন কি শেষ বয়স পর্য্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের অনেক স্থান অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

শৈশবে পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া সপ্তম বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন। তথায় অতি অল্পদিন মাত্র পাঠ করিয়া তিনি সে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হ'ন। গিরিশচন্দ্রের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃত্য গোপালের মৃত্যু হয়, তাহার পর একাদশ বৎসর বয়সে স্নেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করেন,* চতুর্দ্দশ বর্ষে পুত্রগতপ্রাণ পিতাও তাহাকে চিরদিনের মত ফেলিয়া স্বস্থানে চলিয়া যান। এই কয়েক বৎসরের ভিতর উপর্য্যুপরি আঘাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। ফলতঃ প্রতিভাবান্ মনীষীদিগের উপরে বিধাতার এইরূপ অভিশাপ সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা যায়; বাণভট্টও গিরিশচন্দ্র শোকের অতল বারিধি মধ্যে, সেক্সপীয়র ও মোলেয়ার দৈন্যের মহামরু-বক্ষে বাল্য হইতেই পরিবর্দ্ধিত। এই অভাবনীয় শোকপরম্পরায় গিরিশচন্দ্রের লেখাপড়াও বিশেষ ক্ষতি হইল। স্কুলে তিনি নাম মাত্র যাইতেন কেবল কিন্তু পাঠ্য পুস্তক একদিনের জন্যও খুলেন নাই। সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বরের নিখিল বিধান পরিণামে জগতের পরম হিতকর। গিরিশচন্দ্র যদি বাল্যে মাতৃ-পিতৃ-হীন না হইতেন তাহা হইলে তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অভিনয় কার্য্যে যোগদান করা কিছুতেই সম্ভব হইত না। † সুতরাং যে প্রতিভার বহ্নি তাঁহার ভিতরে স্ফুলিঙ্গাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, কালে সুদহ ইন্ধন ও অনুকূল সমীরের অভাবে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইত এবং বঙ্গ নাট্যশালা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইত।

বিশ্ববিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধান বৈচিত্র! ঠিক দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে হিরণ্যবাহু নদের (বর্ত্তমান শোণ) তীরে অবস্থিত প্রীতিকূটে ঠিক এইরূপ আর একটি তরুণ বালক কৈশোরে চতুর্দ্দশে জনক-জননীকে হারাইয়া ছিলেন। তিনিও চতুর্থ বর্ষে গর্ভধারিণীকে হারাইয়া অপার স্নেহের সাগর জনকের বক্ষে উভয় জনকজননীর স্নেহসুধা পান করিতে

* গিরিশচন্দ্রের জননী একটী মৃতা কন্যা প্রসব করিয়া পরলোক গমন করেন। গিরিশচন্দ্র সে দিনের সেই নিদারুণ স্মৃতি তাঁহার বুদ্ধদেব নাটকে বুদ্ধদেবের জন্ম ও তাঁহার জননীর মৃত্যুবর্ণনাচ্ছলে জীবন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—বুদ্ধদেব চরিত ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

† গিরিশচন্দ্র নিজে বলিতেন—'যদি আমি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া স্বাধীন না হইতাম, তাহা হইলে যে বংশে জন্মিয়াছি, অভিনয় কার্য্য কখনই অবলম্বন করিতে পারিতাম না। যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন আমি বাপ-মা উভয়কেই হারাইয়াছি।—গিরিশ প্রসঙ্গ—১৪৮ পৃষ্ঠা।

করিতে পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে সহসা চতুর্দ্দশ বর্ষে বিশাল বিশ্বমধ্যে একমাত্র স্নেহ-শান্তি-স্বস্তি-বিশ্রাম-বৃন্দাবন জনক নারায়ণ হারাইয়া অতল শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তাহাকেও অশেষ প্রচণ্ড ঝটিকা বিক্ষোভে প্রতিমুহূর্ত্ত বিলোড়িত হইতে হইয়াছিল। পরিশেষে সংস্কৃতসাহিত্যোপবনে বিমল রজতধবল চিরোজ্জ্বল সুরভি সুধাবর্ষী কাব্যকুসুম প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিরতরে অক্ষয় অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আর কেহ নহেন, আমাদের ভারতের নিত্য নব জ্যোতির্ম্ময় গদ্যকাব্য প্রতিষ্ঠাতা মহামহিমমণ্ডিত কবিকুলরবি বাণভট্ট। বস্তুতঃ কবিবর বাণভট্ট ও গিরিশচন্দ্রের জীবনী যেন একই ছাঁচে ঢালা ও একইভাবে পরিবর্দ্ধিত, তবে ফলে একজন সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গরীতির আদি প্রতিষ্ঠাতা, আর একজন বর্ত্তমান সুসংস্কৃত বঙ্গনাট্যকলা ও রঙ্গালয়ের প্রকৃত আদি প্রতিষ্ঠাতা। এক্ষণে সৎ-সাহিত্যমন্দিরে উভয়ের মধ্যে কাহার আসন উচ্চতর, অধিকতর গৌরবমণ্ডিত?

প্রথম উচ্ছ্বাস

কৈশোর

—ঃ০ঃ—

স্ফুলিঙ্গ

"মহতস্তেজসো বীজ বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নি রধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ।।" কালিদাস।

"The child is the father of the man as morning shows the day"—Milton.

যে বৎসর গিরিশচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়, সেই বৎসর সিপাহী বিদ্রোহের দারুণ তাণ্ডবে সমস্ত দেশ টল মল করিতেছিল। বক্‌রিদের দিন জনরব উঠিল, মুসলমানেরা কলিকাতা আক্রমণ করিবে। কলিকাতাবাসীরা ভয়ে কাঠ হইয়া গেলেন, বাটী হইতে বাহির হইবারও বড় একটা কাহার সাহস হইল না—সকলেই যে যাহার গৃহে অর্গল আঁটিয়া বসিয়া রহিলেন। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে স্কুল কলেজ সকলই বন্ধ হইয়া গেল। পিতৃমাতৃহীন হইবার পর তাঁহার এক 'জ্যেট্‌তুত' ভগিনীই গিরিশচন্দ্রের অভিভাবিকা হ'ন। তাঁহার নিকট গিরিশচন্দ্র ভর্ৎসনা অপেক্ষা আদরই বেশী পাইতেন। সিপাহীরা কলিকাতা আক্রমণ করিবে, এই সংবাদ গিরিশচন্দ্রের স্নেহময়ী ভগিনীর কর্ণে পৌঁছিবামাত্র, তিনি গিরিশচন্দ্রের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং প্রাণের ভাইটীকে নিজের অঞ্চলে ঢাকিয়াই যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রও এই ভগিনীকে নিজের গর্ভধারিণীর ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। জীবনে তিনি কখনও তাঁহার অবাধ্য হ'ন নাই, কিংবা তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই স্নেহময়ী ভগিনীই গিরিশচন্দ্রের সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ দমন হইবার পর গিরিশচন্দ্র আবার স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু স্কুলের 'ভাসা ভাসা' শিক্ষা কিছুই বুঝিতে চাহিতেন না, বুঝিতে পারিতেনও

---

* নল-দময়ন্তী নাটকে গিরিশচন্দ্র বিদূষকের মুখে বলাইয়াছেন—

'গুরুমশায় শালা যে কাণ মলে দিলে, নইলে ক, খ, শিক্‌তুম।

নল-দময়ন্তী। ৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক।

না। কাজে কাজেই শিক্ষকদিগের নিকটে তাহাকে প্রায়ই তাড়না খাইতে হইত।* কিন্তু তাড়না বা ভয় প্রদর্শনে কেহ কখনও গিরিশচন্দ্রকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার কেমন মনে মনে একটা ধারণা ছিল যে চাবুকে পশু বশ হইবে, মানুষ হইবে কেন? উপর্য্যুপরি শিক্ষকগণের নিকটে তাড়না খাইয়াও, বাড়ীতে বিশেষ কোন অভিভাবক না থাকায়, গিরিশচন্দ্র প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে বিদ্যালয় একেবারে চিরকালের মত পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় তিনি মনে মনে একটি অন্ধ বিশ্বাস পরিপোষণ করিতে লাগিলেন যে, স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ কখনই প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারে না,—স্কুলের 'ভাসা ভাসা' শিক্ষার বিশেষ কোনই মূল্য নাই।

গিরিশচন্দ্র স্কুল পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রিয়বন্ধু (পশ্চাৎ সবজজ) ব্রজবিহারী ঘোষের প্ররোচনায় তিনি গৃহে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। প্রায় চারি বৎসর কাল তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কেবলই অধ্যয়নে অভিরত রহিলেন। এই কয়েক বৎসর গ্রন্থই তাহার একমাত্র সঙ্গী ছিল। এই কয়েক বৎসরে তিনি সাহিত্য সংক্রান্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভূরি ভূরি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এই সময় তাঁহাদের বাটীর নিকটেই শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে হাফ্ আকড়াই-এর বৈঠক উপলক্ষে এক বিশেষ সমারোহ উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্রও হাফ্ আক্‌ড়াই শুনিবার জন্য ভগবতী বাবুর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, জনতা এরূপ অসম্ভব হইয়াছে যে ভিড়ভাড় ঠেলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করা এক দুরূহ ব্যাপার। অন্যান্য ধনাঢ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও তখন অতি কষ্টে সেই জনতা ভেদ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র সেই জনতা ভেদ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। ঠিক সেই সময় অতি সামান্য পরিচ্ছদধারী একটী ভদ্রলোক আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতার ভিতর একটা হৈচৈ আরম্ভ হইল,—চারিদিকে মহান্ উল্লাস ও অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে জনতা আপনা হইতেই সরিয়া যাইয়া তাঁহার প্রবেশের পথ করিয়া দিল, শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া গিরিশচন্দ্র জানিলেন, ইনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হাফ্ আক্‌ড়াই এতে গান বাঁধিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন।

কবির এরূপ মহান্ সম্মান দেখিয়া তরুণ গিরিশচন্দ্রের কবি হইবার বড়ই সাধ হইল। তৎপরদিবসই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত প্রভাকরের গ্রাহক হইলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রকে অন্তরে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই পদানুসরণে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রচনা করিবার পর যে সকল কবিতা তাঁহার ভাল লাগিত, তাহাই তিনি বন্ধুবর্গকে পড়িয়া শুনাইতেন, আর যেগুলি ভাল লাগিত না তাহা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিতেন।

সেই সময়কার রচিত তাঁহার একখানি গান বা কবিতা তিনি যত্নে রক্ষা করেন নাই। সুবিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা ও রঙ্গাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় এক সময় বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশবাবু যে সকল কবিতা ও গান লিখিয়া নষ্ট করিয়াছেন তাহা যদি কেহ যত্নে রক্ষা করিত তাহা হইলে সে বহুদিন পূর্ব্বে একজন কবি হইয়া যাইত।'

পিতৃ-বিয়োগের ঠিক এক বৎসর কাল পরে অর্থাৎ পঞ্চদশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহের দিন কলিকাতায় এক প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। নিম্‌তলায় একটা কাঠগোলায় সহসা আগুন লাগে। সেই আগুন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরবাড়ী ভস্মসাৎ করিয়া ক্রমে বাগ্‌বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সকলেই অত্যন্ত ভীত,—শঙ্কিত, বিবাহের আমোদে যোগদান করিবার সামর্থ্য বড় একটা কাহার ছিল না। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে অগ্নিদেব গিরিশচন্দ্রের খিড়্‌কীর বাগানপর্য্যন্ত আসিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তথায় একটা বিপুলকায় তেঁতুল গাছ ছিল, তাহারই সহিত লড়াইএ অগ্নিদেবের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল।

দুঃখের হাত হইতে গিরিশচন্দ্র একদিনের জন্যও অব্যাহতি পান নাই। বিবাহ করিয়া ভাবিয়াছিলেন সংসারী হইয়া সুখী হইবেন। কিন্তু বিধাতা বোধহয় তাঁহার জীবনে পারিবারিক সুখ লেখেন নাই। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই করাল কাল একে একে তাঁহার সহোদর সহোদরাগণকে টানিয়া লইতে আরম্ভ করিল। তাঁহার জীবন আবার হাহাকারময় হইয়া উঠিল। কিন্তু শোকে কোন দিনই তিনি একেবারে বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়াছে, ততই তাহার প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছে, কেননা ঝঞ্ঝাবাত তরুলতাদিগকেই উন্মূলিত করিয়া থাকে, সুবিরাট মহীধরের কিছুই করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন, 'জীবনে যে কখন দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনা,—বিশেষ নাটক রচনা। নাট্যকারকে নানা অবস্থায় পড়িয়া সত্যের উপলব্ধি করিতে হয়। প্রকৃত কবি নিজে যাহা অনুভব করেন না, তাহা লেখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য বেশ্যা ও লম্পট চরিত্র হইতে জগৎ-পূজ্য অবতার চরিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি। এ সংসার এক প্রকাণ্ড রঙ্গালয়, নাট্যশালা তাহারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি-মাত্র।'

গিরিশচন্দ্র পিতামাতার দুইটী গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট হইতে বিষয়-বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও মাতার নিকট হইতে কাব্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলেন।*

---

* গিরিশ বাবু বলিতেন—"আমার পিতা একজন ভাল accountant ছিলেন, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল; আর আমার মাতা নিতান্ত কোমলহৃদয়া ছিলেন, শৈশব হইতেই ঠাকুর দেবতার গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। বৈষ্ণব ভিখারী বাড়ীতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকটে বিষয় বুদ্ধি ও মাতার নিকটে কাব্যানুরাগ পাইয়াছি।" গিরিশপ্রসঙ্গ —১৫৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

যৌবন

—ঃ০ঃ—

ইন্ধন সংযোগ

"Music is the vapour of Art. It is to poetry what reverie is to thought, what fluid is to liquid, what the ocean of clouds is to the ocean of waves. If another analogy is desired, it is the indefinite of this infinite. The same insufflation impels, sweeps away, transports and overwhelms it, fills it with agitation and gleams and unutterable sounds, saturates it with electricity, and causes it to give fourth sudden discharges of thunder".—Men of Genius.

পূর্ণ ষোল বৎসর বয়সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়া বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র বাহিরের বিশেষ কোন কার্য্যে যোগদান করেন নাই। এই কয়েক বৎসর কেবল অধ্যয়নই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। পরিশেষে বাইশ বৎসর বয়সে আট্‌কিনসন টিলটন (Atkinson Tilton) কোম্পানীর আফিসের বুক্‌কিপার তাঁহার শ্যালক শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দেবের পরামর্শে গিরিশচন্দ্র প্রথমে ঐ আফিসে শিক্ষা নবিশভাবে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি "আরজেন্সি সিনিজি" কোম্পানীর আফিসে সহকারী বুককিপারের পদপ্রাপ্ত হন। গিরিশ বাবুর পিতা নীলকমল বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ বুক-কিপার ছিলেন। গিরিশচন্দ্র পিতার সেই গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। আফিসে অতি শীঘ্রই তিনি একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র যে আফিসে যখনই চাকরী করিয়াছিলেন তখন সেই আফিসের মনিবদিগের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কারণ মনিবের হিতের দিকে তাঁহার সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকিত। তিনি মনিবের হিতের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রাখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্র তখন 'আটকিনসন্ টিলটনের' আফিসে কাজ করিতে ছিলেন। আটকিনসন্ টিলটনের

নীলের কাজ ছিল। আফিসের ছাদে নীল প্রায়ই শুকাইতে দেওয়া হইত ও আফিস বন্ধ হইবার পূর্ব্বে সমস্ত নীল গুদাম পুরিয়া রাখা হইত। একদিন বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নীল আর গুদামে তোলা হইল না, যেমন রূপে ছিল সেইরূপ ছাদেই রহিয়া গেল। কিন্তু রাত্রে আকাশ সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আশু বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্র শুইতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখিয়া আফিসের ছাদে নীল পড়িয়া আছে তাঁহার মনে পড়িল,—বৃষ্টি হইলে আফিসের বিস্তর টাকার লোকসান হইয়া যাইবে। তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আফিসের দিকে ছুটিলেন ও আফিসের দরওয়ানদিগকে তুলিয়া দ্বিগুণ মজুরী দিয়া কুলী সংগ্রহ করিয়া সমস্ত নীল গুদামে তুলিয়া তবে বাটী আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শুইলেন। পরদিন আফিসে যাইয়া গিরিশচন্দ্র দরওয়ানদিগের মুখে শুনিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই আট্‌কিনসন সাহেব স্বয়ং নীলরক্ষার জন্য ছুটিয়া আফিসে আসিয়াছিলেন ও দরওয়ানদিগের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র আফিসে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই আট্‌কিনসন সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেব তাঁহার কার্য্যের জন্য তাহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে পার্শ্বস্থিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া বলিলেন,—'তোমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তোমার হস্তে যত ধরে ইহার ভিতর হইতে তিন আজলা টাকা তুলিয়া লও।'

এই আফিসের সহিত গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের একটা ক্ষুদ্র স্মৃতি বিজড়িত আছে। যখন তিনি এই আফিসে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন অবসর কালে সেক্‌স্‌পীয়র কৃত ম্যাক্‌বেথের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেন; নাটক খানির অধিকাংশই অনুবাদ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আটকিন্‌সনের আফিস ফেল হইয়া যাওয়ায়, তথাকার সমস্ত আস্‌বাবাদি বিক্রয় হইয়া যায়। ঐ সঙ্গে আফিসের ডেস্কের ভিতর রক্ষিত সেই খাতাখানি 'খোয়া' যায়। তাঁহার প্রথম উদ্যমের নিদর্শন এই খাতা খানি খোয়া যাওয়ায় গিরিশচন্দ্র বেশ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের মনে মনে যাত্রা ও থিয়েটার করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোনও সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু মিলিয়া বাগ্‌বাজারে একটা অবৈতনিক যাত্রার দল গঠিত করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়। কিন্তু এই নাটকে যাত্রার উপযোগী কতগুলি গান বাঁধিবার প্রয়োজন হয়। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ সেই গানগুলি গাঁথাইবার জন্য তখনকার বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা প্রিয়মাধব মল্লিককে ধরিয়া পড়েন। কিন্তু উপর্য্যুপরি ক্রমান্বয়ে সাত দিন হাঁটিয়া একখানিও গান গাঁথাইতে না পারিয়া, তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার বন্ধু উমেশচন্দ্র

চৌধুরীকে বলিলেন, "না এত হাটাহাটি পোষাবে না। আয়, আমরা যেমন পারি নিজেরাই গান বাঁধিয়া লই!" মুখে যা বলা কাজেও তাই করা। দুই বন্ধু পরম উৎসাহে গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। সেই প্রথম গিরিশচন্দ্রের রচিত গান জন সাধারণের সম্মুখে গীত হইল। ভগবদ্দত্ত যে অদ্ভুত প্রতিভা লইয়া গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্মেষের এই প্রথম সূত্রপাত হইল।

যখন গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া বাগবাজারে যাত্রার দল বসাইয়াছিলেন, সেই সময় পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াবাগানের থিয়েটারে মহাসমারোহে মাইকেল মধুসূদনের নববিরচিত সুমার্জ্জিতরুচি ইয়োরোপীয় নাট্যকলানুমোদিত শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি নাটকের অভিনয় মহোল্লাসে চলিতেছিল, এবং কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্র অভিজাত-প্রাসাদে বহু আড়ম্বরে নাট্যাভিনয় হইতেছিল। যাত্রা প্রভৃতিতে আর বড় কাহারও অনুরুক্তি ছিল না।† তরুণ গিরিশচন্দ্রের মনেও একটী থিয়েটার সম্প্রদায় গঠিত করিবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে ছিল, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বরাবরই তিনি সুযোগ খুঁজিয়া আসিতেছিলেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—মানুষ যাহা আগ্রহভরে খুঁজিয়া থাকে ভগবান স্বয়ং তাহা মিলাইয়া দেন। গিরিশচন্দ্রের প্রাণের আগ্রহ শীঘ্রই সুযোগ মিলাইয়া দিল। ঠিক ঐ সময়ে তাঁহার বাল্যসুহৃৎ ও প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপালচন্দ্র বিশ্বাস, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী প্রভৃতি বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া, বাগ্‌বাজার মুখুজ্যে পাড়ায় অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে একটি নাট্যসম্প্রদায়ের মহালা বসাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর সাদর নিমন্ত্রণে গিরিশচন্দ্র এই দলে যোগদান করিয়া, অচিরাৎ শিক্ষক ও নেতার পদ প্রাপ্ত হইলেন, ও অলোকসামান্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের 'সধবার একাদশী'র অভিনয় শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি মহাশয় আসিয়া তাঁহাদের দলে যোগদান করিয়া গিরিশচন্দ্রের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র ঐ নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নাম হইয়াছিল—"The Bagbazar Ameteur Theatre." নিমচাঁদের ভূমিকা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একরূপ অসাধ্য বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া সকলেই একেবারে যুগপৎ বিস্মিত ও হর্ষপুলকিত হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু শতমুখে গিরিশচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিনীত সধবার একাদশীতে প্রস্তাবনাটি গিরিশচন্দ্র নিজেই রচনা করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবুর নিকট সুখ্যাতি লাভ করিয়া সম্প্রদায়ের উৎসাহ আরও শতগুণ বাড়িয়া গেল। গিরিশচন্দ্র তাহার পর দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার দলকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

† বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাস পশ্চাদ্‌প্রদত্ত আমাদের গিরিশ-প্রতিভায় দ্রষ্টব্য।

সেই সময় তাহারা শুনিলেন চুঁচুড়ায় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক (পশ্চাৎ রায় বাহাদুর) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়দের শিক্ষকতায় কিছু কিছু বাদ দিয়া দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটক অভিনীত হইতেছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিশেষ রোক হইল, যেমন করিয়াই হউক অভিনয়নৈপুণ্যে চুঁচুড়ার দলকে হারাইতেই হইবে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট বলিলেন, 'চুঁচুড়ার দল নাটকের স্থানে স্থানে বাদ দিয়া অভিনয় করিতেছে, কিন্তু আমরা নাটকের একটী শব্দও বাদ না দিয়াই অভিনয় করিব।'

মহোৎসাহে মহালা চলিতে লাগিল। এদিকে শ্যামবাজারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পালের বাটীতে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ও কার্ত্তিকচন্দ্র পাল মহোদয়দের দিবারাত্র অকাতর পরিশ্রমে একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইল। সেই নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে ১২৭৮ সালের বর্ষাকালে মহাসমারোহে ও অদম্য উৎসাহে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। তখন এই সম্প্রদায়ের নূতন নামকরণ হইল—"The National Theatre." গিরিশচন্দ্র নায়ক ললিতের অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় রাত্রে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল, এমন কি অভিনয় দেখিবার জন্য স্বয়ং গ্রন্থকার ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভিনয় দেখিতে দেখিতে দীনবন্ধু বাবু এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ছুটিয়া ষ্টেজের ভিতর আসিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন "এবার চিঠী লিখ্‌বো দুয়ো বঙ্কিম," তাহার পর গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার কবিতা যে এমন করে পড়া যায় তা আমি নিজেই জান্‌তুম না। Take this complement at least." বস্তুত, দীনবন্ধুবাবুর সেই সুদীর্ঘ কবিতাসমূহ গিরিশচন্দ্র যেভাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন সত্যই সেরূপ ভাবে আবৃত্তি করা অন্যের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত থিয়েটার সম্প্রদায় "সধবার একাদশী ও লীলাবতী" নাটকের অভিনয় করিয়া জনসাধারণের নিকট একরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখিবার জন্য এত লোক উপস্থিত হইত যে, স্থানাভাবে শত শত ব্যক্তিকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত।*

এখন সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর বৈঠকখানা বাটীতে নীলদর্পণের মহালা দিতেছিল। মহালা সম্পূর্ণ হইলে দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া দলের সকলেই প্রস্তাব করিলেন যে সম্প্রদায়ে এখন হইতে টিকিট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হউক। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন সম্প্রদায় এখনও ততদূর উপযুক্ত হইতে পারে নাই যাহাতে তাহারা টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে পারে।

---

* এই ন্যাশনাল থিয়েটারে তখন গিরিশবাবু ব্যতীত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), হিঙ্গল খাঁ (হেমবাবু) ও যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অভিনয় করিতেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের এ কথা দলের কাহারও নিকট ভাল ঠেকিল না। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে গিরিশচন্দ্রের কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন, স্থিরমতি গিরিশচন্দ্র তখনই সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া দিবার পর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কোম্পানী পাথুরিয়াঘাটার মোড়ে মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের সুবৃহৎ বাটীর (এখন উহাকে ঘড়ীওয়ালা বাড়ী বলা হয়) সমগ্র চত্বরটি মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় গ্রহণ করিলেন, এবং ঐখানেই ধর্ম্মদাস বাবু অক্লান্তভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া একটী নব নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে ১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে প্রথম 'নীলদর্পণের' অভিনয় হয়। এই সময়ে সুবিখ্যাত রঙ্গনাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় এই দলে যোগ দেন। তিনি ও বেলবাবু প্রথমে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের অভিনয় এত স্বাভাবিক ও মধুর হইত যে, পশ্চাৎ স্ত্রী অভিনেতৃগণও তাদৃশ অকৃত্রিম ও মনোহর অভিনয় দেখাইতে পারে নাই। অর্দ্ধেন্দু বাবুর ঝী, অমৃতবাবুর সৈরিন্ধ্রী ও বেলবাবুর সারদাসুন্দরীর অভিনয় নিখুঁত ও নিরূপম হইয়াছিল। ক্রমে এই কোম্পানী টিকিট বিক্রিয় করিয়া দীনবন্ধুবাবুর জামাইবারিক, নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকের অভিনয় করিলেন। অতঃপর সম্প্রদায় মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয় করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন। এতদিন বিনা গিরিশচন্দ্রে মহালা চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয় করিতে হইলে গিরিশচন্দ্রের আবশ্যক। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীমসিংহের ভূমিকা (part) গিরিশচন্দ্র ব্যতীত অপরের গ্রহণ করা অসম্ভব। কাজেকাজেই সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া আবার গিরিশচন্দ্রকে যাইয়া ধরিয়া পড়িতে হইল। গিরিশচন্দ্রও বন্ধুবর্গের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, অবৈতনিক ভাবে তিনি আবার সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন।† গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাম প্রকাশে সম্মত না হওয়ায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের হ্যাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইত, 'ভীমসিংহ A distinguished amateur.' প্রাতঃস্মরণীয় রাণীভবানীর প্রপৌত্র নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর কৃষ্ণকুমারী নাটকে আপনার রাজপরিচ্ছদ স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। নাট্য জগতে এ সৌভাগ্য কোন অভিনেতার ভাগ্যে আজি পর্য্যন্ত ঘটে নাই। ন্যাশনাল থিয়েটারে যথেষ্টই আয় হইতে ছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সভ্যগণের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায় দুইটী দলের সৃষ্টি হইল, তবে এই বিচ্ছেদ অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই আবার উভয়দল সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর স্বত্বাধিকারিত্বে, এক্ষণে যে স্থানে মিনার্ভা থিয়েটার কোম্পানী মহাসমারোহে চলিতেছে, সেই জমিতেই "গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার" নাম দিয়া একটী সুবৃহৎ স্থায়ী রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিলেন। ১৮৭৩

† এই সময়কার ঘটনাগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়। কেহ কেহ গিরিশবাবুর দোষ দিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। পশ্চাৎপ্রদত্ত গিরিশ প্রতিভার প্রথম কাণ্ডে বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাস বিবেকে বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচ্য।

খৃষ্টাব্দ ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার খোলা হয়। ইতিপূর্ব্বে সান্যাল বাড়ীতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া ছাতুবাবুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ সাধারণ থিয়েটার করিতে প্রলুব্ধ হইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, Mr. O. C. Dutt প্রভৃতির পরামর্শ মত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নাম দিয়া বিডন ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুর মাঠে এক নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রথম অভিনয় করেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ও শরতবাবু ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইঁহারাই প্রথমে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী নিয়োজিত করিয়া স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ করান। ইহাদের অনুকরণে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে স্ত্রী অভিনেত্রী নিয়োজিত হয় এবং উহাদের দ্বারা ভুবনবাবুর সম্পাদিত 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র প্রথমে এদলে ছিলেন না। পরে অনুরোধে পড়িয়া মাঝে মাঝে আসিয়া অবৈতনিক ভাবে অভিনয় করিতেন। এই সময় অনুমান ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনী নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন এবং Charitable Dispensary, বিলাতীবাবু, Public Subscription list, Green room of a private Theatre, মডেলস্কুল, ক্যাম্পবেল সাহেবের সবডিপুটি Examination, এবং Hog & Bull নামক কয়েক খানি রঙ্গনাট্য অভিনয়ার্থ রচনা করেন।*

এই সময় গিরিশচন্দ্রের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের পুস্তকসকল পাঠ করিয়া ও পাড়ার দীন দরিদ্রদিগের চিকিৎসা করিয়া এই চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি বেশ পারদর্শী হইয়া উঠেন। তিনি এই চিকিৎসায় এরূপ যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, প্রবাদ আছে একদিন তাঁহাদের পাড়ায়ই একটী ভদ্রলোক তাহার এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে গঙ্গাতীরস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ঔষধ দিবার প্রস্তাব করেন। গিরিশ বাবুর এই প্রস্তাবে সত্যই সেই ভদ্রলোকটী রীতিমত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাছে গিরিশচন্দ্রের চিকিৎসায় রোগী আরোগ্যলাভ করে, পাছে আবার তাহাকে গৃহে আনিতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি আর গিরিশচন্দ্রের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই। গিরিশচন্দ্র যাহাদের ঔষধ দিতেন তাহাদের ফলাফলের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, কিন্তু অধিকাংশ রোগীই সময়ে ফলাফল জ্ঞাপন করিত না, এমন কি ভাল হইয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিত না। এই সকল কারণে মানুষের উপর বিরক্ত হইয়া গিরিশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শীঘ্রই একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

---

* তখন সহরে যে সকল দৈনিক ঘটনা ঘটিত তাহা হইতেই প্রহসনের অভিনয়ের বিষয় নির্ব্বাচিত হইত। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে বিশেষ আয়োজন হইত না। অনেক বিষয়ের কথা লিখিয়াও রাখা হইত না। গিরিশবাবুর উপদেশ মত অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, মহেন্দ্রবাবু ও সময় সময় স্বয়ং গিরিশবাবুও আপনাদের বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়া ষ্টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী নানাকারণে ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিয়া সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মধ্যে উক্ত রঙ্গালয় ভাড়া দেন।* সম্প্রদায়ের সভ্যগণ রঙ্গালয় ভাড়া লইয়া অধ্যক্ষতার ভার গিরিশচন্দ্রের উপরই অর্পণ করিয়াছিলেন।

গিরিশ্চন্দ্র এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া মেঘনাদ বধ, পলাশীর যুদ্ধ, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কাব্য ও উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন এবং নিজে আগমনী, অকালবোধন, দোললীলা প্রভৃতি কয়েকখানি গীতিনাট্য অভিনয়ার্থ রচনা করেন। বস্তুতঃ নাট্যাভিনয়ে গীতিনাট্যের স্থান অতি উচ্চ। কিন্তু আমাদের দেশে যাত্রা, কবি, পাঁচালী প্রভৃতির প্রতি ঘৃণাবশতঃ সঙ্গীতপ্রধানরূপকে অশ্রদ্ধাবশতই হউক, অথবা সুরুচিসঙ্গত বর্ত্তমান সুসংস্কৃত গীতিনাট্য রচনায় নাট্যকারদের অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক, বঙ্গরঙ্গালয়ে ইতিপূর্ব্বে ভূরি ভূরি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত ভুবনবাবুর সম্পাদিত 'সতী কি কলঙ্কিনী' ব্যতীত অন্য কোনও গীতিনাট্য অভিনীত হয় নাই। 'সতী কি কলঙ্কিনী'ও যাত্রার গন্ধপূর্ণ। দৃশ্যকাব্যের পূর্ণাঙ্গতাসম্পাদন উদ্দেশ্যে নবীন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নিতান্ত দুঃসাহসে বুক বাঁধিয়া গীতিনাট্য প্রণয়নে নিরত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রবল উচ্ছ্বাসে ক্রমে ক্রমে এক একখানি নাটকের পর পর এক একখানি অভিনব গীতিনাট্য বিরচিত হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে লাগিল। এই নব গীতিনাট্যের অভিনয়ে বাঙ্গালায় আবার গীতিনাট্যের সমাদর ফিরিয়া আসিল। লণ্ডনে কবিচূড়ামণি সেক্সপীয়র ও ঠিক এইরূপে ক্রমে ক্রমে নাট্যকলার পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নাটক অভিনয়েও গিরিশচন্দ্র মেঘনাদবধে মেঘনাদ ও রাম, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইব, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ, দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহ, মৃণালিনীতে পশুপতি প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। এই সকল ভূমিকায় অভিনয়-চাতুর্য্যে তাঁহার গৌরব সমস্ত বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। মেঘনাদ ও রাম দুইটী ভূমিকাই তিনি অভিনয় করিতেন। এক ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ দুইটী বৈষম্যময়ী ভূমিকা এত সুন্দরভাবে অভিনীত হইতে দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নবীন যুবক হইলেও গিরিশচন্দ্র এই সামান্য দুই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় কি অভিনয়-কৌশলে, কি দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ পারিপাট্যে, কি নৃত্যগীত প্রদর্শনে, কি নাটকাদি রচনানৈপুণ্যে রঙ্গালয়ে এক নবযুগের অবতারণা করিয়া তুলিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনয়ে স্বাভাবিকতার সঙ্গে কলাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

* গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রথমে গিরিশবাবু, তাহার পর তাঁহার শ্যালক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দেব, তাহার পর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী, তাহার পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসু, তাহার পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাড়া লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা বিক্রীত হইয়া গেলে শ্রীযুক্ত প্রতাপচাঁদ জহুরী ক্রয় করেন।

ছিল, তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে পুরাতনের ভিতর নবজীবন উচ্ছ্বসিত হইয়া দর্শককে এক অভিনব সৌন্দর্য্যসাগরে পুরিয়া রাখিত, তাঁহার দৃশ্যাদি ও পরিচ্ছদ প্রকটনে নাট্যামোদিমাত্রই জীবন্ত চিত্র দেখিয়া যুগপৎ প্রীত ও মোহিত হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে তাঁহার নাট্যে নৃত্য কিংবা সঙ্গীতের প্রকৃত স্থলে প্রয়োগ হইত বলিয়া অভিনয় স্থলে সভ্যগণ বাস্তবিকই চমৎকৃত ও তন্ময় হইয়া যাইতেন। সংক্ষেপে তাঁহার রঙ্গালয়ে বৃথাড়ম্বর, এবং অস্থানে রসসমাবেশ, অভিনয়ে মুদ্রাদোষ প্রভৃতি আদৌ ছিল না। তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যগণ প্রত্যেকেই এক একজন সুনিপুণ অভিনেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা প্রায় সকলেই অভিনয়ের এক এক বিভাগে আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ণ ত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। স্ত্রীবিয়োগ তাহাকে বড়ই বিচলিত করিয়া ফেলে।* তখন তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র চেষ্টা করিয়া ফ্রাইবার্জার কোম্পানীর বুককিপার হইয়া কোম্পানীর কার্য্যের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া ভাগলপুর রওনা হ'ন। ভাগলপুর যাইয়া শূন্য, শ্মশান-তুল্য গৃহের অসহ্য স্মৃতির হাত হইতে কতকটা পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার সময়টা নিতান্তই মন্দ চলিতেছিল। বিপৎ বিপদ্‌-অনুবন্ধিনী—কিছুদিন ভাগলপুরে কার্য্য করিবার পরই একদিন রাত্রে চোরে তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যায়,—পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যায় না। সুদূর বিদেশে এরূপ অবস্থায় পড়িলে মানুষের মনের অবস্থা যে কি হয় তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত অপরের অনুভব করা অসাধ্য। গিরিশচন্দ্র নিজমুখে বলিয়াছেন, "আমাদের পাড়ার এক প্রতিবাসী ভাগলপুরে থাকিতেন। চোরে সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইবার পর আমি তাঁহার নিকট গিয়া দশটী টাকা ঋণ প্রার্থনা করি। ভদ্র লোকটী উত্তর দিলেন 'আমি তোমায় দশটাকা ধার দিতে পারি না, তবে পাঁচটি টাকা দান করতে পারি।' তখন আর উপায় নাই, সেই ভিক্ষার দান লইয়াই গৃহে ফিরিলাম। অতি দুঃখেও আমার চক্ষে কখনও সহজে জল পড়ে নাই; কিন্তু এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছিল। পরে যখন সেই

---

* গিরিশচন্দ্রের 'প্রতিধ্বনি' নামক কাব্যে প্রকাশিত 'আজি' নামক কবিতায় তিনি সেই সময়ের স্মৃতি এইরূপে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

তিন দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন,
তিন দশ পূর্ণকায়, জীবন প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।
* * * * * * * *
শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহি সে এখন,
যৌবনে ঢালিয়া কায়, গেয়েছিনু প্রমদায়,
ম'লে কি ভুলিব তার প্রথম চুম্বন!

ঐ কাব্যের 'আঁধার' কবিতায়ও ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভদ্রলোকটী কলিকাতায় আসেন আমি তখন তাহাকে টাকা পাঁচটী ফিরাইয়া দিয়া আসি। টাকা ফেরত দিবার সময় ভদ্রলোকটী বলিয়াছিলেন, 'তোমায় তো এ টাকা দান করিয়াছি।' এ কথার উত্তর আমার জিহ্বায় আসিয়াছিল, কিন্তু যেরূপেই হউক উপকৃত হইয়াছি, তাই কিছু না বলিয়া টাকা পাঁচটি তাঁহার কাছে রাখিয়া নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া আসিলাম।"

ভাগলপুরে অবস্থান কালে গিরিশচন্দ্র অবসর কালে ক্রমশঃ 'ধুতুরা', 'আঁধার', 'চাতক', 'শৈশব-বান্ধব' ও 'হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ' রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কবিতা "নলিনী" নামক মাসিক পত্রিকায় সেই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাগলপুর হইতে ফিরিবার পর গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর আফিসে দেড়শত টাকা বেতনে বুক-কিপারের কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। গিরিশচন্দ্র যখন পার্কার কোম্পানীর আফিসে কাজ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রতাপচাঁদ জহুরী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হয়েন। তিনি ঐ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইয়া গিরিশচন্দ্রকে উহার ম্যানেজার করিবার জন্য বিশেষ 'জেদাজেদী' করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র আন্তরিক নাট্যানুরাগ বশতঃ প্রতাপচাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আফিসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একশত টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন। থিয়েটারের কার্য্যে এই তাঁহার সর্ব্ব প্রথম বেতন গ্রহণ। ১২৮৭ ও ১২৮৮ সালে তিনি এই রঙ্গালয়ের অভিনয়ের জন্য নিম্নলিখিত নাটক ও গীতি-নাটক রচনা করেন ঃ—মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা, আলাদিন, আনন্দ রহো, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু বধ, সীতাহরণ, রামের বনবাস, সীতার বিবাহ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, মলিন মালা, ব্রজবিহার প্রভৃতি।* এই সময়ে রমেশবাবুর 'মাধবীকঙ্কণ' ও গিরিশবাবু নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য প্রদান করেন। মাধবীকঙ্কণে গিরিশচন্দ্র একাদিক্রমে সাতটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল এই থিয়েটারে কার্য্য করিবার পর অভিনেতা অভিনেত্রীগণের বেতন বৃদ্ধি লইয়া প্রতাপচাঁদের সহিত গিরিশচন্দ্রের কথান্তর হওয়ায়, তিনি এই থিয়েটারের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবার অল্পদিন পরেই আবার তিনি তাঁহার বন্ধু ও

---

* প্রতাপ জহুরীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ম্যানেজার হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রথম নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ইতি পূর্ব্বে মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করিতেন ও সময় সময় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াও অভিনয় করিতেন। গীতি নাট্যের অভাবে নিজে গীতিনাট্য লিখিতেন। আবশ্যকমত সময় সময় তৎকালীয় প্রহসন লিখিয়া দিতেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন নাট্যশালার প্রধান উপাদান নাটকের বড়ই অভাব। তাই আবার অদম্য উদ্যম ও পূর্ণ আশা বুকে লইয়া 'রাবণবধ' নাটক রচনা করিয়া কম্পিতবক্ষে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেন। অভিনয়ে পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, নবোৎসাহে আবার নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

শিষ্যবর্গ লইয়া গুর্ম্মুখ রায়ের স্বত্বাধিকারিত্বে নূতন সম্প্রদায় গঠিত করিয়া ৬৮ নং বিডনষ্ট্রীটে একটী নূতন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটারের নাম দিয়াছিলেন "ষ্টার থিয়েটার।" ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই ষ্টার থিয়েটার প্রথমে গিরিশবাবুর নবনাটক 'দক্ষযজ্ঞ' সহ খোলা হয়। ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিবার পর তিনি তথায় অভিনয়ের জন্য দক্ষযজ্ঞ ব্যতীত ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তী নামক আরও দুইখানি পৌরাণিক নাটক বিরচিত করেন। বস্তুতঃ নাটক রচনার প্রারম্ভে রামায়ণ, মহাভারত কিংবা অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে সুপরিচিত, লোক-মনোরম আখ্যানবস্তু নির্ব্বাচনই নবীন অপরিপক্ক নাট্যকারের সুবিবেচনার পরিচায়ক; কেননা এই শ্রেণীর নাটকে ঘটনার পরিকল্পন, বিবিধ চরিত্রাঙ্কন ও কার্য্যাবলীর ঘাতপ্রতিঘাত বিষয়ে লেখককে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হয় না, সে সকল যে দর্শক মাত্রেরই পূর্ব্ব হইতে সুপরিচিত। এখানে নাট্যকারকে কেবল প্রতিচরিত্রানুরূপ ভাষানুধাবন, দৃশ্যাবলির সুবিন্যাস ও নৃত্য সঙ্গীতাদির সুপ্রয়োগ বিষয়ে সমুদয় প্রতিভার বিকাশ করিতে হয়। এইরূপে নাটকের বহিরাবরণ ভাষা ও দৃশ্যাদির বিন্যাসে নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে নাটককার ক্রমশঃ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অন্যরূপ নানা শ্রেণীর নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইতে পারেন।

১২৯০ সালে গুর্ম্মুখ রায় সামাজিক শাসনের কঠোরতায় পড়িয়া থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়েন। বর্ত্তমান হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটারের অধিকারিগণ* সেই সময় গুর্ম্মুখ রায়ের নিকট হইতে ঐ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিত্ব ক্রয় করিয়া লয়েন। গিরিশচন্দ্র যেমন অধ্যক্ষ ছিলেন তেমনই অধ্যক্ষ রহিলেন। ১২৯০ সাল হইতে ১২৯৪ সালের মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য গিরিশচন্দ্র শ্রীবৎস-চিন্তা, কমলে-কামিনী, বৃষকেতু, চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রভাসযজ্ঞ, হীরারফুল, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বেল্লিক্ বাজার, চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস, বিল্বমঙ্গল ও রূপসনাতন নামে নাটক, গীতিনাটক ও প্রহসন রচনা করেন। রূপসনাতনের অভিনয়ে সে সময়ে রঙ্গালয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। রঙ্গালয়কে এ সময় বঙ্গবাসী ধর্ম্মমন্দিরের চক্ষে দেখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে থাকেন। চৈতন্যলীলার অভিনয়ে সত্যই সমস্ত বঙ্গদেশ আবার হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিতপ্রবর মথুরানাথ কলিকাতায় আসিয়া চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিয়া উন্মত্তের মত গিরিশচন্দ্রের পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, "তোর মনোবাঞ্ছা গৌর পূর্ণ করবেন।"

---

* ষ্টার থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা শ্রী অমৃতলাল বসু ও শ্রী অমৃতলাল মিত্র, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী হরিপ্রসাদ বসু এবং ধর্ম্মদাস বাবুর ভাগিনেয় শ্রী দাসুচরণ নিয়োগী। এই চারিজনে ষ্টার নাট্যশালা ক্রয় করিলেন। ঐ সময় ভুবনবাবু আবার একবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে কুমারসম্ভব ও আনন্দমঠের অভিনয় করিয়াছিলেন। ষ্টার থিয়েটার দল পরে ঐ নাট্যশালা ক্রয় করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের চিহ্ন এইরূপে লুপ্ত হয়।

জানিনা কোন মহাশুভক্ষণে গিরিশচন্দ্রের লেখনী হইতে চৈতন্যলীলা† বাহির হইয়াছিল, যাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। গিরিশচন্দ্র কোন ধর্ম্মই মানিতেন না, তিনি এক মহানাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ও পিতার উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। যদি ঘটনাক্রমে কোন দিন গঙ্গাস্নান করিতেন, তাহা হইলে তিনি রাম তর্পণের মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতার উদ্দেশে অঞ্জলি পূরিয়া তিনবার জল প্রদান করিতেন। মনে মনে ভাবিতেন, কি জানি জল দিই, যদি পিতার কিছু কাজ হয়। বাহিরে গিরিশচন্দ্র যতই নাস্তিক থাকুন, ভিতরে একটা ভক্তির স্রোত তাঁহার চিরকালই বহিয়া আসিতেছিল। সেই ভক্তির টানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব চৈতন্যলীলা দেখিতে আসিলেন। তাঁহার অপার দয়া, তাই তিনি গিরিশচন্দ্রকে পদাশ্রয় দিলেন,—অন্তর্য্যামী তাঁহার অন্তরের সমস্ত সন্দেহ মোচন করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "গিরিশের বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচআনা, তার বিশ্বাস আক্‌ড়ে পাওয়া যায় না।"

কেমন করিয়া গিরিশচন্দ্র গুরু লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে আমরা তাহা গিরিশচন্দ্রের নিজের কথায়ই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "পরমহংসদেব একদিন চৈতন্যলীলা দেখিতে আসিলেন। এই ঘটনার তিনদিন পরে, আমি কোন কারণবশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটী রকের উপর বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে নারাযণও আর দুই একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। অন্যদিন আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিতেন; সেদিন কিন্তু আমি নমস্কার করায় পূর্ব্বের মত তিনি প্রতি নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণদিকের রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। তিনি যাইতেছেন আর আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি এক 'অজানিত' সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থলকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন। তিনি কিছু দূর চলিয়া গিয়াছেন, আমারও ইচ্ছা হইল তাঁহার সঙ্গে যাই, এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন। কে আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, পরমহংসদেব ডাকিতেছেন। আমি জানিলাম, পরমহংসদেব বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন। আমিও তাহাকে লইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'গুরু কি?' তিনি বলিলেন 'গুরু কি জান, গুরু যেন ঘটক, ভগবানের সঙ্গে জুটিয়ে দেন।' পরক্ষণেই বলিলেন, 'তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।' তাঁহার কথায় আমার মনে অপূর্ব্ব শান্তি হইল। তাহার পর আমি একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমাকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ পেয়েছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন,

---

† 'চৈতন্যলীলা' লিখিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের পরমহংসদেবের সহিত পরিচয় হয় নাই। তিনি নিজে বলিতেন—"আমি 'Paradise regained' কাব্যের নিকটে বিশেষ ঋণী, উহা পাঠ না করিলে আমি চৈতন্যলীলা যেরূপভাবে লিখিয়াছি, তেমন করিয়া লিখিতে পারিতাম না।"

তাই করুন। পরমহংসদেব আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'নাগো, তোমার হৃদয়াকাশে অরুণোদয় হয়েছে, নইলে কি চৈতন্যলীলা লিখতে পার! শিগগির জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাবে।' এই দিন সাক্ষাতের পর আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমি এক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি।

বাল্যকালে পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম, পরমহংসদেবের কাছেও ঠিক সেইরূপ আদর পাইয়াছি। আমার সকল আবদারই তিনি পূর্ণ করিতেন। অন্য সকলে তাঁহার কত গুণের কথা বলেন, আমি কেবল তাহার অপার অলৌকিক স্নেহের কথাই ভাবি। আমি খাইতে ভাল বাসিতাম। প্রভু যখন শয্যাগত, সেই সময় একদিন আমি তাঁহার ওখানে আহার করি। আহারে যে আমার বেশ পেট ভরিয়াছে এবং আমি খুব পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বালকের ন্যায় সেই কথা বলিবার জন্য আমি তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছি। আমি আসিবামাত্র তিনিও ব্যগ্র হইয়া পেটে হাত দিয়া আমাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন পেট ভরেছে তো? পরিতৃপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমার বেশ আনন্দ হইল, ঠাকুরও শুনিয়া তেমনি আনন্দিত হইলেন। সংসারে যতরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহ, ভালবাসা আছে, প্রভুর স্নেহের কাছে সকলই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। গুরু অহেতুক কৃপা-সিন্ধু, আমি যে তাঁহার কৃপা পাইয়াছি সে আমার গুণে নহে, পতিত-পাবনের অপার দয়া, সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আজীবন ইনি আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুরের পদাশ্রয় পাইবার পূর্ব্বেও তাঁহার অদম্য প্রভাব আমাকে সকল আপদে বিপদে রক্ষা করিয়াছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। ঠাকুরের প্রতি আমি কত অত্যাচার করিয়াছি, তাহাও দয়াল ঠাকুর নিজ গুণে ক্ষমা করিয়াছেন। এক দিনের ঘটনার কথা আমার মনে বেশ আছে। পরমহংসদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। আমি ধরিয়া বসিলাম তুমি আমার ছেলে হও। পরমহংসদেব বলিলেন 'তা কেন, আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাক্‌বো।' আমি যত বলি তুমি আমার ছেলে হও, ঠাকুরের মুখে সেই এক কথা, 'আমি তোর ইষ্ট হয়ে থাক্‌বো।' মত্ততাপ্রযুক্ত আমি ঠাকুরকে যা তা গালাগালি দিতেও ত্রুটী করিলাম না। পরমহংসদেব স্থির গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বর ফিরিবার সময় যখন ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন, আমি তাহার সমক্ষে কর্দ্দমাক্ত পায়ের উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরের ভক্তগণ আমার আচরণে সকলেই ব্যথিত ও বিরক্ত। পরে শুনিয়াছিলাম, পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, 'ও বড় খারাপ লোক, ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কাজ নেই।' এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্তরামচন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'রাম দু'খানা লুচী খাইয়ে গিরিশ ঘোষ আমার 'পিতৃ উচ্ছগ্য' 'মাতৃ উচ্ছগ্য' করেছে।' রামবাবু বলিলেন, "সে তো ভালই করেছে।" ঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, 'শোন, শোন রাম কি বলছে। এর পরে যদি মারে?' অম্লান বদনে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'মার

খেতে হবে। ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে বলিয়াছিলেন তুমি বিষ উদ্‌গিরণ কর কেন? নাগ তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, প্রভু আমি আর কোথায় কি পাইব? তুমি তো আমাকে খালি বিষই দিয়াছ। আপনি গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন সে তাই দিয়ে আপনার পূজা করেছে।' ভক্ত-বৎসল করুণাময় ঠাকুর তখনি বলিলেন, "রাম, তবে গাড়ী আন, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব।" আমি কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রের সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলাম। সেই সময় ঠাকুর আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন 'ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম।"

একদিন যে গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মের কোন ধারই ধরিতেন না, পরমহংসদেবের কৃপা-লাভ করিয়া সেই গিরিশচন্দ্র পরম ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। হিন্দুর দেবদেবীর নুড়ীটি পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ হইয়াছিল। মানুষ যাহা চায় তাহা পায়। গিরিশ চন্দ্র গুরু চাহিয়াছিলেন, তাই গুরু নিজে আসিয়া খুঁজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা ছিল না, ভজনা ছিল না, ছিল কেবল অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, এই প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহার ইষ্টলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।*

---

* এই কথা গিরিশচন্দ্র তদীয় 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সাধকশ্রেষ্ঠ সোমগিরির কথায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। বহুপরে লিখিত হইলেও 'কালাপাহাড়ে' গিরিশচন্দ্র নায়কের স্বগত প্রশ্নে নিজের পরমহংসদেবের সঙ্গলাভের পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতিভা প্রদীপ্ত বহ্নি, উহা পুরোহিতের ভণ্ডতার ভস্মে আচ্ছাদিত হইবার নহে। এই জন্যই আমাদের দেশের কত উদীয়মান প্রতিভা হিন্দুধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। পরম সৌভাগ্যবশতঃ গিরিশচন্দ্র সময়ে পরমহংস দেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

প্রৌঢ়-যৌবন সন্ধি

—ঃ০ঃ—

অনল-বিকাশ ও তিমির-নাশ

"The human mind has a summit—the ideal; to this summit God descends and man rises. Men of genius form a dynasty : indeed there is no other. They wear all the crowns, even that of the thorns. Each of them represents the sumtotal of absolute truth realizable to man. To choose between these men, to prefer one to the other, to point with the finger to the first among these first is impossible."—Men of Genius.

১২৯৪ সালের প্রারম্ভে কলিকাতার ধন কুবের শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটার ক্রয় করিয়া নিজে নূতন সম্প্রদায় সংগঠন করিয়া, এমারেল্ড থিয়েটার নামকরণে অভিনয় চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ষ্টারসম্প্রদায় উক্ত থিয়েটার হইতে বিতাড়িত হইয়া একটী নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণের জন্য হাতীবাগানে জমি ক্রয় করিলেন। কিন্তু অর্থের সচ্ছলতা না থাকায় নাট্যশালা নির্ম্মাণ কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। এই সময় গোপাললাল শীল মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে ম্যানেজার করিবার প্রয়াস পাইলেন। অতিশীঘ্রই এই প্রস্তাব গিরিশবাবুর নিকটে উপস্থিত হইল। গোপালবাবু প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যদি গিরিশবাবু তাহার থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সাড়ে তিনশত টাকা মাসিক বেতন ও বিশ হাজার টাকা বোনাস স্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছেন। গোপালবাবু লোক-পরম্পরায় এ কথাও প্রকাশ করিতেছিলেন যে, যদি গিরিশবাবু এই বিশ হাজার টাকা বোনাস লইয়াও তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার না হন, তাহা হইলে তিনি ঐ বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ষ্টার থিয়েটারের সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী ভাঙ্গাইয়া লইবেন। এই প্রস্তাব গিরিশবাবুর নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি ভাবিলেন, 'গোপালবাবু বিশ হাজার টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিতেছেন। এই অর্থ যদি তিনি গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার

প্রিয়বন্ধুও শিষ্যদিগের অর্থাভাব ঘুচিয়া অচিরে রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইবে, অপিচ এক্ষণে তাঁহারা সকলেই কার্য্যক্ষম, তাঁহারা নিজেরাই কার্য্য চালাইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু এই বিশ হাজার টাকা না লইয়া তাঁহার থিয়েটারে না যাইলে, তাঁহার কোপে পড়িতে হইবে। তিনি বড়লোক, না করিতে পারেন কি?' এই সকল নানা দিক ভাবিয়া গিরিশচন্দ্র বিশ হাজার টাকার বোনাস ও সাড়ে তিনশত টাকা মাসিক বেতনে এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দ্র সেই বিশ হাজার টাকার মধ্যে ষোল হাজার টাকা নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও শিষ্যদের দান করিয়া তাঁহাদের থিয়েটার নির্ম্মাণের অভাবনীয় সুযোগ প্রদান করিলেন, এবং তখনই ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন "তোমরা ভদ্রসন্তান, নানা প্রোপ্রাইটার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া এক্ষণে ভগবৎ-প্রসাদে স্বাধীন হইলে। আমার অনুরোধ, যে সকল ভদ্র সন্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা যেন তোমাদের নিকট কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।" তিনি স্বপ্রণীত 'নসীরাম' নাটক অভিনয়ের জন্য এই সময়ে দিয়াছিলেন।

এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্দ্র উক্ত থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য দুইখানি নাটক রচনা করেন। এই দুইখানি নাটক আজি পর্য্যন্ত নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ আদরের জিনিষ হইয়া আছে। এমারেল্ড থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইবার কিছুদিন পরেই মহাসমারোহে তাঁহার 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এই এক পূর্ণচন্দ্র নাটক হইতেই গোপালবাবু বিশ হাজার টাকার অধিক পাইয়াছিলেন। ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে পূর্ণচন্দ্রের প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়। তাহার পর ১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসে 'বিষাদ' উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'বিষাদ' গিরিশচন্দ্রের পূর্ণপ্রতিভার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী সৃষ্টি—ভাবপ্রধান বিয়োগান্ত নাটকের চরমোৎকর্ষ। বস্তুতঃ 'বিষাদের' সরস্বতী, অলর্ক ও মাধব কবির অলৌকিক প্রাণময় বিচিত্র চরিত্র। ঈদৃশ নাট্যসম্পৎ যে কোন কালে যে কোন ভাষায় অতুল বিরাট্ সম্পত্তি।

দুই বৎসর থিয়েটার চালাইবার পর গোপালবাবুর থিয়েটারের সখ মিটিয়া গেল। তিনি তাঁহার থিয়েটার উক্ত থিয়েটারেরই কয়েকজন অভিনেতাকে ভাড়া দেন। গোপালবাবুর থিয়েটারের সংস্রব ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরও উক্ত থিয়েটারের কার্য্য সংক্রান্ত সমুদায় সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায় এবং তিনি আবার হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটারের দলে আসিয়া যোগদান করেন। বহুদিন পরে আবার প্রিয় বন্ধু ও শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

এই সময় গিরিশচন্দ্রের বিজ্ঞান শিখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হয়। তিনি স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় মেম্বর হইয়া বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ করেন। লেক্‌চারের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া লেক্‌চারের উপযোগী যন্ত্রাদি ও গ্যাস নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় তিনি নিজেই শিশি পরিষ্কার পর্য্যন্ত করিতেন। এই সময় তিনি বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও পাঠ

করিতে ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। গিরিশচন্দ্র এই সময় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিয়া ১২৯৬ সালে তিনি তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' রচনা করেন। এই নাটক মহাসমারোহে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রফুল্ল নাটকে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর রমেশের ভূমিকায় অভিনয় অদ্যাপি বঙ্গরঙ্গালয়ে আদর্শরূপে গৃহীত হইতেছে। এখানে তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের দ্বারা প্রতি নাটকের নায়কের অংশের অভিনয় করাইতেন। অমৃতবাবুর নায়কোপযোগী আকৃতি, সুন্দর বাচনভঙ্গী এবং সর্ব্বোপরি সুমধুর স্বর-লহরী দর্শককে আদ্যোপান্ত তন্ময় করিয়া রাখিত। এই নাটকের প্রশংসায় বঙ্গদেশ ভরিয়া উঠে। সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় এই পুস্তকের সমালোচনা ধারাবাহিক ভাবে তিন দিবস বাহির হইয়াছিল। ইংরাজী পত্রিকায় এরূপ সমালোচনা দেশীয় কোন পুস্তকের ভাগ্যেই কোনদিন ঘটে নাই। তাহার পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার প্রণীত নাটক হারানিধি* ও চণ্ড এবং গীতিনাট্য মহাপূজা ও মলিনাবিকাশ ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। তাঁহার রচিত প্রত্যেক নাটক ও গীতিনাট্যই শতমুখে শতরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল।

১২৯৭ সালে অতি অল্প দিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের দুইটী কন্যা ও দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যু হয়। বিপদ্ যখন আসে তখন সে একলা আসে না। এই উপর্য্যুপরি দারুণ শোকে তিনি নিজেও সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়েন। আবার দ্বিতীয় পক্ষের অবশিষ্ট একটীমাত্র পুত্রেরও কঠিন পীড়া হয়। গিরিশচন্দ্র এই বিপদের মধ্যে পতিত হইয়া নিয়মমত থিয়েটারে যোগদান করিতে পারিতেন না, তখন থিয়েটারে নিয়মিত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

১২৯৭ সালের শেষভাগে শ্রীনবকুমার রাহা নামক এক ব্যক্তি ষ্টার থিয়েটারে অবৈতনিক সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তাঁহারই কুপরামর্শ অনুসারে ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ, থিয়েটারে নিয়মিত যোগদান না করিবার দরুণ গিরিশচন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুতি পত্র প্রেরণ করেন। তখন গিরিশচন্দ্র সবেমাত্র কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মচ্যুতি পত্র পাইবামাত্র গিরিশচন্দ্র তাঁহার রুগ্ন পুত্রটী লইয়া মধুপুরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য রওনা হন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি সংবাদ পাইলেন ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহার নামে হাইকোর্টে অভিযোগের আয়োজন করিতেছেন। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া অনতিবিলম্বে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গুজব মিথ্যায় পরিণত হইল। ১২৯৭ সালের শেষভাগে ষ্টার থিয়েটারের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গেল।

---

* হারানিধি নাটকে অঘোরের অংশের বেলবাবু যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা অননুকরণীয় আজিও সকলে বলিয়া থাকেন।

১২৯৮ সাল ও ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তিনি কোন থিয়েটারে যোগদান করেন না। এই দুই বৎসরকাল তিনি বাটী হইতে কদাচিৎ বাহির হইতেন,—আবার পুস্তকই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইয়াছিল। ১২৯৯ সালের কার্ত্তিকমাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে লইয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভূমিতে 'মিনার্ভা থিয়েটার' নাম দিয়া একটী নূতন রঙ্গালয় সংস্থাপিত করেন। গিরিশ্চন্দ্র এই থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইয়া সেক্স্পীয়রের ম্যাকবেথ নামক সুবিখ্যাত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া মহাসমারোহে অভিনয় আরম্ভ করেন। সেক্স্পীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের যে অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে পারে, একথা কাহারও ধারণা ছিল না—একরূপ অসম্ভব বলিয়াই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই অসম্ভব কার্য্য এরূপ ভাবে সম্ভব করিয়াছিলেন যে শিক্ষিত সমাজ তাঁহার শতমুখে প্রশংসা করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই।*

ম্যাক্বেথের নিখুঁত অভিনয় দেখিয়া তাঁহার শত্রু ও মিত্র সকলে কেবল মুগ্ধ হন নাই, সত্যই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ম্যাক্বেথে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ম্যাক্বেথের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। ম্যাক্বেথ নাটক অভিনয় কলিয়া মিনার্ভা থিয়েটার সরকারবাহাদুরের নিকট 'রয়েল' ও করিন্থিয়ান থিয়েটারের মত প্রথমশ্রেণীর থিয়েটার বলিয়া পরিগণিত হয়।† ম্যাক্বেথ অভিনয়ে নাট্যকলার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত চিত্রকর উইলার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া ম্যাকবেথের সমুদয় চিত্রপট অঙ্কিত করান ও গিল্সাহেবকে সজ্জাকর নিযুক্ত করিয়া উক্ত নাটকের সাজ ও পোষাক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। শিক্ষিত জনসমাজের নিকট ম্যাক্বেথের যথেষ্ট সুখ্যাতি হইলেও সাধারণ লোকের নিকট ম্যাক্বেথ তেমন প্রীতিপ্রদ হয় নাই। কাজেই দিন দিন থিয়েটারের আয় কমিতে আরম্ভ হইল। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া ম্যাক্বেথের অভিনয়ও বন্ধ করিতে হইল। গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের সমস্ত নাটকগুলিরই বঙ্গানুবাদ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাক্বেথের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সে ইচ্ছা মনে মনে বিলীন হইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য, নচেৎ আজ আমরা গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভামণ্ডিত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত সেক্সপীয়রের সমস্ত গ্রন্থগুলিই পড়িয়া কৃতার্থ হইতাম।

ম্যাক্বেথের ক্রমশঃ দর্শকাভাব দেখিয়া গিরিশচন্দ্র সত্বর 'মুকুলমুঞ্জরা' নামক একখানি নাটক লিখিয়া ফেলিলেন। মুকুলমুঞ্জরা মহাসমারোহে মিনার্ভায় অভিনীত হইল। তাহার পর তাঁহার রচিত নব গীতিনাট্য আবুহোসেন ও লোমহর্ষণ বিয়োগান্ত নাটক জনার অভিনয় হইল। দিন দিন আবার রঙ্গালয়ের বিপুল আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৯৯ সালে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন ও ১৩০২ সাল

---

* সুবিখ্যাত সাহিত্যাধ্যাপক প্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহাশয় হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদুর মাত্র অগ্রবর্ত্তী হইয়া 'অসম্ভব' বলিয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন. দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁদের জীবদ্দশায় গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ অভিনীত হয় নাই।

† বেঙ্গল থিয়েটারও হীরক জুবিলিতে অভিনয় দ্বারা 'রয়েল' উপাধি পাইয়াছিল।

পর্য্যন্ত তিনি তথায় কার্য্য করেন। এই চারি বৎসরের ভিতর নিম্নলিখিত নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনগুলি তিনি উক্ত থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য লিখিয়াছিলেন ঃ—ম্যাক্‌বেথ, মুকুলমুঞ্জরা, আবুহোসেন, সপ্তমীতে বিসর্জ্জন, জনা, বড়দিনের বখ্‌শিস্‌, স্বপ্নের ফুল, সভ্যতার পাণ্ডা, করমেতি বাই, ফণীর মণি, পাঁচক'নে।*

গিরিশচন্দ্রের নাটকাদির অভিনয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের দিন দিন আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইতেছিল, তেমনি স্বত্বাধিকারীর অমিত-ব্যয়িতায় রঙ্গালয়ের স্থায়িত্ব লোপেরও আশঙ্কা হইয়া উঠিতেছিল। এই কারণে গিরিশচন্দ্র স্বহস্তে আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র রাখিতে স্বচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহাতে ফল বিপরীত হইল। নাগেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের উপর মহাবিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। নাগেন্দ্রবাবুর এই কার্য্যে গিরিশচন্দ্র মোটেই দুঃখিত হন নাই। তিনি মনে মনে হাসিয়া তখনই উক্ত থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের স্বভাবই ছিল কোন দিন কাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া ১৩০৩ সালের প্রারম্ভে আবার ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। ষ্টার থিয়েটারে সে সময় নাটক লিখিবার লোকের বড়ই অভাব হইয়া পড়েছিল। গিরিশচন্দ্রকে পাইয়া তাহাদের সে অভাব দূর হইল। সেই সময় হইতে তিনি নাট্য জগতে নাট্যাচার্য্য নামে খ্যাত হইলেন। ১৩০৩ ও ১৩০৪ সালের মধ্যে তিনি ষ্টার থিয়েটারের জন্য কালাপাহাড়, হীরক জুবিলী, পারস্য প্রসূন ও মায়াবসান রচনা করেন।

এদিকে গিরিশচন্দ্রের পদত্যাগের পর হইতে মিনার্ভা থিয়েটার নানা হস্তে গমন করিয়া অবশেষে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ও তাঁহার বাল্যবন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল

---

* মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র তাঁহার পূর্ণবিকশিত প্রতিভাকার বহুমুখগামিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার মুকুলমুঞ্জরা সম্পূর্ণ অভিনবভাব মণ্ডিত। লর্ড লিটন প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের ছায়া উহাতে লক্ষিত হইলেও, বঙ্গনাট্য সাহিত্যে উহা এক অপূর্ব্ব অমূল্যরত্ন। সেক্‌স্‌পীয়রের তৃতীয় রিচার্ড, হ্যামলেট, ম্যাক্‌বেথ, কিঙ্গলিয়র প্রভৃতির ন্যায় বাঙ্গলা ভাষায় যে লোমহর্ষণ বিয়োগান্ত নাটক সম্পূর্ণ সম্ভব ও প্রায় শতাব্দাধিক কাল ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চার ফলে বাঙ্গালী হৃদয় যে নিজেদের রঙ্গালয়ে গ্রিম ট্র্যাজিডির অভিনয় উপভোগক্ষম তাহা 'জনায়' গিরিশচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং গিরিশচন্দ্রের 'বিষাদ' ও 'প্রফুল্ল' বিয়োগান্ত নাটক বটে, কিন্তু জনার নিকটে উহারা আলোর নিকটে ছায়ার ন্যায়। বস্তুতঃ প্রবীরের মৃত্যুব পর হইতে জনা চরিত্র বিদ্যুৎস্ফুরণেব ন্যায় অনুপম, অননুকরণীয়। সেক্‌স্‌পীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নাটকের মারগারেট চরিত্র জনার কাছে ছায়া মাত্র। 'স্বপ্নের ফুল' প্রতিভাকাননের পূর্ণ বিকশিত কুসুম—সংসার রঙ্গের জীবন্ত গীতিনাট্য—মানবহৃদয়ের সাঙ্গরূপক। স্বপ্নের ফুলের তুলনা স্বপ্নের ফুল। 'করমেতি বাই' ভক্তিগঙ্গায় পূর্ণোচ্ছ্বাস—রূপসনাতনের শেবাঙ্ক—আদর্শ সাধিকা মীরাবাই-এর ভক্তি গীতির জীবন্ত চিত্র। 'আবুহোসেন' তৎকাল প্রথিত চলিত গীতিনাট্যের অভাবনীয় নবন্যাস, বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনব আহৃত কহিনুর। ষ্টার থিয়েটারে অবস্থান কালেই গিরিশচন্দ্র এই রত্ন আমদানি করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিনেতারা তখন উহার কদর বুঝিলেন না, অশ্রদ্ধার নয়নে দেখিলেন, তাই তখন অভিনীত হয় নাই। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বর্ষাধিক কাল আবুহোসেন একাদিক্রমে দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক স্বত্বাধিকারীকে ভূরি ভূরি অর্থ প্রদান করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম. এ. বিএল মহাশয়দের* কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে। মহেন্দ্রবাবুর নিতান্ত অনুরোধে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে আবার যোগদান কারিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটকের আকারে পরিবর্ত্তিত করেন ও স্বয়ং মণিহরণ ও নন্দদুলাল নামক দুইখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। সীতারামে গিরিশচন্দ্র নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন।†

সেই সময় সর্ব্বজন পরিচিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ব্বকথিত এমারেল্ড থিয়েটারকে 'ক্লাসিক থিয়েটার' নাম দিয়া নূতন এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া মহাসমারোহে অভিনয় কার্য্য চালাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার পরিচালিত থিয়েটারটি মিনার্ভার সমকক্ষ করিবার জন্য অনেক চেষ্টার পর গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিক থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। ১৩০৫ সালের শেষ ভাগে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৩০৫ সালের শেষ ভাগ হইতে ১৩১১ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরকাল গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে অবস্থান করেন। ক্লাসিক থিয়েটারে অবস্থানকালে উক্ত থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেন,—দেলদার, পাণ্ডবগৌরব, অশ্রুধারা, মনের মতন, অভিশাপ, শান্তি, ভ্রান্তি, আয়না ও সৎনাম।

গিরিশচন্দ্র কর্ম্মবীর মহাপুরুষ ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত সম্মান দিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীরই কল্যাণ সাধনের জন্য প্রাণপণ করিযাছেন, কিন্তু মোসাহেবের কুপরামর্শে যখনই তাঁহারা গিরিশবাবুর মঙ্গল ইচ্ছা বুঝিতে পারেন নাই তখনই তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে এবং মহাভুল করিয়াছি বলিয়া পরে সকলকেই অনুশোচনা করিতে হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের জীবন এমনই বৈচিত্রময় যে তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। তাঁহার জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা লিখিবার স্থান আমাদের এ পুস্তকে নাই। তবে আমরা কেবল তাহার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া, পৌষ মাসে আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিলেন।

---

* নব্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়দের মধ্যে মহেন্দ্রবাবুর ন্যায় প্রকৃত নাট্যকলাবিৎ সুধী অতীব বিরল। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া নাটকের প্রশ্নপত্রে সেই বৎসর প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাট্যকলাসংক্রান্ত বিদ্যা অতি সুগভীর, প্রবীণ নাট্যাধ্যাপকের ন্যায় ছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া মিনার্ভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু ও গিরিশচন্দ্রের অনুপম নাট্যপ্রতিভার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুতঃ মিনার্ভা থিয়েটারে আগমন অবধি গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রবাবুর পরামর্শ ব্যতীত কোন নাটকই রচনা করেন নাই। মহেন্দ্রবাবু ও গিরিশচন্দ্রের সম্মেলনে গিরিশচন্দ্রের যে কয়েকখানি নাটক ও গীতিনাট্য বিরচিত হইয়াছে উহারা সকলেই সর্ব্ববিধ নাট্যসম্পদে পূর্ণ।

† মহেন্দ্রবাবু মহামান্য হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস করিতেন বলিয়া বাহিরে সর্ব্বত্র থিয়েটার মনোমোহন বাবুর নামেই প্রচারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত নাট্যকলাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমাগমে মিনার্ভা থিয়েটার অতি সত্বরই আবার প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার হইয়া উঠিয়াছিল। কি নাট্যসম্পদে কি অভিনয় কৌশলে, কি দৃশ্য পরিচ্ছদ পারিপাট্যে, কি নৃত্য গীতি নৈপুণ্যে সর্ব্ব বিষয়ে মহেন্দ্র বাবুর পরিচালনায় মিনার্ভা অনুপম হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং যখন মিনার্ভায় গিরিশ ও মহেন্দ্র সমাগম হইল, তখন উক্ত থিয়েটারে একেবারে মণিকাঞ্চন সমাবেশ হইয়া দাঁড়াইল।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যর সন্ধি

—ঃ০ঃ—

অনল-বিকাশ ও তিমির নাশ

"The theatre is a crucible of civilisation. It is a place of human communion. All its phases need to be studied. It is in the theatre that the public soul is formed." Victor Hugo.

১৩১১ সালে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে আবার যোগদান করিয়া 'হর-গৌরী' নামে একখানি গীতিনাট্য ও 'বলিদান' নামে বর্ত্তমান হিন্দুবিবাহ সংক্রান্ত একখানি সামাজিক নাটক রচনা করেন।* মিনার্ভায় এই দুইখানি পুস্তকেরই মহা সমারোহে অভিনয় হয়। এই পুস্তক দুইখানি অভিনয় হইবার কিছুদিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারের তখনকার স্বত্বাধিকারিগণ, মিনার্ভা থিয়েটার প্রকাশ্য নিলামে ৬০০০০ ষাট হাজার টাকায় ক্রয় করেন। গিরিশচন্দ্র তখন সিরাজদ্দৌলা রচনা করিতেছিলেন। বলিদানে করুণাময়ের ভূমিকা তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। করুণাময়ের ভূমিকা অভিনয় করিয়া থিয়েটার হইতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া তিনি সিরাজ সংক্রান্ত বিবিধ পুস্তক পাঠ করিতে বসিতেন। পুস্তক পাঠ করিতে করিতে তিনি এমনই তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, রাত্রি প্রায়ই প্রভাত হইয়া যাইত, তাঁহার হুস্ থাকিত না। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের ইহাই ছিল বিশেষত্ব। সিরাজ লিখিবার সময় তাঁহার বলিদান পুস্তক মুদ্রিত হইতেছিল, সেই কারণ গিরিশচন্দ্রের লেখক অবিনাশবাবুকে প্রায়ই প্রেসে যাইতে

---

* বলিদান বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের একখানি নিখুঁত ছবি। ঈদৃশ সর্ব্ববিধ নাট্যসম্পদপূর্ণ সামাজিক বিয়োগান্তে নাটক কেবল বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র সুসভ্য জগতের নাট্যসাহিত্যে বিরল। বলিদানের 'করুণাময়', 'জবী', 'রেমমামা', 'মোহিতের মাতা' বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের জীবন্ত চিত্র। মানবের চরিত্ররহস্যে পূর্ণজ্ঞান লাভ না হইলে ঈদৃশ সার্ব্বাঙ্গীন সমাজচিত্র প্রদর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবুর শুভ সম্মিলনের প্রথম নিদর্শন এই বলিদান নাটক।

হইত।* প্রেস হইতে ফিরিতে অবিনাশবাবুর মাঝে মাঝে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। গিরিশচন্দ্র মহা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "পুস্তক ছাপা হইতে বিলম্ব হইলে আমি কোনই ক্ষতি বিবেচনা করিব না, ছাপা এখন বন্ধ থাক্। তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আগে সিরাজদ্দৌলা লেখা শেষ কর। যতদিন না পুস্তক শেষ হইতেছে ততদিন আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। আমার ঘাড়ে যেন ভূত চাপিয়া আছে।"* সিরাজদ্দৌল্লার প্রথম অঙ্ক তিন চারিবার লিখিয়া নির্দ্দয়ভাবে আবার সমস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া লেখেন। এই ভাবে তিনি চারিবার পরিবর্ত্তনের পর সিরাজদ্দৌলার প্রথম অঙ্ক লেখা শেষ হয়।† সিরাজদ্দৌলার সম্পূর্ণ লেখা শেষ হইলে, মহা সমারোহে মিনার্ভা থিয়েটারে উহার অভিনয় আরম্ভ হয়। এই এক সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হইতে স্বত্বাধিকারিগণ যে মূল্যে মিনার্ভা থিয়েটার ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা আদায় হইয়া আইসে। সিরাজদ্দৌলার অভিনয়কালে বড়দিনের জন্য (১১ই পৌষ ১৩১২ সালে) গিরিশচন্দ্র 'বাসর' নামে একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। তাহার পর তিনি 'মীরকাসেম' নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩১৩ সালে ২রা আষাঢ় 'মীরকাসেম' নাটক মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটক একাদিক্রমে সাত মাসকাল প্রতি শনিবার অভিনীত হইয়াছিল, তথাপি একদিনের জন্যও লোক কম হয় নাই। শেষ অভিনয় রজনীতে বহুলোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসেম গিরিশচন্দ্রের প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের সন্ধিস্থলের দুইখানি অমূল্যরত্ন। ঐতিহাসিক নাটকের এত সুখ্যাতি কোন গ্রন্থকারের ভাগ্যে কোনদিন ঘটে নাই। এই বৎসর মিনার্ভা থিয়েটারের আয় লক্ষাধিক টাকা হইয়াছিল। অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় করা হয় বলিয়া যে সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়কে বিশেষ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই দুই নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে একাধিকবার রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র যখন যে নাটক লিখিতেন তখন সেই নাটকের ভাব ও চরিত্রের ভিতর একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। মীরকাসেম লেখা তখন চলিতেছিল, সেই সময় একদিন স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। স্বামীজি সারদানন্দকে

* এখানে একটু বলা নিতান্তই প্রয়োজন যে গিরিশবাবু স্বহস্তে কোন পুস্তকই লেখেন নাই, তিনি বলিয়া যাইতেন অপরে লিখিত। এই সময় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

* বলিদান নাটক লিখিবার পর গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ' নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রায় দুই অঙ্ক শেষ হইবার পর তিনি সংবাদ পান যে ষ্টার থিয়েটারে মিঃ, ডি, এল রায়ের রাণা প্রতাপের মহালা চলিতেছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি উক্ত নাটক রচনা পরিত্যাগ করিয়া সিরাজদ্দৌলা লিখিতে আরম্ভ করেন।

† বস্তুতঃ মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিলিত হইবার পর গিরিশচন্দ্র, যে পর্য্যন্ত মহেন্দ্রবাবুর মনের মত না হইত সে পর্য্যন্ত কোনও দৃশ্য কিংবা অঙ্ক নিজেও ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন না। পুনঃ পুনঃ অঙ্ককে অঙ্ক পরিবর্ত্তিত হইত। ফলে বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাসিম, ছত্রপতি, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের শেষকালের নাটকগুলি শৃঙ্গাররস পরিশূন্য হইলেও নাট্যসম্পদে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নস্বরূপ চিরদিন প্রদীপ্ত থাকিবে।

দেখিয়া গিরিশচন্দ্র মহাপ্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "কি হে, মঠ থেকে কবে এলে? স্বামীজি উত্তর দিলেন, "তিন দিন হলো কলকাতায় এসেছি।"

সারদানন্দের কথায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "তিন দিন কলকাতায় এসেছ, আর আজ এখানে এলে। কলকাতায় যে ক'দিন থাক রোজ একবার করে এস। তোমাদের দেখ্‌লে থাকি ভালো। অনেক দিন ধরে ঠাকুরের কথা হয়নি, একটু recreation আবশ্যক হয়েছে। মীরকাসেম নাটক লিখ্‌ছি, কেবল ষড়যন্ত্র—কেবল ষড়যন্ত্র! প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। ঘুমুলে স্বপ্ন দেখি, মীরকাসেম মুখের কাছে এসে একগাল দাঁড়ী নাড়ছে।"*

গিরিশচন্দ্র জীবনে যত যশঃ ও নিন্দালাভ করিয়াছিলেন একজন মানুষের ভাগ্যে এরূপ ঘটিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সত্য কথা বলিতে গেলে একথা কাহারও একেবারে অস্বীকার করিবার যো নাই যে গিরিশচন্দ্র যে প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহার উপযুক্ত সম্মান তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু বিদেশীয় সুধীবৃন্দের নিকটে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব মিলিটারী সেক্রেটারী লর্ড উইলিয়াম বেরেস্ ফোর্ড ও লাটদরবারের ল'মেম্বর অনারেবল স্কোবল সাহেব গিরিশবাবুর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিতেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার অনারেবল স্কাইন্ সাহেব গিরিশচন্দ্রের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তিনি গিরিশচন্দ্রকে সি. আই, ই, উপাধি প্রদানের জন্য লাটদরবারে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু নাট্যশালা পরিচালনা করার আপত্তি উঠায় সে প্রস্তাব অনুমোদিত হয় না।*

গিরিশচন্দ্রের পাঁচ ভ্রাতা ও ছয় ভগিনী ছিলেন ও নিজেরও উভয় পত্নী গর্ভে অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্তকাল একে একে সব কয়টীকেই টানিয়া লইয়াছিল। থাকিবার মধ্যে শেষে তাহার ছিল কেবলমাত্র একটী জ্যেষ্ঠা ভগিনী, একটী ভ্রাতা ও একটীমাত্র পুত্র।

মহাসন্ধিক্ষণে গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ে প্রাবিষ্ট হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। আজ বিশ্ব জগৎ তাহার প্রতিভার পূজা করিতেছে। গিরিশচন্দ্রের দেব নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' ইংরাজীতে ভাষান্তরিক হইয়া লণ্ডনের 'ফোর্ট" থিয়েটারে বহুদিন অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ নাট্যামোদীর অজস্র সাধুবাদ লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'নল দময়ন্তী' নাটক

---

* চৈতন্যলীলা নাটক রচনার সময়ও গিরিশচন্দ্রের এরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই সময় একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর অৰ্দ্ধ-তন্দ্রা-জড়িত অবস্থায় তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন মস্ত, এক ঢাকামুখো বলরাম, হারে রেরে করিতে করিতে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এই হারে রেরে হইতেই গিরিশচন্দ্র চৈতন্যলীলায় নিতায়ের গান রচনা করিয়াছিলেন।

* আমরা বলি গিরিশচন্দ্র জীবদ্দশায় তাঁহার স্বদেশবাসীর, অন্ততঃ এক শ্রেণীর, যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, কবিকুলচূড়ামণি সেক্স্‌পীয়র উহার শততম ভাগও প্রাপ্ত হন নাই। সকলেই জানেন Prophets are honoured not before their death. প্রকাশক।

ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তথাকার রঙ্গালয়ে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়া নাট্যকলাবিদ ফরাসীদিগের প্রীতি ও বিস্ময় আহরণ করিয়াছে। তাঁহার বিল্বমঙ্গল নাটক মিণ্টের (Mint) দেওয়ান রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং ভগিনী নিবেদিতা তাহা সংশোধন করিয়া দেন। এক্ষণে উহা পাঠ করিয়া বিদেশীয় নাট্যামোদিগণ শত শত সাধুবাদ দিতেছেন। তাঁহার বিষাদ নাটক "দুহিয়া" নামে হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়া এলাহাবাদে বহুদিন অভিনীত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র গিরিশ-প্রতিভা বিস্তারিত করিয়াছে। তাঁহার 'শঙ্করাচার্য্য' গোবিন্দ প্রসাদ নামে জনৈক বিহারবাসী ভদ্রলোক ভাষান্তরিত করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার যশোরাশি ছড়াইয়াছেন। ইহা ব্যতীত বহু ভাষাবিৎ হরিনাথ দে তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার অকালে মৃত্যু হওয়ায় তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। চাণক্য পণ্ডিত সত্যই বলিয়া গিয়াছেন 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।'

মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদানের কিছুদিন পরে একরাত্রে অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্র বাটী ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে মাঠের উপর একজন হিন্দুস্থানী পড়িয়া হুঁ হুঁ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি তখনই একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন, লোকটীর অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে, গায় দিবার কিছুই নাই, একখানি খাটিয়ার নীচে শুইয়া শীত নিবারণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে শীত নিবারণ হইবে কেন। রাত্রি তখন প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছিল, কাজেই কোন উপায় না দেখিয়া গিরিশচন্দ্র শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না, কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমি তো বেশ নরম বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি, আর ঐ ব্যক্তি জ্বরে শীতে খোলা মাঠে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।' প্রভাত হইবামাত্র তিনি একখানি কম্বল ও ঔষধ কিনিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া তবে সুস্থ হন। ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের একজন প্রতিবাসী পরামাণিকের কলেরা হয়। গিরিশচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গেলে সেই পরামাণিক কাতরস্বরে বলিয়া উঠে, "বাবু ওষুধ, বাবু ওষুধ।" গিরিশবাবু ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও যথা সময়ে ঔষধ আসিয়া না পৌঁছায় রোগী এক প্রকার বিনা চিকিৎসায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনার পর তিনি আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন ও বিস্তর টাকার পুস্তক ও ঔষধ ক্রয় করেন। তাহার পর হইতে তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত দীন দরিদ্রের সেবা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী হইবার পর শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবু একদিন গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দাদা, আবার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন কেন?" গিরিশবাবু মৃদু হাসিয়া উত্তর দেন, "থিয়েটারের কার্য্যে এখন আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হয় না, হাতে অনেক সময়। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে হয় স্বার্থ-চিন্তা, নয় পর চর্চ্চায় সময় কাটাইতে হয়। একার্য্যে ব্রতী হইয়া সে কাজ হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং দীন দরিদ্রের উপকার করাও হয়।"

দ্রুত রচনা শক্তিতে গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন। একদিন শনিবার রাত্রে মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয়ের পর পরবর্ত্তী শনিবার একখানি নূতন অপেরা অভিনয় করিবার প্রস্তাব হয়। পরদিন তিনি 'মণি-হরণ' লিখিবেন স্থির করেন, কিন্তু দিবাভাগে বিশেষ কাজে লিখিতে বসা আর ঘটিয়া উঠে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। সে দিন থিয়েটারে প্রফুল্লের অভিনয়, তাঁহাকে যোগেশ সাজিতে হইবে। থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া তিনি কাগজ কলম লইয়া লেখককে তাঁহার সাজিবার ঘরে আসিতে বলিলেন। গিরিশচন্দ্র একবার করিয়া রঙ্গালয়ে বাহির হইয়া প্রফুল্লের ভূমিকা অভিনয় করিতে লাগিলেন। আবার সাজঘরে আসিয়া মণিহরণ রচনা করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লের অভিনয় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মণিহরণ রচনাও শেষ হইয়া গেল। তিনি সেই রাত্রেই মণিহরণের সমস্ত গানগুলি বাঁধিয়া দিয়া তবে বাটী ফিরিয়াছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে অবস্থানকালে কপাল কুণ্ডলাও তিনি এক রাত্রে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিবার ক্ষমতা গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ ছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত গিরিশচন্দ্রের যে দিন প্রথম আলাপ হয়, সেই দিন তিনি তাঁহাকে বলেন, "আপনার পলাশীর যুদ্ধের দ্রুম করি দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' লাইনটী লর্ড বায়রণের Childe Harold হইতে গৃহীত। বায়রণ যেমন ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনিও পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় 'দ্রম করি দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' এ লাইনটী ভাল অনুবাদ হয় নাই।" কবিবর নবীনচন্দ্র মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কিরূপ অনুবাদ করিতেন?" গিরিশচন্দ্র অতি বিনীত স্বরে বলিলেন, "মুখে মুখে সহসা বায়রণের অনুবাদ করা সহজ নহে; তবুও বোধ করি এইরূপ হইলে বায়রণের ভাব কতক বজায় থাকে ঃ—

নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জ্জন,
অস্ত্রধর, অস্ত্রধর,—কামান ভীষণ!"

কবিবর নবীনচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; এবং সেই হইতে তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। নানা কথায় আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি; আশা করি পাঠক পাঠিকা ক্ষমা করিবেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

বার্দ্ধক্য

"My country! In thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory; where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last;
And grovelling in the lowly dust art thou;
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!
Well let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish for thee."

L. V. Derozio

সিরাজদ্দৌলা রচনার পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের দেহ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে তিনি দুরন্ত হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হইতে থাকেন। শীতকালে পীড়া অত্যন্ত প্রবল হইয়া তাঁহাকে একেবারে যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিত। আবার শীত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পীড়াও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিত এবং বসন্ত ঋতুর শেষভাগে তিনি আবার কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেন। কথা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "দেখ, অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনই মমতা নাই। এই দেহের পুষ্টির জন্য কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে উহাকে সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, কিন্তু এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানীকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিয়েছে।"

১৩১৩ সালের ২রা আষাঢ় মীরকাসেম নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

ঐ বৎসর ভাদ্রমাসের শেষ ভাগে গিরিশচন্দ্র আবার দুরন্ত হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন। শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে রোগের যন্ত্রণায় তিনি যখন গৃহে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মিনার্ভার অন্যতম কর্ত্তা মহেন্দ্রবাবু একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া দুঃখ করিয়া বলেন, "মহাশয় সব থিয়েটারেই বড় দিনে নূতন বই হচ্ছে, আপনি পীড়িত, আমরাই কিছু কর্ত্তে পাল্লুম না।"

সেই রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতেও গিরিশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, 'ভাব্‌বেন না, মহেন্দ্রবাবু, যা হ'ক কিছু একটা করে দেব অখন।' মহেন্দ্রবাবু গিরিশবাবুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মোলিয়রের 'L' Amour Medecin' নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া একখানি গীতিনাট্যাকারের প্রহসন লিখিতে অনুরোধ করিলেন। গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্রবাবুর কথায় প্রীত হইয়া সেই দিন হইতে মোলিয়রের সেই নাটকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন ও কয়েক দিবসের মধ্যেই তাহার ছায়া অবলম্বনে 'য্যায়সা কা ত্যায়সা" প্রহসন রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'র অভিনয়ে নাট্যামোদীদের পরম প্রীতি ও হর্ষোল্লাস দেখিয়া, মহেন্দ্রবাবু গিরিশবাবুর পীড়িতকাল পর্য্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্র দ্বারা মোলিয়রের গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকখানি গীতি-নাটক রচনা করান ও তাহা মহাসুখ্যাতির সহিত মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।* গিরিশচন্দ্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণের শ্রুতিমধুর গীত রচনার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার সরলতা ও অকপট শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অতুলবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি নাটক 'নন্দ-বিদায়' তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দেন এবং "আরতো ব্রজে যাবনা ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়," শীর্ষক গানখানির অধিকাংশ স্বয়ং বাঁধিয়া দেন। অতুলবাবুর "সাহাজাদী" গীতি-নাট্যের শেষ ভাগের নাট্যাংশ প্রবল হওয়ায় মহেন্দ্রবাবুর পরামর্শমত গিরিশচন্দ্র উক্ত নাটকের শেষ অঙ্ক স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়া তাঁহার ভাবনা দূর করেন।

নব বৎসর পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র দুরন্ত হাঁপানীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া আবার সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার কয়েক জন বন্ধুবর্গের অনুরোধে "মহম্মদ সা" নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, দুই অঙ্ক লেখাও শেষ হইয়াছিল। কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর মতে "মহম্মদ সা" নাটক তাঁহার লিখিত সিরাজদ্দৌলা নাটকের সহিত

* অতুলবাবু মহেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে মোলিয়রের নাটকের আখ্যানবস্তু জানিয়া তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দৃশ্যাদি স্থির করিয়া শেষে রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। রচনান্তে আবার মহেন্দ্রবাবুর পরামর্শ মত উহা ছাট, কাট ও পরিবর্ত্তিত হইত। এইরূপে মহেন্দ্রবাবুর পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটার সমুদায় থিয়েটাব কর্ত্তৃপক্ষদের অনুকরণের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু বিলাত ও আমেরিকা হইতে ইয়োরোপীয় বিভিন্ন প্রদেশের সুবিখ্যাত নাট্যকারদের গ্রন্থাবলী এবং নাট্যকলা ও রঙ্গালয় সংক্রান্ত বিবিধ গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিয়া তাহা গ্রন্থকার, ষ্টেজ ম্যানেজার, বেশকর, অভিনেতৃবৃন্দ, সঙ্গীতাচার্য্য, নৃত্যাচার্য্য প্রভৃতিকে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে তিনি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চকে ও মিনার্ভা সম্প্রদায়কে এখানকার সাহেবদের পরিচালিত রঙ্গালয় ও সম্প্রদায় অপেক্ষাও উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহেন্দ্রবাবুর সময়ে থিয়েটার বিলাসগৃহ ছিল না, উহা ললিত কলার প্রকৃত রঙ্গস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

কল্পিত ঘটনা ও চরিত্রের অনেকাংশে প্রায় একই হইয়া যাওয়ায়, তিনি ঐ নাটক লেখা বন্ধ করিয়া দেন, এবং মহেন্দ্র বাবুর পরামর্শে ও অনুরোধে 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। অতি সত্বরই তিনি এই নাটক লিখিয়া শেষ করেন।* ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে 'ছত্রপতি শিবাজী' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মহালা আরম্ভ হয়। ছত্রপতির মহালা যখন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, সেই সময় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এক মস্ত 'ওলোট পালোট' আরম্ভ হয়।

১৩১৪ সাল সাধারণ রঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাসে একটী স্মরণীয় বৎসর। ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমেই নদীয়ার কুড়ুলগাছির সুবিখ্যাত জমীদার হাইকোর্টের উকীল পণ্ডিতপ্রবর প্রসন্নকুমার রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বি, এ, এক লক্ষ আট হাজার টাকার প্রকাশ্য নীলামে 'গোপাল লাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার ক্রয় করেন। মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুবিদ্বান্ ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ব্যক্তিকে রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়া এখন আর কেহই রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃত্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ নহেন। শরৎ বাবুও মনোমোহন এবং মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় আদর্শ থিয়েটার সঞ্চালনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি থিয়েটার ক্রয় করিয়া বঙ্গ রঙ্গালয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের একত্র সমাবেশ করেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর এরূপ সমাবেশ পূর্ব্বে আর কখন কোন রঙ্গালয়ে হয় নাই। অভিনেতা অভিনেত্রী সমাবেশের পর শরৎ বাবু কার্য্য-সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষের বিশেষ অভাব অনুভব করিতে লাগিবেন। শরৎ বাবুর পিতা একজন বহুদর্শী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিতেন, "যদি আদর্শ নাট্যশালা স্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে গিরিশ বাবুর ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ কর।"

শরৎ বাবুও গিরিশ বাবুকেই অধ্যক্ষের পদে বরণ করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। পিতার কথায় তাঁহার উৎসাহ আরও শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। তিনি দশ হাজার টাকা বোনাস ও চারিশত টাকা বেতনে গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। শরৎ বাবু এই থিয়েটার ক্রয় করিয়া ইহার আগাগোড়া সংস্কার করিয়া ইহার নাম দিলেন 'কোহিনুর থিয়েটার'। ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসের শেষে গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটারের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন এই থিয়েটারে আসিয়া যোগদান করিলেন, তখন বাটীর সংস্কার পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই।

* এ সময়ে মহেন্দ্রবাবু প্রায় অধিক সময় গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থাকিতেন। দৃশ্যাদি প্রকটনের কথা আগেই পূর্ণমাত্রায় আলোচিত হইয়া পশ্চাৎ নাটক লিখিত হইত। শিবাজী সম্বন্ধে যত কিছু মুদ্রিত গ্রন্থ তখন ছিল ও তৎসংক্রান্ত যত কিছু কাগজপত্র ও দলিলদস্তাপেজ ভারতের নানাদেশে ও বিলাতে India House-এতে পাওয়া গিয়াছিল, তৎসমুদায়ই পঠিত ও আলোচিত হইয়া ছত্রপতি বিরচিত হইয়াছিল, সিরাজদ্দৌলা এবং মীরকাসেমও ঐরূপ বহু পরিশ্রম সুচিন্তাব ফল। বস্তুতঃ এই তিনখানি গ্রন্থ যেমন প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক তেমনই প্রকৃত ইতিহাস।

দৃশ্যপট, সাজ সরঞ্জাম, পোষাক পরিচ্ছদ আগাগোড়া সকলেরই অভাব। খ্যাতনামা নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় এই থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য যে চাঁদবিবি নাটক লিখিতেছিলেন তাহারও এক অঙ্ক তখনও লিখিতে বাকী। গিরিশচন্দ্রের বিপুল উদ্যমে, ও দিবারাত্র পরিশ্রমে সমুদায় অনিয়ম ও ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত কার্য্য সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিল। চাঁদ বিবির পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের পর হইতে তিনি স্বয়ং লিখিয়া পুস্তক শেষ করিলেন ও দিবারাত্র মহালা দিয়া সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গ রঙ্গালয়ের আদি ষ্টেজ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর, গিরিশচন্দ্রের উপদেশ ও সাহায্যে দ্বিগুণ উৎসাহে বাটীর সংস্কার কার্য্য শেষ করিতে লাগিলেন।

কোন শুভ অনুষ্ঠান হিন্দুর পক্ষে ভাদ্র মাসে নিষিদ্ধ, কাজে কাজে যেমন করিয়াই হউক শ্রাবণ মাসের মধ্যেই থিয়েটার খুলিতে হইবে, কেননা আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে স্বত্বাধিকারীকে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র চিরকালই অসাধ্যসাধন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নিকটে কোন কার্য্যই অসাধ্য ছিল না। পলিত-কেশ বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় দিন রাত্র পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া সম্প্রদায়ের উৎসাহ শত গুণে বাড়িয়া গেল এবং তাঁহারা তাঁহাদের নিজের নিজের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এক মাসকাল অদম্য পরিশ্রমে গিরিশ বাবু সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। ১৩১৪ সালের ২৬শে শ্রাবণ, রবিবার, কোহিনুর থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ে মহাসমারোহে চাঁদবিবি অভিনীত হইল। গিরিশচন্দ্র এই চাঁদবিবি নাটকের গান গুলিতে একটু নূতনত্ব করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে সুপ্রসিদ্ধ প্রোফেসর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া চাঁদবিবি নাটকের সঙ্গীতগুলি সুদক্ষভাবে ঐকতান বাদনের সহিত গঠিত করিয়া দে'ন। নাটকের গানেব সহিত ঐকতান বাদন রঙ্গালয়ে এই প্রথম। এই নূতনত্বে দর্শকমণ্ডলী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কোহিনুর থিয়েটারের যে দিন প্রথম অভিনয় হয় সেই দিন রাত্রে ২২৫০৲ দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়।

২৬শে শ্রাবণ, রবিবার, কোহিনুর থিয়েটার খোলা হইল। উহারই ঠিক পরের শনিবার অর্থাৎ ৩২শে শ্রাবণ মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি শিবাজীর প্রথম অভিনয় হইল। মিনার্ভা থিয়েটারেও মহেন্দ্র বাবুর পরিচালনায়, গিরিশচন্দ্রের অভাবেও, অভিনয়ের কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত চলিতেছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার ছত্রপতি শিবাজী শীঘ্রই মহালা দিয়া কোহিনুর থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ২৮শে ভাদ্র হইতে ছত্রপতি শিবাজী নাটকের অভিনয় কোহিনুর থিয়েটারে আরম্ভ হইল।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে স্বয়ং ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে একেবারে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। দুইটী প্রথম শ্রেণীর থিয়েটারে এক সময়ে শিবাজীর অভিনয় হওয়ায় সে সময় নাট্য জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, শিবাজীর ন্যায় ঐতিহাসিক নাটক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অতি অল্পই অভিনীত হইয়াছে। এই নাটক সম্বন্ধে দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বেঙ্গলী কাগজে লিখিয়াছিলেন, 'Chhatrapati is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian Stage."

মহারাষ্ট্রের সুসন্তান শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁহার সম্পাদিত হিতবাদী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় কৃতী ও প্রবীণ নাট্যকার "ছত্রপতি" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া ও রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তিনি মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের চিত্র অঙ্কনে বিশেষরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি। মহারাষ্ট্রীয়েরা ছত্রপতি শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশ বাবুর নাটকে তাহা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার সহচর ও কর্ম্মচারিগণের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে।"

সত্যই শিবাজীর অভিনয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল যে সে সময় বাঙ্গালায় এমন একখানিও সংবাদ পত্র ছিল না যাহাতে তাহার সুখ্যাতি প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গবাসী পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কেবলমাত্র একটী ছত্র নিম্নে প্রদান করা হইল। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে বঙ্গবাসী ঐ পুস্তকের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই এক লাইন এই. "তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে শরৎ বাবু কোহিনুর থিয়েটার খুলিয়াছিলেন. তাহার অল্পদিন পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই একটী আঘাতেই শরৎ বাবু অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহার অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন তাঁহার অবিলম্বে বায়ু পরিবর্ত্তন করা নিতান্তই প্রয়োজন।

শরৎ বাবু বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গেলেন। কিন্তু অনেক চিকিৎসা ও অনেক স্থলের বায়ুপরিবর্ত্তন সত্ত্বেও শরৎবাবুর রোগের উপশম হইল না। থিয়েটার খুলিবার ছয় মাস যাইতে না যাইতেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পৌষ মাসে শরৎ বাবুর যখন মৃত্যু হইল, তখন গিরিশচন্দ্রও দুরন্ত হাঁপানীর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহে আবদ্ধ।

কি কুক্ষণে যে শরৎ বাবু কোহিনুর থিয়েটার করিয়াছিলেন ভগবান তাহা বলিতে পারেন। এমারেল্ড থিয়েটার কিনিবার পর হইতেই তাঁহাদের সংসারের উপর বিপদ

যেন করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছিল। শরৎ বাবু তো নিজে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেলেন, তাঁহার চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংসারও ছারখার হইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এক মাসের ভিতর তাঁহাদের সংসারের উপর দিয়া মৃত্যুর যেন একটা তাণ্ডব নৃত্য চলিয়া গেল। শরৎ বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোহিনুর থিয়েটার জাঁক জমকের সহিত খোলা হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল দেউটী মিট মিট করিয়া থামিল। অল্পদিন যাইতে না যাইতে তাহা যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি দপ করিয়া নিবিয়া গেল।

শরৎ বাবুর মৃত্যুর পর শরৎ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় বি. এ., শরৎ বাবুর এষ্টেটের একজিকিউটর নিযুক্ত হইয়া থিয়েটারের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিলেন।

অকস্মাৎ শরৎ বাবুর মৃত্যুতে ও গিরিশচন্দ্র হাঁপানী রোগে গৃহে আবদ্ধ থাকায়, কোহিনুর থিয়েটারের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা, চারিদিকে কলহ গণ্ডগোল। সকলেই কর্ত্তা, কেহ কাহার হুকুম শুনিতে চাহে না। গিরিশ বাবু হাঁপানী পীড়ায় অস্থির, নূতন নাটক লেখা এ অবস্থায় তাহার পক্ষে অসম্ভব। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কত চেষ্টা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র কিছুতেই আর নূতন নাটক লিখিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার হাঁপানী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের আয় দিন দিন কমিতে আরম্ভ হইল, থিয়েটার আর চলে না!

শিশির বাবু পাড়াগাঁয়ের জমিদার, বড় লোকের সন্তান। তিনি থিয়েটার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেন না, এ কাজ তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন। গিরিশ বাবুর শক্তি কি, তিনি কি করিতে পারেন না পারেন তাহার বিন্দু-বিসর্গও শিশির বাবুর ধারণা ছিল না। গিরিশচন্দ্র সুস্থ হইয়া আর কত দুর কার্য্যক্ষম হইবেন, সে বিষয় তাঁহার মনে মনে বিশেষ সন্দেহ হওয়ায় তিনি গিরিশ বাবুর বেতন বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার এইটাই হইয়াছিল দৃঢ় ধারণা যে গিরিশচন্দ্রকে মাস মাসে যে চারিশত টাকা দেওয়া হইতেছে তাহা একেবারে নিরর্থক। ভগবান্ যখন মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন মানুষের পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে, শিশির বাবুর যে হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি। উপর্য্যুপরি তাগাদা করিয়া কোন ফল না পাইয়া গিরিশচন্দ্র ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কোহিনুর থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। শিশির বাবু একটী ভুলে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিলেন। বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে!

শিশির বাবু বুঝিলেন, এ অথর্ব্ব বৃদ্ধকে মাসিক চারিশত টাকা বেতন দিয়া থিয়েটারে রাখাই তাঁহার দাদার একটা মস্ত ভুল হইয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই ভুল সংশোধন করিলেন। বস্তুতঃ গ্রাজুয়েট হইলেও শিশির বাবু নাট্যকলায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন সুতরাং গিরিশ বাবুর নিত্য প্রোজ্জ্বল অগাধ অসীম প্রতিভার প্রকৃত জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে হইবে?

এদিকে ফাল্গুন মাসের বসন্তের হাওয়া বহিবার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরও রোগ ক্রমশঃ উপশম হইতে লাগিল। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। গিরিশ চন্দ্র একেবারে ধারণা করিতেই পারেন নাই যে শিশির বাবু তাঁহাকে আর চাহেন না, তিনি তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিলেন না। একটু সুস্থ হইয়াই তিনি কোহিনুর থিয়েটারের জন্য "ঝান্সির রাণী" নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই নাটকের দুই অঙ্ক লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় একজন পুলিশের উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেই ভদ্রলোক, গিরিশচন্দ্র ঝান্সির রাণী লিখিতেছেন, শুনিয়া বলিলেন, "আপনি আর ঐতিহাসিক নাটক লিখিবেন না।" ঐ পুলিশ কর্ম্মচারীর কথায় গিরিশচন্দ্র ঝান্সির রাণী" নাটক লিখিতে বিরত হইয়া একখানি সামাজিক নাটক* লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ নাটকের যখন চারি অঙ্ক লেখা শেষ হইল তখন তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, কোহিনুর থিয়েটারের নিকট তাঁহার তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে। তিনি উপর্য্যুপরি তাঁহার প্রাপ্য বেতনের জন্য তাগাদা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই তাগাদায় শিশির বাবু কর্ণপাতও করিলেন না। শিশির বাবু শরৎ বাবুর দেনা ও থিয়েটার লইয়া মহাবিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি একেবারেই বুঝিতে পারিলেন না যে গিরিশচন্দ্রের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, তাঁহার সাহায্য লাভে সকল দিক্ তিনি গুছাইয়া লইতে পারিতেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষতঃ মহেন্দ্র বাবু, গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত মূল্য জানিতেন। তাঁহারা যেমন শুনিলেন যে গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, অমনি মহেন্দ্র বাবু গিরিশচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহাকে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোহিনুরে গিরিশ বাবুকে কিরূপ অপদস্থ হইতে হইয়াছে সব বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহারা উভয়ে আজীবন কার্য্যক্ষেত্রে একত্র থাকিবার জন্য, বেতন ব্যতীত থিয়েটারে গিরিশ বাবুর একটি অংশের প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে ১৩১৫ সালের শ্রাবণ মাসে গিরিশচন্দ্র মাসিক চারিশত টাকা বেতন ও খরচ খরচা বাদে লাভের পঞ্চমাংশের অধিকারী হইয়া আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিলেন। আবার মিনার্ভায় রত্ন-কাঞ্চন সমাযোগ হইল।

মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই তিনি 'শাস্তি কি শান্তি' একখানি বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত সামাজিক নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য রচনা

---

* ইহাই গিরিশচন্দ্রের পরলোক প্রাপ্তির পর মিনার্ভায় অভিনীত গৃহলক্ষ্মী।

* স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বিধবা বিবাহ নাটক' হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। ইহাতে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা কিছু বক্তব্য আছে সমুদায়ই সুপ্রবীণ নাট্যকার নাটকের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সামাজিক সাহিত্য হিসাবেও 'শাস্তি কি শান্তি' একখানি অতুলনীয় মহামূল্য গ্রন্থ।

করিলেন।* এই নাটকের শিক্ষাদানের পরিশ্রমে শীত পড়িবার মুখেই তিনি আবার হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হইলেন ও সমস্ত শীতকাল ব্যাপী এই রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। প্রতি বৎসরই শীতের প্রারম্ভে দারুণ হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ডাক্তারগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হইবে। সেইজন্য পর বৎসর শীতের প্রারম্ভেই অর্থাৎ আশ্বিন মাসে তিনি কাশীধামে যাইয়া সমস্ত শীতকাল যাপন করেন। ১৩১৬ ও ১৩১৭ এই দুই বৎসরই সমস্ত শীতকালটা তিনি কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসরে তিনি দুইখানি নাটক মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালে তিনি 'অশোক' নামক ঐতিহাসিক নাটক ও ১৩১৬ সালে তিনি 'শঙ্করাচার্য্য' নামক জ্ঞান ও ভক্তিমূলক ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। গিরিশ জীবনের মধ্যযুগে চৈতন্যলীলা ও বুদ্ধদেব নাটক অভিনয়ে যেরূপ রঙ্গালয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, শেষ জীবনে শঙ্করাচার্য্য নাটকও সেইরূপ নাট্য জগতে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের সুপরিপক্ক লেখনীর সুরস প্রবল উচ্ছ্বাসে শঙ্করাচার্য্যে পূর্ণাঙ্গ নাট্যগরিমার সঙ্গে সুকঠিন নিগূঢ় বেদান্তধর্ম্ম এরূপ সরল হইয়াছিল যে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শঙ্করাচার্য্য দেখিবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের অভিনয় দেখিয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'আপনি কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বেদান্তের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার শিক্ষা ও দীক্ষার!" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপা লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বিশ্বতোমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে বিষয়েই লেখনী ধারণ করিতেন তাহাই তাঁহার লেখনীমার্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঈশ্বরের যে বিশেষ অনুগ্রহ তাঁহার উপর ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কাশীবাসে দুই বৎসর শীতকালে দুরন্ত হাঁপানী পীড়ার হস্ত হইতে গিরিশচন্দ্র অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাঁহার শরীর বরাবরই সুস্থ ছিল। কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহার বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবার বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। তাহার একটি বিশেষ কারণও ছিল। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকগণ তাঁহার অমোঘ ঔষধ-প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়া আশ্রমের কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রকেই তাঁহার চিকিৎসাধীন রাখিতেন। গিরিশচন্দ্রের চিকিৎসার কথা অতি শীঘ্রই সমস্ত কাশীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাশীর বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেন।

কাশীধামে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ হইতে কিছু দূরে সিকরোলে বাবু রামপ্রসাদের বাগান-বাটীতে এই দুই বৎসর গিরিশচন্দ্র অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীতে আসিয়া প্রত্যহ তিনি ভোরে উঠিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত রোগিগণের ব্যবস্থা করিয়া বেলা বারটার সময় স্নানাহারাদি করিতেন। কাশীতে এই দুই বৎসর

গিরিশচন্দ্র বড়ই আনন্দে কাটাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সেবকগণ ও কাশীর অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যহই তাঁহার বাটীতে আসিতেন ও বহু রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। কাশীতে অবস্থানকালে শঙ্করাচার্য্যের কিয়দংশ ও সমস্ত 'তপোবল' তিনি রচনা করেন। ইহা ব্যতীত 'লীলা' নামক গল্প ও নাট্য-মন্দিরে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই তাঁহার কাশীধামে অবস্থানকালে রচিত।

১৩১৮ সালে সরকার বাহাদুর গিরিশচন্দ্রের রচিত সিরাজদৌল্লা, মীরকাসেম ও ছত্রপতি উত্তেজক নাটক বলিয়া অভিনয়, বিক্রয় ও পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। মিনার্ভা থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়দ্বয় এযাবৎ এক সঙ্গেই থিয়েটার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাস হইতে মহেন্দ্র বাবু মনোমোহন বাবুর নিকট হইতে থিয়েটারের লীজ লইয়া একাই থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। সহসা এই পরিবর্ত্তন হওয়ায় থিয়েটারের ভিতর বিশেষ একটু গোলযোগ হইয়া পড়ে। ২রা আষাঢ় শনিবার অতুল বাবুর 'রকমফের' নামক নূতন গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয় রজনী বিজ্ঞাপিত হয়।* কিন্তু নাটকের যিনি নায়কের অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি এবং আরও কয়েকজন অভিনেতা বৃহস্পতিবার রাত্রে কার্য্য পরিত্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। শুক্রবার প্রাতে মহেন্দ্র বাবু গিরিশ বাবুর বাটী উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আনুপূর্ব্বীক সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "এখন কি উপায় করা যায়, তাহারই একটা সৎপরামর্শ দিন।" মহেন্দ্র বাবুর নিকটে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "এমন ধাপ্পা! তা এর জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই, চলুন, দেখিগে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে।"

কর্ম্মবীব গিরিশচন্দ্র তখনই মহেন্দ্র বাবুর সহিত থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃবর্গ আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং সেই পুস্তকের নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশৃঙ্খল সম্প্রদায়কে আবার শৃঙ্খলের ভিতর আনিলেন। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাহার এই অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যক্ষমতা তাঁহাকে রঙ্গালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। অন্য থিয়েটার যে তাঁহার থিয়েটারকে কোন অংশে ক্ষুণ্ণ করিবে ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদা শরীরের জন্য খুত খুত করিতেন বটে, কিন্তু একবার কার্য্যসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলে আর তাঁহার কিছুই জ্ঞান থাকিত না।

উপর্য্যুপরি অভিনয়, থিয়েটারের সর্ব্ব বিষয় তত্ত্বাবধান ও একসঙ্গে দুইখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন লিখিতে আরম্ভ করায় তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল। সকলেই

---

* মহেন্দ্রবাবুর উপদেশ মত ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত নাট্যকার সেরিডনের "School for Scandal" নাটকের ছায়া লইয়া অতুলবাবু এই নাটক রচনা করেন।

তাঁহাকে এত পরিশ্রম করিতে বারবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করিলে গিরিশচন্দ্র কোন দিনই কাহারও নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না, এবারও শত নিষেধ উপেক্ষা করিলেন। তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যেন একেবারে কর্ম্মে লীন হইয়া গেলেন। বস্তুত এবৎসর মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্র কুমারের সুপরিচালনায় সোয়া লক্ষ টাকার অধিক আয় হইয়াছিল। এত অধিক আয় ইহার পূর্ব্বে কোনও থিয়েটারে কখনও হয় নাই। জ্ঞানী ও শক্তিমান্ ব্যক্তির হস্তে ব্যবসায়মাত্রই এইরূপ লাভবান্ হইয়া থাকে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কোহিনুর থিয়েটার ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হয়। মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে এক লক্ষ এগার হাজার টাকা দিয়া উক্ত থিয়েটার খরিদ করেন। গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটারের জন্য যে সামাজিক নাটকখানির চারি অঙ্ক লিখিয়াছিলেন তাহার শেষ অঙ্ক আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মহেন্দ্রবাবুর পরলোক গমনের পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে আবার যখন মিনার্ভা থিয়েটার গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁহার বিশেষ অনুরোধে গিরিশচন্দ্রের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ নাটকের শেষ অঙ্ক লিখিয়া ঐ নাটক সম্পূর্ণ করেন ও উক্ত নাটক বিশেষ সমারোহের সহিত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকের নাম গৃহলক্ষ্মী প্রদান করা হইয়াছিল। গৃহলক্ষ্মীই গিরিশচন্দ্রের শেষ অভিনীত নূতন নাটক।

প্রথম যৌবনে নিমচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বার্দ্ধক্যে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত, বহু নাটকে বহু ভূমিকা অভিনয় করিয়া, গিরিশচন্দ্র অভিনয় কলার পূর্ণ বিকাশ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে পুস্তকে যে ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই ভূমিকা আর তেমন অভিনয় হয় নাই, হইবার আশাও আর দেখি না। যৌবনে গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশীতে' নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম 'রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর লীলাবতীতে ললিত, কৃষ্ণকুমারীতে ভীমসিংহ, মেঘনাদবধে রাম ও মেঘনাদ, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইব, মৃণালিনীতে পশুপতি, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহ, হামিরে হামির, আনন্দ রহোতে বেতাল, রাবণবধ, সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণ বর্জ্জনে রাম, রামের বনবাসে দশরথ, অভিমুন্যবধে দুর্য্যোধন এবং মাধবীকঙ্কণে সাতটা বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিলেন। জীবনে কোনদিন তাঁহার প্রতিভার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। যৌবনের পূর্ণ বিকাশ ও প্রৌঢ় সন্ধিতে তিনি দক্ষযজ্ঞে দক্ষ, ম্যাকবেথে ম্যাকবেথ, কালাপাহাড়ে চিন্তামণি, মায়াবসানে মণিকিঙ্কর, পাণ্ডবগৌরবে কঞ্চুকী, সীতারামে সীতারাম, ভ্রান্তিতে রঙ্গলাল এবং কপালকুণ্ডলায় পাঁচটি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করিয়া নাট্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অপর অভিনেতা কর্ত্তৃক দক্ষতার সহিত অভিনীত অনেক ভূমিকাও স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শনে অভিনয় করিয়াছিলেন। নীলদর্পণে উড্সাহেব, বিল্বমঙ্গলে সাধক,

নসীরামে নসীরাম, প্রফুল্লে যোগেশ, হারানিধিতে হরিশ, জনায় বিদূষক প্রভৃতির ভূমিকা পূর্ব্বে ক্ষমতাশালী অভিনেতা কর্ত্তৃক অতিসুচারুরূপে অভিনীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র পরে আবার এই সকল ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিচিত্র অভিনব চরিত্র বিশ্লেষণ প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাহার পর বার্দ্ধক্যে বলিদানে করুণাময়, সিরাজদ্দৌল্লায় করিম চাচা, দুর্গেশনন্দিনীতে বীরিন্দ্রসিংহ, মীরকাসেমে মীরজাফর ও ছত্রপতি শিবাজীতে আওরঙ্গজেবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ছিলেন।* তাঁহার বার্দ্ধক্যের এই সকল ভূমিকার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার অদ্ভুত কলানৈপুণ্যক্ষমতার কথা শতমুখে কীর্ত্তিত করিয়াছেন। বিধি দত্ত যে শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন শেষ দিন পর্য্যন্ত সে শক্তি হইতে ভগবান্ তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই। যতই দিন গিয়াছে ততই তাঁহার সেই শক্তি, সেই প্রতিভা, ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া বিমল যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। সেই সময় উক্ত নাটকে গিরিশচন্দ্র দুই রাত্রি চন্দ্রশেখর, একরাত্রি শ্রীনাথ ও দুই তিনটি প্রতিবাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকবৃন্দকে অভিনয় কলার এক বিচিত্র অভিনব মহিমমণ্ডিত ললিত মাধুরীময় গরিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র আর ইহজগতে নাই, কর্ম্মময় জীবনের অবসানে বহুদিন তিনি দেবলোকে মহাশান্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে সেই অভিনয় এখনও তেমনই উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-নৈপুণ্য যে একবার দেখিয়াছে সে জীবনে কখন তাহা ভুলিতে পারিবে না।

গিরিশচন্দ্র জন্মিয়া ছিলেন বঙ্গে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁহার কার্য্য শেষ হইল, আর কি তিনি থাকিতে পারেন! কার্য্য শেষে মহাকবি তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদে বিলীন হইয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনী বলিবার বিস্তর আছে, কিন্তু সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলা আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে। তবে যাহা না বলিলে নহে তাহাই কেবল আমরা বিবৃত করিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের জীবনে যাহা আমাদের বলিবার ছিল প্রায় আমরা তাহার সকলই বলিয়াছি। এক্ষণে কেবল মাত্র আর একটী প্রসঙ্গ বলিয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিব।

---

* যাঁহারা গিরিশচন্দ্রের বার্দ্ধক্যে বলিদানে করুণাময়ের ভূমিকায় স্বীয় গৃহিণী সরস্বতীর সহিত কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কাগজে বিবাহের দ্রব্যাদির ফর্দ্দকরণ, হিরণ্ময়ীর জলনিমজ্জন দৃশ্যের শেষভাগে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া "এই যে খুঁজে পাওয়া গেছে, তাইত বলি আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না!" এই বলিয়া সেই উন্মত্তাবস্থাতেও আশ্বস্তভাব প্রদর্শন—আবার পরক্ষণেই গভীর শোকে শুষ্ককণ্ঠে "মা, মা, অন্ন দিতে পারি নাই, এই যে আকণ্ঠ জলপান করেছ।" বলিয়া ঘূর্ণিত মস্তিষ্কে বসিয়া পড়ন, বিকৃত মস্তিষ্কে উকিল বাড়ী গিয়া সহিকরণ, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার এই অননুকরণীয় অভিনয়-কলা-নৈপুণ্য কখনও কি ভুলিতে পারিবেন।

১৩১৮ সালের ৩০শে আষাঢ় শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে বলিদানের অভিনয়ে করুণাময়ের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র ঘোষ গ্রহণ করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই দুর্য্যোগে থিয়েটারের লোকসংখ্যা অল্পমাত্র হইয়াছিল, বোধ হয় সে দিন পঞ্চাশ টাকারও টিকিট বিক্রয় হয় নাই। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এ দুর্য্যোগে ও এত অল্প বিক্রয়ে আপনার আর শুধু শুধু অভিনয় করিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই। আপনার শরীর ভাল নেই। সকাল সকাল বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় দেখিবার জন্য সেই মুষলধারে বৃষ্টি বলিয়াও দর্শক সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় চারিশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র তখন মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "এই ভীষণ দুর্য্যোগে জল ঝড় উপেক্ষা করিয়াও যাঁহারা আমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন আমি তাঁহাদের কিছুতেই বঞ্চিত করিতে পারিব না। তাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় উপায় কি?" মহেন্দ্রবাবুর প্রাণ যেন বলিতেছিল আজ গিরিশচন্দ্রকে অভিনয় করিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে, আজ অভিনয় করিলে এই অভিনয়ই তাঁহার শেষ অভিনয় হইবে। মহেন্দ্রবাবু পুনরায় এই জল ঝড়ে গিরিশচন্দ্রকে অভিনয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিষেধ মানিলেন না, অভিনয়ের জন্য রঙ্গালয়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। মহেন্দ্রবাবুর প্রাণ সেদিন সত্যই অনুভব করিয়াছিল, সেই অভিনয়ই গিরিশচন্দ্রের শেষ অভিনয় হইল। করুণাময়ের চরিত্র অভিনয় করিতে হইলে বহুবার নগ্নগাত্রে রঙ্গমঞ্চে বাহির হইতে হয়। অভিনয় করিয়া বাটী ফিরিবার পরই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সেই ভীষণ রজনীর শীতল বায়ুস্পর্শে তাঁহার বিশেষ ঠাণ্ডা লাগিল। সেই ঠাণ্ডা লাগাই তাঁহার কাল হইল। পরদিন হইতেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু শরীরের গ্লানি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে হাঁপানীও আসিয়া দেখা দিল। ভাদ্রমাস হইতে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুবর্গের পরামর্শে তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাসের চিকিৎসাধীন হইলেন। শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই, আপনাকে শীঘ্রই নীরোগ করিয়া সুস্থ দেহে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের অভ্যাস করাইব।" শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসানৈপুণ্যে গিরিশচন্দ্র দিন দিন আরোগ্যলাভের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বকার দুই বৎসরের মত এ বৎসরও কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায় সুবিধা হইবে বলিয়া এই যাই যাই করিতে করিতে কার্ত্তিকমাস কাটিয়া গেল। এদিকে গিরিশচন্দ্রও শরীরে বেশ একটু সুস্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের নিষেধ, তিনি একেবারেই অধিক নড়িতে চড়িতে পারিবেন না; সেইজন্য তিনি এই অবস্থাতেও বাটীতে অভিনেতৃবর্গকে আনাইয়া তপোবলের অল্প অল্প শিক্ষাদান কার্য্য সমাধান করিতে লাগিলেন।

প্রথম প্রথম কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল শেষভাগে আর তেমন কোন ফলই দর্শিল না। শীতের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের রোগেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে তখন এত বেশী শীত পড়িয়াছে যে সেই দারুণ শীতে পশ্চিমের দুর্দ্দান্ত শীতের ভিতর যাইতে কোন চিকিৎসকই পরামর্শ দিলেন না, উপরন্তু সমস্ত চিকিৎসকগণই তখন পশ্চিমে যাইতে নিষেধ করিলেন। শীতকালে কলিকাতা মহানগরী সন্ধ্যার পর হইতেই দারুণ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই ধূম নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া হাঁপানী রোগীর বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। আবার যে পল্লীতে বস্তির সংখ্যা বেশী সেখানে এই ধূমও অধিক পরিমাণে জমিয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের বাটীর সম্মুখেই প্রকাণ্ড বস্তি থাকায় সন্ধ্যার পর ধূমে তাঁহাদের পাড়াটা একেবারে অন্ধকার করিয়া রাখিত। গিরিশচন্দ্র কোনদিনই দরজা জানালা বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং এই ধূমের উৎপাত তাঁহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। শীতের দরুণ পশ্চিমে তো যাওয়া হইলই না।, কলিকাতার আশেপাশে এমন ভালো স্থানও পাওয়া গেল না যেখানে যাইয়া তিনি এই ধূমের হস্ত হতে পরিত্রাণ পান।* যখন কালের ডাক আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহার কাল মহিষটা শিং নাড়িয়া নৃত্য করিতে থাকে, মানুষ তখন আপনা হইতেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, কোন দিকেই কোন রূপ সুবিধা দেখিতে পায় না। গিরিশচন্দ্রেরও তাহাই ঘটিল, চারিদিক হইতে যেন সকল রকম অসুবিধা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। চিকিৎসা, ঔষধ কিছুতেই কিছু হইল না, তিনি ধীরে ধীরে কালের কঠিন কোলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার বিশেষ কোন ফল না পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীন হইলেন। তাঁহার বহুদিনের বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বরাট মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ হ্যোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইয়ুনান সাহেবকে লইয়া গিরিশচন্দ্রের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্রের আজন্ম অনুরাগ ছিল, তিনি নিজেও ঐ চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, ডাক্তার ইয়ুনান তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় এবং সতীশ বাবুর নিকট গিরিশচন্দ্রের উক্ত চিকিৎসায় অভিজ্ঞতার কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন তাহার নাম তাঁহার নিকট হইতে গোপন রাখিতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অনুমান করিয়া যে দু'একটা ঔষধের নাম করিতেন আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার ভিতর ডাক্তারের প্রদত্ত ঔষধের নাম

* ১৩১৬ সালে মাঘমাসের শেষভাগে প্রথম কাশীধাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় ধূমের উৎপাতে গিরিশচন্দ্র ঘুঘুডাঙ্গার সাহিত্যিক ও সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার 'সুরেন্দ্র কুটীরে' গিয়া ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস বাস করেন। সুরেন্দ্রবাবুর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরিচর্য্যা অবর্ণনীয়। এ বৎসরও পুনরায় ঘুঘুডাঙ্গা যাইবার কথা হয়, কিন্তু তথায় প্রচণ্ড বেগে ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছিল বলিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল।

থাকিত। যাহা হউক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অধীনে কিছুদিন থাকিবার পর রোগ ক্রমে নিরাময় হইয়া আসিল; কিন্তু তখনও তিনি খুব দুর্ব্বল, চিকিৎসকের পরামর্শে রোজ গাড়ী করিয়া প্রাতে একটু করিয়া বেড়াইয়া আসিতেন। এই ভাবে যখন মাঘ মাসের অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল তখন সকলেরই আশা হইল, এবৎসরও ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেল। কিন্তু হায় মানুষ কত আশা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কয়টা আশাইবা পূর্ণ হয়! নেপথ্যে বসিয়া অনন্ত শক্তি লইয়া যে অনন্ত পুরুষ এই বিশ্বটাকে নাচাইতেছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষের কত আশা, কত সঙ্কল্প জল বুদ্‌বুদের মত জলের উপর উঠিয়া আবার জলেই মিলাইয়া যায়!

দ্বিতীয়বার পত্নী বিয়োগের পর হইতে গিরিশচন্দ্র আর বাটীর ভিতর শুইতে যাইতেন না, বৈঠকখানায় শয়ন করিতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দ্বিতল বৈঠকখানার একধারে কতকটা স্থান কাঠের প্রাচীর দিয়া পৃথক্ করিয়া শয়নাগার করিয়া লইয়াছিলেন। এই বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের শত শত স্মৃতি জড়িত। ইহাই তাঁহার অধ্যয়নাগার, ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়। সংসারের নানাবিধ ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তির পর এইখানে আসিয়াই তিনি পরম শান্তিলাভ করিতেন। এই কক্ষই তাঁহার অমর কাব্যকলার লীলাভূমি। এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া মহাতীর্থ হইয়া আছে। এইখানেই মহাপুরুষের অন্তিম নিশ্বাস অনন্তের সহিত মিলিত হইয়াছে।

২০ শে মাঘ শনিবার আহারাদির পর গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন। সহসা গিরিশচন্দ্র অবিনাশ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন। "তুমি কি কোথায়ও বেরুবে?"*

অবিনাশ বাবু গিরিশচন্দ্রের ডাক শুনিয়াই উঠিয়া বসিয়া ছিলেন, বলিলেন, "না"।

গিরিশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "কাজ থাক্‌লেও কোথায়ও বেরিও না, আমার শরীরটা বড়ই অসুস্থ বলে বোধ হচ্ছে।

বেলা যখন চারিটা গিরিশচন্দ্র তখন, অবিনাশ বাবুকে ডাকিয়া টেমপারেচার লইতে বলিলেন। অবিনাশ বাবু টেমপারেচার লইয়া দেখিলেন জ্বরের উত্তাপ ১০২ ডিগ্রি হইয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বরের পরিমাণ গিরিশচন্দ্রকে জানাইলেন। গিরিশচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সেই জন্যই এত অসুস্থতা মনে হচ্ছে।" অতুল বাবু তখনই চিকিৎসকগণকে সংবাদ দিলেন। চিকিৎসকগণ আসিয়া গিরিশ বাবুকে দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের ব্যবস্থা অনুসারে ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শনি ও রবিবারের পর সোমবার ৯৮ ডিগ্রি উত্তাপ দর্শনে সকলেরই আবার বেশ একটু আশা হইল। গিরিশচন্দ্রকেও সেদিন বেশ একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবিনাশ বাবুর উপর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া লিখিয়া রাখিবার ও নিয়মিত ঔষধ

---

* গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের শেষ পনের বৎসর অবিনাশবাবুই সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার নিকটে থাকিতেন।

খাওয়াইবার ভার ছিল। দেহের উত্তাপ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। মঙ্গলবার ৯৭ ও বুধবার ৯৬ ডিগ্রি দেহের উত্তাপ নামিয়া গেল। অবিনাশ বাবু এই ব্যাপারে বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি মহাভীতিস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "একি আশ্চর্য্য, উত্তাপ যে প্রত্যহই কমিতেছে!"

গিরিশচন্দ্র একটু দূরে বসিয়াছিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ্ দিকি, ক্রমে collapse হবে।" অবিনাশ বাবু ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অমন কথা বল্‌বেন না!"

গিরিশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না, তাঁহার সমস্ত মুখখানার উপর একটা বিরাট গাম্ভীর্য্যের ছবি পড়িল।

সোমবার যাহা হউক করিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু মঙ্গলবার তাঁহার শয়ন করা মহা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। শয়ন করিলেই শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার মত হইতে লাগিল। শয়ন করা দূরে থাকুক বালিশে একটু হেলান দিলেই তিনি মহা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অবিনাশ বাবু এই কয়দিন ধরিয়াই সমস্ত রাত্রি জাগিতে ছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে শয়ন করিতে বলিলেন, উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণে অবিনাশ বাবুর যে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন সেই অবস্থাতেও গিরিশচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। অবিনাশ বাবু শয়ন করিতে ইতস্ততঃ করায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'অবুঝ হয়ো না, পা'লা করে জাগ, তুমি পড়লে বড় মুস্কিল হবে। এই তো সবাই জেগে রয়েছে। এই বেলা তুমি একটু শুয়ে নাও।" অবিনাশ বাবু আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, এক পার্শ্বে যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু এ অবস্থায় কি চক্ষে নিদ্রা আসিতে পারে? তিনি প্রায় ঘণ্টা দেড়েক শুইয়াছিলেন সেই সময় শুনিতে পাইলেন গিরিশচন্দ্র যেন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাণের আবেগে অতি করুণ কণ্ঠে তিনবার বলিয়া উঠিলেন, "রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ!" সেই স্বরে অবিনাশ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, গিরিশচন্দ্রের এরূপ কণ্ঠস্বর তিনি পূর্ব্বে আর কখনও শুনেন নাই। অবিনাশ বাবু আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, তখনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উঠলে যে?"

অবিনাশ বাবু উত্তর করিলেন, "ঘুম হইতেছে না।" অবিনাশ বাবু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে সময় যাঁহাদের জাগিবার কথা তাঁহারা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। অবিনাশ বাবু একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন" বাবুকে ডাকবো?"

গিরিশচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ঘুম না হ'লে তার অসুখ হয়, এখন থা'ক।" চারিটা বাজিবার পর গিরিশচন্দ্র অবিনাশ বাবুকে বলিলেন, "অতুলকে তোল।"

অবিনাশ বাবু ভিতর বাটী হইতে অতুলবাবুকে ডাকিয়া আনিলেন। অতুলবাবু বৈঠকখানাগৃহে উপস্থিত হইলে, গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "একেবারে নিদ্রা নেই, কিছু ভাল বুঝতে পাচ্ছিনি।"

সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি ঘোষ, ডাক্তার জে, এন, কাঞ্জিলালের সহিত অতি সতর্কভাবে চিকিৎসা করিতে ছিলেন, কিন্তু কোন ঔষধেই কোন ফল দর্শিল না। সমস্ত বুধবার দিবারাত্র এই ভাবেই কাটিল। সমাগত সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে গিরিশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "খাড়া হয়ে বসে কেমন করে ঘুমুই—একি হলো!"

কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া চুঁচুড়ার "শিবপ্রিয়" ঔষধের ধূম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন ও এককৌটা ঔষধও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র উক্ত ঔষধের ধূম গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রথম ফল পাইয়াছিলেন, এ অবস্থাতেও তাহার ধূম গ্রহণ করিয়া কতকটা শ্লেষ্মা বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইবার কোন উপায় হইল না। রোগ ক্রমেই করালমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল।

মিনার্ভা থিয়েটার এক্‌জিবিসন উপলক্ষে ফরিদপুরে সে সময় বায়না গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষকে (দানি বাবুকে) ও সম্প্রদায়ের সহিত যাইতে হইয়াছিল। বুধবার সন্ধ্যার সময় অতুলবাবু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। সেই রাত্রে গিরিশচন্দ্র আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বলিলেন, "দানি—message." অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হাঁ দানিকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।"

গিরিশচন্দ্র আর কোন কথা বলিলেন না। বুধবারও সেই একইভাবে অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। বৃহস্পতিবার প্রভাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে সরাইয়া আমার বিছানা ঝাড়িয়া দাও"।

তাহাই হইল। সেইদিন বেলা নয়টার পর হইতেই ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "চল।"

গৃহে যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কোথায় যাইবেন? গিরিশচন্দ্রের মৃদুস্বর অতি মৃদুভাবে বাহির হইয়া আসিল, "গাড়ী আসিয়াছে।" ক্রমেই অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইতে লাগিল। তখন কয়েকজন বন্ধুবর্গের পরামর্শে ডাক্তার ব্রাউণ সাহেবকে আনা হইল। ব্রাউণ সাহেব রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখখানা বিকৃত করিলেন ও মৃদুস্বরে বলিলেন, "অবস্থা নিতান্ত সাংঘাতিক।"

মধ্যাহ্নে গিরিশচন্দ্রের প্রিয় সুহৃৎ দেবেন্দ্র বাবু আসিলেন। গিরিশচন্দ্র জল পান করিবেন বলায় তিনি তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস আনিলেন। গিরিশচন্দ্র স্বহস্তেই জল পান করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু দুই চারি কোয়া কমলালেবুও গিরিশচন্দ্রকে খাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে শোয়াইতে পারিলেন না। শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বুঝিলেন, যে তাঁহার কথা গিরিশচন্দ্র ধারণা করিতে পারিতেছেন না। তখন দেবেন্দ্র বাবু রামকৃষ্ণভক্তজননী শ্রীশ্রীমার কথা পাড়িলেন ও বলিলেন, "মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?"

গিরিশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দেবেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, সব ভাল বুঝতে পাচ্ছিনি, কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।"

মধ্যাহ্নের পর হইতে তিনি প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শিবপ্রিয় ঔষধের ধূম গ্রহণে উপকার পাওয়ায় আরও চারি কৌটা ঔষধ ভ্যালুপেবেলে পাঠাইবার জন্য চুঁচুড়ায় পত্র লেখা হইয়াছিল, সেই সময় সেই ঔষধ লইয়া পিয়ন উপস্থিত হইল। অনেকেই বলিলেন, "আর ঔষধের প্রয়োজন কি?" কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "গিরিশ দাদা যখন স্বয়ং ভ্যালুপেবেলে ঔষধ পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তখন ঔষধ ফেরৎ দেওয়া কিছুতেই হইতে পারে না।" দেবেন বাবুর কথার উপর আর কেহ কথা কহিতে পারিলেন না, মূল্য দিয়া তখনই ভ্যালুপেবেল রাখা হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্রের একটু আচ্ছন্নভাব কাটিয়া গেলে অবিনাশ বাবু বলিলেন, "ভ্যালুপেবেল ডাকে চারি কৌটা শিবপ্রিয় আসিয়াছে।"

গিরিশচন্দ্র আগ্রহভরে কাণ পাতিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "টাকা দিয়াছ?"

অনিবাশ বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "বেশ করিয়াছ।" তখন বেলা প্রায় চারিটা।

সন্ধ্যার পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের আচ্ছন্ন ভাবটা আবার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল! সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় কখনও "চল", কখনও "নেশা কাটিয়ে দাও", কখনও "রামকৃষ্ণ, এইরূপ ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) অতুল বাবুর টেলিগ্রাম রাত্রেই পাইয়া ছিলেন। কিন্তু রাত্রে ট্রেন না থাকায় প্রভাতের প্রথম ট্রেনেই রওনা হইয়াছিলেন। তিনি যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি আটটা। দানিবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াই "বাপি বাপি" বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের মস্তকে তাঁহার কম্পিত হস্ত আমর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও একটু জল খাইতে চাহিলেন। পার্শ্বেই বেদানার রস ছিল, দানিবাবু ব্যস্তভাবে তাহা ধীরে ধীরে পিতাকে খাওয়াইয়া দিলেন। দানিবাবু যখন ফরিদপুর গমন করেন সেই সময় গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তুমি ফিরে এস, অনেক কথা আছে।" সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দানিবাবু বলিলেন, "বাপি, আমাকে যে কি বল্‌বে বলেছিলে?"

গিরিশচন্দ্র তাহার উত্তরে জড়িত স্বরে কি বলিলেন, ঠিক তাহা বুঝা গেল না। ক্রমে আচ্ছন্ন ভাব আরও বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "এইবার মহাশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।"

সেদিন বৈকাল হইতেই প্রবলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের অবস্থা যে সঙ্কট সে সংবাদ প্রভাত হইতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াও সন্ধ্যার পর হইতেই বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। রাত্রি বারটার সময়

স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণ সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহার ইষ্টদেবের নাম গান আরম্ভ করিলেন। "রামকৃষ্ণ হরিবোল" ধ্বনিতে সমস্ত পল্লী একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল।

বৃহস্পতিবার ২৫শে মাঘ ১৩১৮ সাল রাত্রি একটা বিশ মিনিটের সময় গিরিশচন্দ্র তিন দিন অনিদ্রার পর সহস্র সহস্র আত্মীয় বান্ধবকে অপার শোক সাগরে ভাসাইয়া মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ও বঙ্গ নাট্য সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবার আশা নাই। মহাপুরুষ মহাসাধনায় আসিয়াছিলেন সাধনা শেষে আর কি তিনি থাকিতে পারেন! মায়ের আহ্বান শুনিবামাত্র তিনি সব ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন!

প্রভাত হইতে না হইতে রামকৃষ্ণভক্তগণ ও বহুবিধ জনসমাগমে সমস্ত পল্লী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাকবিকে একবার শেষ দর্শন করিবার জন্য সকলের এরূপ আকুল আগ্রহ যে জনতার সুশৃঙ্খলতা সাধন একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিচিত্র খট্টায় বিবিধ সুচারু পুষ্পলতায় সজ্জিত করিয়া ললাটে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নাম লিখিয়া দিয়া বঙ্গনাট্য সম্রাটকে বাহির করা হইল। জনতার হুড়াহুড়ি আরও বাড়িয়া গেল। সেই জনতা ভেদ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম গাহিতে গাহিতে মহাপুরুষের শবদেহ কাশীমিত্রের শ্মশানঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্মশানঘাটে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও গিরিশচন্দ্রের বন্ধুগণ এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিসমূহের এত অধিক সমাবেশ হইয়াছিল যে, রাধাকান্ত দেবের মুমূর্ষনিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট পর্য্যন্ত নর ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গাতায়াত একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রকে চিতাশয্যায় শয়ন করাইয়া দিবার পর আবার সহস্র কণ্ঠে 'রামকৃষ্ণ হরিবোল' নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এদিকে অগ্নিদেব সেই মহাপুরুষের শবদেহ গ্রাস করিবার জন্য লক্ লক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ নববস্ত্র পরিধান করিয়া নব তাম্রকুণ্ডে সেই চিতা হইতে সযত্নে অস্থি সংগ্রহ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

গিরিশচন্দ্র চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার যে স্মৃতিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন বাঙ্গালার বক্ষের উপর তাঁহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাধারণ বঙ্গরঙ্গালয় ও তাঁহার অমর গ্রন্থসমূহ বঙ্গবাসীর নিকট তাহাকে যুগ-যুগান্তর অমর করিয়া রাখিবে।

যাও কবিবর, সেই অনন্ত অমরধামে যাও, যেখানে তোমার অন্তরের গুরুদেব নিত্য বিরাজিত, যেখানে জন্মে মৃত্যু নাই, যৌবনে বার্দ্ধক্য নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই, সুখে দুঃখ নাই, আনন্দে শোক নাই, সম্পদে বিপদ নাই; যেখানে অসীম অনন্ত প্রেম

বৃন্দাবন—অগাধ অপার চির-শান্তিধাম, যেখানে নিরঙ্কুশ অদ্বৈত জ্ঞান-ভাণ্ডার, সুরস সুধাময় নিরবধি ভক্তি পারাবার! যাও কবিবর, যাও তোমার চির আকাঙ্ক্ষিত নিত্য-পীযূষ-পূরিত শ্রীশ্রীগুরুচরণ নিকুঞ্জে নিলীন হও—যেখানে বারমাস বসন্ত বিরাজে, নিত্য শান্তি প্রীতি পবিত্রতা রাজে,—সেখানে সংসারের ঝঞ্ঝাবাত্যা আর তোমায় উৎপীড়িত করিতে পারিবে না, কৃতঘ্নের হলাহল আর তোমায় কালসর্পের ন্যায় দংশন করিতে পারিবে না! যাও মহাকবি, সেই চিরোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নিত্যধামে, যেখানে দেবর্ষি ভরত ও প্রতীচ্য মনীষী আরিষ্টোটল তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, যেখানে পাণিনি ও এস্কাইলাস, কালিদাস ও সেক্স্পীয়র, মার্লো, গেটে, রেসিনি ও মোলিয়র, তোমার জন্য জয়মাল্য হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। যাও লীলাময় কর্ম্মযোগিন্, তোমার নশ্বর ভবলীলা শেষ হইয়াছে—ঐ দেখ রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বেন্‌জন্‌সন, ভবভূতি, ভট্টনারায়ণ স্বারাজ্যের হিরণ্ময় তোরণ উন্মুক্ত করিয়া তোমার প্রতীক্ষায় সানন্দে দাঁড়াইয়া আছেন—ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম সহযোগী হাস্যার্ণব অর্দ্ধেন্দুশেখর তোমাকে লইবার জন্য সকলের অগ্রে ছুটিয়া আসিতেছেন—ঐ দেখ তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তম শিষ্য মহেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, মতিলাল আর আর কত শত তোমারই শিক্ষিত বিদ্যাবিভায় মণ্ডিত হইয়া হর্ষ-পুলকিত-নয়নে তোমার অমর অবিনশ্বর কীর্ত্তিগাথা গাইতে গাইতে তোমায় লইতে আসিতেছেন! হে বঙ্গ-কাব্যকানন-কোকিল, তুমি আজি তোমার চির ঈপ্সিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত, জন্ম-মৃত্যুর গণ্ডীর অতীত, তাই আমরা আর শোক করিব না, আমরা তোমার বিচ্ছেদ সন্তপ্ত বঙ্গবাসীকে তোমার নিজ অমৃত ভাষায় বলিব—

"মায়ামোহ কর পরিহার,
জাগাইয়া পুর্ব্বস্মৃতি করহ স্মরণ,
কতবার করিয়াছি জনমগ্রহণ।
জন্ম-মৃত্যু ঘুচেছে এবার,
একাকার—একাধার নির্ব্বাণ আগারে
জন্ম-মৃত্যু ফুরাইল,
কেন খেদ কর আর?"

নিবেদন

"ভাবুক সুধীরজনে, আসি এই রঙ্গাঙ্গনে,
কাব্যের বিকাশমাত্র করে আকিঞ্চন।
কটাক্ষের ভঙ্গী যার, ক্ষুদ্রপ্রাণে অধিকার,
হেরে মাত্র কামিনীর কটাক্ষ ঈক্ষণ।।
চিতহারা চিত্রকর, ধ্যানমুগ্ধ কবিবর,
রঙ্গালয় তাহার জীবনে প্রয়োজন।
ভ্রমিছে কল্পনাপথে, পূরাইতে মনোরথে,
উচ্চ আশে জনমের সুখ বিসর্জ্জন।।
কেবল কলঙ্ক ভার, জীবনের সার তার,
অলীক সম্পদ আশা বাসা কল্পনায়।
হলে প্রাণ অবসান, কেহ করে গুণগান,
মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়র আদর্শ হেথায়।।
যখন অনন্ত ঘুমে, শান্তির শ্মশান ভূমে,
নিন্দা বা আদরে তার কে জানে কি হয়।
চিত্রিয়ে স্বভাব ছবি, বুঝি বা ভাবিত কবি,
চিত্রের আদর তার হবে ধরাময়।।
জীবনে বিফল আশ, এবে পূর্ণ অভিলাষ,
নাহি শ্বাস, সে প্রয়াস নাহি এবে তার।
অভিনেতা মাত্র আমি, কবিবর অনুগামী,
আলোচনা বিফল কি হেতু করি আর।।
কি জানি কি প্রাণে পায়, কে জানে কি হেতু হায়,
নাট্যাগারে কবিবরে করিব সম্মান।
ছাড়ি যদি—সুধীব্রত কর শিক্ষাদান।।"

গিরিশ প্রতিভা

গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গীয় রঙ্গালয় ও নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে পূর্ণ উন্মেষিত ও পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাই আমরা প্রথমে নাট্যকলার উৎপত্তি ও ক্রম পরিপুষ্টি ও তৎসঙ্গে রঙ্গালয়ের একটি স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তৎপরে গিরিশ-প্রতিভার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে কামনা করি।

প্রথম কাণ্ড

নাট্যকলার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি

আমাদের দেশে নাট্যকলার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে হইয়া আসিয়াছে। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের ন্যায় নাট্যবেদ বা গান্ধর্ব্ববেদ পঞ্চমবেদ বলিয়া চিরদিন কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি জাতীয় সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার সম্পূর্ণ পরিচায়ক, বিশেষতঃ নাট্যবিদ্যা, যাহা সাহিত্যের পূর্ণ পরিপুষ্টির পরিমাপক। সুতরাং যে দেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতার শৈশবের বহু পূর্ব্বে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও সভ্যতা অভ্যুদয়ের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে দেশে যে চতুঃষষ্টি কলা, বিশেষতঃ ললিত কলা-শিরোমণি নাট্যবিদ্যা, তৎকালে চারি অঙ্গেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

আর্য্য ঋষিদিগের মতে ভগবান্ ব্রহ্মাই নাট্যবেদের আবির্ভাবয়িতা। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনায় রূপকের ভাষা ঋগ্‌বেদ হইতে, সঙ্গীত সামবেদ হইতে, চতুর্বিধ অভিনয়াঙ্গ যজুর্ব্বেদ হইতে এবং রস ও ভাব অথর্ব্ববেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি ভরত পিতামহের নিকটে নাট্যবিদ্যা লাভ করিয়া প্রথমে লোকসমাজে এই বিচিত্র অভিনব সর্ব্ব-মনোরম সুকুমার কলার অধ্যাপকতা করেন। তিনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ ও অপসরোগণকে নিয়মপূর্ব্বক শিক্ষাদান করিয়া দেবরাজের

বৈজয়ন্তে সর্ব্ব প্রথমে দেবাসুর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করাইয়াছিলেন। দেবশিল্পী (divine architect) বিশ্বকর্ম্মা আদি নাট্যশালা নির্ম্মাতা। রঙ্গ-মন্দির বিকৃষ্ট বা বৃত্তাভাস (ellipsoidal), চতুষ্কোণ বা আয়তক্ষেত্রাকার (rectangular), কিংবা ত্র্যগ্র বা ত্রিভুজাকার (triangular) হইত। নাট্য-গৃহ দ্বিভূমিক অর্থাৎ দ্বিতল করা হইত, উচ্চতলে দেবকাণ্ড ও নিম্নতলে অবশিষ্ট বিষয়ের অভিনয় হইত।* নাট্যান্তর্গত নৃত্য ও বাদ্য সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশাবদ ভগবান্ শিবের আদেশে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য তণ্ডু প্রথমে দেবর্ষিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।* সুতরাং আমরা আর্য্যশাস্ত্র বারিধি মন্থনে দেখিতে পাই যে অতি পুরাকালে চতুর্ব্বেদ সংগ্রহের পরেই দেবতাদিগের আদি বাসভূমি স্বর্গে (অর্থাৎ ত্রিণাক প্রদেশে)† দেবরাজ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত নাট্যকলার আদি জন্মভূমি। সেখানে শত্রু-ধ্বজোৎসবে প্রথম নাট্যাভিনয় হয়। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন বারমাস ত্রিশ দিন অভিনয় হইত না। পূর্ণিমা রজনীতে, রাজার অভিষেক দিবসে, মেলায়, দেবতার উৎসবে, লোক-সমাগমে, বিবাহে, বন্ধু-সমাগমে, কোনও দেশ বা নগর অধিকারে এবং সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হইলে, নাটকাদির অভিনয় হইত। এই সমুদায় উৎসব দিবস ভিন্ন দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অথবা রাজন্যবর্গের অনুমতিক্রমেও অভিনয় হইত। পুরাকালে কেবল নাটকের অভিনয় হইত না,

---

* সঙ্গীতদামোদরে আছে, নাট্যের নায়ককে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিতে হইবে। গায়ক গায়িকাগণ মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নায়ক যে অভিমুখে থাকিবেন সেই অভিমুখেই থাকিবে। গায়কদিগের উত্তর পার্শ্বে বাদ্যস্থান থাকিবে। বাদকদিগের মধ্যে অন্ততঃ চারিটি মৃদঙ্গ (পখোয়াজ) থাকিবে। রঙ্গের দক্ষিণাংশে তুর্য্যস্থান (Seat for the concert) ও পূর্ব্ব ভাগে যবনিকা থাকিবে। যবনিকার অভ্যন্তর ভাগ নেপথ্য (green room)। নাটক সুদীর্ঘ হইবে না। যে নাটক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টাব্যাপী তাহাই শ্লাঘ্য। নাটকের যে রসটি প্রধান থাকিবে তদনুরূপ নৃত্য ও সঙ্গীত হইবে। রঙ্গমঞ্চের সমক্ষে বৃহৎ যবনিকা (drop-scene) থাকিবে। Moveable scene (খণ্ড দৃশ্য) ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। তবে অঙ্কিত দৃশ্য (oil painting) ছিল। পরিচ্ছদ তিন রকমের ছিল, শুদ্ধ বা শুভ্র, মলিন ও চিত্র। ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, সামান্য স্ত্রীলোক, অমাত্য, কঞ্চুকী ও পুরোহিত শুদ্ধ অর্থাৎ শুক্ল পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, রাজা ও রাজযোষিৎ বা রাজপুরনারীগণের পরিচ্ছদ বিচিত্র বর্ণের হইত। মদ্যপ, উন্মত্ত, গিরিবাসী, চোর, শোকসন্তপ্ত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ মলিন হইত। কিন্তু এই প্রকার বস্ত্রাদি বিনিয়োগেও দেশ, কাল, বয়ঃক্রম, পদ ও জাতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত, যেন সকলের একজাতীয় পরিধেয় না হয় নাট্যাচার্য্যদিগের তৎবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত, কেননা নাট্যাভিনয় বৈচিত্র-সমন্বয়।

* সঙ্গীতদামোদর অনুসারে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ভগবান্ শিব নাট্যশাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে বলেন, তৎপর ভগবান্ ব্রহ্মা উহা দেবর্ষি ভরতকে শিক্ষা দেন। সেইজন্যই নাট্যবেদের প্রবর্ত্তয়িতা ব্রহ্মা, শিব ও ভরত বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত।

† দেবগণ তাঁহাদের জ্ঞাতি দৈত্য দানব ও অসুরদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া ত্রিণাক প্রদেশ (মঙ্গোলিয়া) পরিত্যাগ পূর্ব্বক জম্বুদ্বীপে (পশ্চাৎ ভারতবর্ষ) আসিয়া যখন এতদ্দেশস্থ আদিম অধিবাসীদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে (পঞ্চনদ প্রদেশ) বিতাড়িত করিয়া তথায় নিবিড় কাননাদি পরিষ্কৃত করিয়া গৃহাদি-নির্ম্মাণ ও শস্যাদি উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের সেই গৌরবর্ণ দেবকান্তি এদেশের প্রখর সূর্য্যে মলিন হইতে লাগিল। তাঁহারা তখন আর্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। ত্রিণাকবাসীরাই কেবল দেবতা নাম বজায় রাখেন।

নাট্যকলারও সার্ব্বাঙ্গীন অভ্যুন্নতি হইয়াছিল। মহর্ষি ভরতকৃত আর্য্যনাট্যশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, মহারাজ পুরূরবার পৌত্র নরপতি আয়ুর পুত্র মহীপতি নহুষ এই নাট্যবিদ্যা সর্ব্ব প্রথমে ত্রিণাক হইতে জম্বুদ্বীপে (অর্থাৎ ভারতে) আনয়ন করেন। তিনি মঙ্গস্থান জয় করিয়া উহার রাজধানী অধিকার করেন। তথায় নাট্যাভিনয় দর্শনে নিতান্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া দেবর্ষি ভরতের শিষ্য কোহল, শাণ্ডিল্য, ধূর্ত্তিত, পরাশর ও অন্য কতিপয় নাট্য-বিচক্ষণ ঋষিদিগকে মহাসমাদরে তদীয় জম্বুদ্বীপের রাজধানীতে আয়ন পূর্ব্বক এতদ্দেশে নাট্যাভিনয় প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি জম্বুদ্বীপবাসিগণ* বেদবিদ্যার ন্যায় গান্ধর্ব্ববেদের অনুশীলন (অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা) একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। তৎপরে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি বাণীর প্রধান সাধকগণ চিরদিনই নাট্যসাধনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতে নাট্যকলায় এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, যে পণ্ডিতগণ দশবিধ রূপক ও অষ্টাদশবিধ উপরূপক বিভাগ ও তৎসঙ্গে আখ্যানবস্তু, কাল, সন্ধি, নাট্যালঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ নাট্যসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীষদেশে কিংবা বর্ত্তমান সভ্য জগতে অন্যত্র কুত্রাপি এরূপ পুঙ্খানুপঙ্খরূপে নাট্যলক্ষণ ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ভারতের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে বেদাদির স্থানে যেমন ক্রমশঃ কেবল নিবন্ধ শিক্ষাই একদিন সুবিদ্যার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তদ্রূপ নাট্যবিদ্যার অনুশীলন লোপ পাইয়া তৎস্থানে 'পুতুলের নাচ', 'যাত্রা', 'হাফআকড়াই', 'বহুরূপী', 'হরবোলা', 'কথকতা', প্রভৃতি অভিনয় কলার শেষপরিচায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে বাণীর 'শাশ্বত বিনোদ নিকুঞ্জ' ভারতবর্ষ কালক্রমে 'অবিদ্যার মরুস্থলীতে' পরিণত হইয়াছিল। তাই বিদেশীয় সাহেবগণ ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির সম্বন্ধে নানাবিধ হাস্যকর গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বলেন নৃত্য হইতে নাটক উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার মতে প্রথমে নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য ও সঙ্গীত ও পশ্চাৎ তাৎকালীক মৌখিক উক্তি, ক্রমে উহা হইতে নাটকের সমুৎপত্তি। তাঁহার মতে বাঙ্গালার যাত্রা ও কবিবর জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' ভারতীয় নাট্যকলার অপূর্ণ কালের নির্দশন। আবার পিশেল সাহেব বলেন যে পুতুলের নাচ (অর্থাৎ পুতলবাজি) হইতে ভারতের নাট্যকলার উৎপত্তি। ডাক্তার রাইজুইক বলেন, "এ সব কিছু নহে, মহাপুরুষদের স্মৃতি রক্ষা হইতে নাট্যকলার উৎপত্তি।" এইরূপ এক এক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যার্ণবের এক একটি অদ্ভুত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার বেবর বলেন, যে ভারতবাসিগণ নাট্যবিদ্যা গ্রীক্‌দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অর্ব্বাচীন উক্তির

---

* তখনও এদেশের নাম ভারত হয় নাই। শকুন্তলার পুত্র ভরত হইতে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

প্রতিকূলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহা হইলে ভারত নাট্যগ্রন্থ ও গ্রীক্ দৃশ্যকাব্য মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হইত না। গ্রীক্ নাটকের সার ট্রাজিডি (বিয়োগান্ত নাটক), আমাদের আর্য্য নাট্যানুসারে tragedy একেবারে হইবারই যো নাই, গ্রীক্ নাটকের প্রাণ দেশ, কাল ও আখ্যান বস্তুর একতা (three unities of time, place and action), ভারতীয় নাটকের কেবলমাত্র আখ্যান বস্তুর একতা পরিলক্ষিত হয়, দেশ ও কালের একতা আদৌ রক্ষিত হয় নাই, গ্রীক নাটকে কোরাস প্রধান অঙ্গ, আমাদের নাটকে আদৌ কোরাস নাই। সংস্কৃত নাটকে অঙ্কাবতার, * বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চুলিকা প্রভৃতি বিবিধ নাট্যসম্পৎ পরিদৃষ্ট হয়, গ্রীক্ নাটকে ইহাদের আদৌ অস্তিত্ব নেই। পরিশেষে গ্রীক নাট্যশালা নির্ম্মাণ ব্যবস্থা হইতে আর্য্য রঙ্গালয় নির্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাই উর্দ্ধদৃষ্টি বেবর প্রবর স্বীকার না করিলেও পণ্ডিতবর Wilson ও অন্যান্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এক বাক্যে ভারতীয় নাট্যকলার মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।**

এক্ষণে আমরা বলি, যখন গ্রীষদেশে নাট্যাবিদ্যার নাম গন্ধও হয় নাই, তাহার বহু পূর্ব্বে এতদ্দেশে নটসূত্র বা নাট্যশাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থসমূহে নাটকের প্রয়োগ যথেষ্ট বর্তমান আছে।† নাট্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা ভরত মুনি মহর্ষি বাল্মীকির সমসাময়িক তাহা কবিবর ভবভূতি উত্তর চরিত নাটকে বলিয়া গিয়াছেন।‡ মহর্ষি পাণিনিও শিলালী এবং কৃশাশ্ব নামক দুইজন নাট্য-সূত্রকারের নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।¶ নটসূত্রকার শিলালীর নাম শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৩। ৫।৩।৩) ও সামবেদীয় অনুপদ সূত্রে (৪।৫, ৫।৫, ৭।৫) পরিদৃষ্ট হয়। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ শঙ্কর রামকৃষ্ণদীক্ষিত মহাশয় বলেন যে শতপথ ব্রাহ্মণ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সুতরাং নটসূত্রকার শিলালী অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। সে সময় কি গ্রীষদেশে কোনও নাটক ছিল? অতএব ভারতীয় নাট্যবিদ্যা যে গ্রীক নাট্যবিদ্যার

---

* এইরূপ অঙ্কাবতার, বিষ্কম্ভক প্রভৃতি বরং Shakespear এর নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। হ্যামলেট নাটকে, ভবভূতির উত্তররামচরিতের শেষ অঙ্কের ন্যায়, এক অঙ্কের মধ্যে নূতন একখানি নাটকের অভিনয় প্রদত্ত আছে।

** "Whatever may be the merits or defects of the Hindu dramas, it may be safely asserted that they are unmixedly its own. Hindu Theatre Vol. I.P.XI.

† রামায়ণ (বঙ্গীয় সংস্করণ) ১।৫।১৮; ২।৬৯।৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ—২০।৪। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়। হরিবংশ—রামায়ণং মহাকাব্যং উদ্দেশং নাটকীকৃতম্। ৮৬৭২।

‡ উত্তর রাম চরিত Act. V.

¶ 'পারাশর্য্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ'। ৪।৩।১১০। কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ। ৪।৩।১১১। বস্তুতঃ শিলালী ও কৃশাশ্ব নটসূত্র (নাট্যসূত্র) প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শৈলাল ও কার্শাশ্ব শব্দে নাটক বুঝায়। কাত্যায়ন বার্ত্তিকে শৈলাল শব্দ ধরিয়া গিয়াছেন।

বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে কি কোনও সন্দেহ আছে?* বৌদ্ধদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। যে সময় ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত ছিলেন, তখন মৌদ্গল্যায়ন ও উপতিষ্য নামে তাঁহার শিষ্যগণ সর্ব্বসমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন।†

সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ রচনায় যেরূপ রীতিমত নিয়ম ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে, ইয়ুরোপীয় নাটক বিরচনে এসব কৌশল আদৌ অবলম্বিত হয় না। বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে যে সব বাঙ্গালা নাটকাদি নিত্য রচিত হইয়া অভিনীত হইতেছে, তাহাতেও সংস্কৃত নাটকাদির নিয়ম আদৌ রক্ষিত হয় না। এ সমুদায় দৃশ্যাকাব্যগুলি ইয়ুরোপীয় আদর্শে রচিত হয়। এ কারণে বঙ্গরঙ্গালয় ও নাটকাদির আলোচনা সংবলিত সন্দর্ভে ইয়ুরোপীয় নাটকাদির লক্ষণ ও স্থূল বিবরণ সর্ব্বাগ্রে দাতব্য।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বাক্যালাপ করেন, উহার অভিনয়ই নাটক; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ ঠিক সেই সেই ভাবে সেই সমস্ত আলাপ নিজে প্রকাশ করেন ও তাঁহার অভিনয় হইতে যদি মূল ঘটনার সমস্ত বিবরণ অনুমেয় হয় তবেই তাহাকে নাটক বলে। পরস্পরের সাধারণ কথোপকথনে (Dialogue) কথকের মনে শোক, দুঃখ প্রভৃতির ঠিক উচ্ছ্বাস হয় না। কিন্তু নাটকে ভাবস্রোত অত্যন্ত স্পষ্ট ও ঘটনাবলীর শেষফল অতি সহজে অনুমেয়। সেই জন্য অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নাটকের আদর অত্যন্ত অধিক। মহাকাব্যে (Epic) কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে প্রায়ই রসপূর্ণ বাক্যালাপে নিযুক্ত দেখা যায় এবং ঐ মহাকাব্য কেবল বর্ণনাপূর্ণ থাকে। গীতিকাব্যেও (lyric) অনেক সময় ঐ নিয়ম লক্ষিত হয়। মহাকাব্য যদি তেজঃপূর্ণ কথাবার্ত্তায় পূর্ণ থাকে এবং যদি উদ্দিষ্ট কার্য্য বর্ণনাকে অতিক্রম করিয়া পরিস্ফুট প্রকাশিত হয়, তখন উহা নাটক আখ্যা প্রাপ্ত হয়। নাটক আবার বিয়োগান্ত (tragedy) এবং হাস্যোদ্দীপক (comic) এই দুই রকমের। বিয়োগান্ত নাটক উৎসুক মনকে আনন্দিত করে অর্থাৎ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিলে উহার শেষ পরিণাম জানিবার জন্য ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তাহার পরিসমাপ্তিই নাটকের উদ্দেশ্য।

মানবজাতি স্বভাবতঃ অনুকরণ প্রিয়। এই অনুকরণপ্রিয়তা হইতেই সুকুমার নাট্যকলার উৎপত্তি। পণ্ডিতগণ গ্রীকদিগকেই প্রথম নাট্যকার এবং এথেন্স নগরীকে আদি নাট্যাভিনয় স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পুরাকালীয় গ্রীক পণ্ডিতেরা বলেন

---

* শৈলূষ শব্দে নট বুঝায়। বাজসনেয় সংহিতায় লিখিত আছে—নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরম্ (৩০।৬৫) ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে নটের ব্যবহার বৈদিক সময় হইতে প্রচলিত। (শৈলূষং নটংমহীধরঃ)

† Asiatic Society's Researches Vol X X. P. 50. Professor Lassen says–In the oldest Buddhistic writings, the witnessing of plays is spoken of as something usual (I.A K, II, 81.)

যে সমবেত সঙ্গীত হইতে (Choral song) নাটকের উৎপত্তি। আরিষ্টোটল (Aristotle) বলেন বেকাশ (Bachus) দেবের উৎসবে যে সব গায়ক গান করিত, সেই গায়কেরাই আদি নাটক স্রষ্টা। খৃষ্টের জন্মের ৫৩৬ বৎসর পূর্ব্বে থেস্পীস (Thespis) অভিনয় কালে রীতিমত কথাবার্ত্তার প্রথা প্রচলিত হয় এবং গানের মধ্যে একজন অভিনেতা থাকেন। ফ্রাইনিকাস (Phrynichus) ৫১২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে থেস্পিসের ঐ একমাত্র অভিনেতাকে অভিনেত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ফ্রাইনিকাস হইতে এস্কাইলাস (Æschylus) এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ট্রাজেডির সম্বন্ধে অন্য কেহ কোন বিশেষ উন্নতি সাধন করেন নাই।

সুসেরিয়ন (Susarian) গ্রীষের মধ্যে পরিভ্রমণকালে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮০ অব্দে তাঁহার সময়ের দোষগুলিকে বিদ্রূপ করার জন্য তত্রত্য রঙ্গমঞ্চের উপরে যে অভিনয় করেন, তাহা হইতে comedy-র সৃষ্টি হয়।

সুগভীর ভাব ও গাম্ভীর্য পরিপূর্ণ থাকায় Tragedy সহরের সুশিক্ষিত ও সভ্য অধিবাসীদিগের এবং comedy হাস্যরস, বিদ্রূপ ও গ্রাম্য রসিকতায় পূর্ণ থাকায় যাবতীয় গ্রাম্য অসভ্য লোকের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে ঐ বিদ্রূপাত্মক নাটক সহরেও আদৃত হইতে থাকে, এবং এপিকারমাস্ (Epicharmus), আরিষ্টফেনিস (Aristophanes) প্রভৃতি অনেকে comdy'-র অভিনয়ার্থ বহু খ্যাতনামা অভিনেতা নিযুক্ত করেন। তৎকালে Tragedy অভিনয়কালে অভিনেতারা নানাবিধ বড় বড় মুখস পরিয়া মনুষ্য চরিত্রে যে সমস্ত মহৎ ও সদ্গুণ বিদ্যমান আছে তাঁহা অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইতেন। ঐরূপ comedy-র অভিনেতারাও ক্ষুদ্র ও নিম্নগুল্ফ পাদুকা ও বিকট আকার মুখস পরিয়া মনুষ্যজাতিকে অযথারূপে নিন্দা করিতেন। গ্রীকেরা comedy-কে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—পুরাতন, মধ্য ও নূতন। এই নূতন comedy হইতে আধুনিক হাস্যোদ্দীপক রঙ্গনাট্যের সৃষ্টি। বর্ত্তমান কমিডি প্রকৃত পক্ষে পুরাকালীয় tragedy এবং comedy-র সম্মিশ্রণে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে comedy ঠিক tragedy-র বিপরীত ছিল। এই পুরাতন ও নূতন comedy সৃষ্ট হইবার মধ্যযুগে মধ্য-comedy প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ পিলোপনিসীয় যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই comedy-র মধ্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে। comedy'র সময় হইতেই প্রকৃত গ্রীক tragedy আরম্ভ হয়। এস্কাইলাস স্বয়ং আখড়া ঘর (Rehearsal room) হইতে অভিনেতাদিগকে অভিনয় করিবার রীতি-নীতি শিক্ষা দিতেন। Sophocles রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি সাধন করেন। Euripides ট্রাজিডির অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। ইহার পর হইতে গ্রীষে ট্রাজেডির পতন আরম্ভ হয়।

রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩৯১ বৎসর পরে, যখন একবার তথায় ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হয়, সেই সময় ইয়ুট্রারিয়ান্দিগের নিকট হইতে রোমকগণ প্রথম অভিনয়ের ভাব গ্রহণ করেন। প্লুটাস ও টারেন্স্ ব্যতীত এখানে মিলনান্ত নাটক

(comedy) লেখক, অন্য কাহারও নাম পাওয়া যায় না। ইহারাও গ্রীকদের নিকট হইতে tragedy-র ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে দেবোপাসনার প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে রোম হইতে নাটকাভিনয় একরূপ লুপ্ত হইয়া যায়। ইতালীতে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম রীতিমত আধুনিক নাটক মুদ্রিত হয়। ইহা Trissius প্রণীত Sophonisba. সপ্তদশ শতাব্দীতে রিণাসিনি (Rinuscini) নাটকের সহিত সঙ্গীত প্রবর্ত্তিত করিয়া গীতাভিনয় (Melodrama) সৃষ্টি করেন। Milan-এর সময় হইতে Ravana-র সময় পর্য্যন্ত ইতালীতে tragedy এবং comedy-র আদৌ আদর ছিল না। ঐ সময় গীতি-নাট্যের (Music-opera) অত্যন্ত সমাদর হয়। বর্ত্তমান গীতি-নাট্যের উৎপত্তি এই মিয়ুজিক অপেরা হইতে।

ফরাসীদিগের মতে নাটকে প্রধানতঃ তিনটি গুণের আবশ্যক। উহার নাম Dramatic unity (নাট্য-ঐক্যতান)। (১) নাটকে একটিমাত্র বিষয় থাকিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ঐ মূল প্রধান ঘটনার পরিপোষক হইবে। (২) সমস্ত ঘটনাগুলি এক স্থানে সংঘটিত হইবে। (৩) সমস্ত ঘটনাবলী একই কারণে একদিনে ঘটিবে। এই নাট্য-ঐক্য-তানতা অবশ্য গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতেই ইহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জোদেলী (Jodelle) প্রথমে যথারীতি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট একখানি tragedy বিরচিত করিয়া ফরাসীরাজ দ্বিতীয় হেনরির সম্মুখে অভিনীত করেন। তাহার পর কর্ণেলি (corneille), মোলিয়ার (Moliere), রেসিনি (Racine) ও বোলতেয়ার (Voltaire) প্রভৃতি অনেকে drama লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহারা কিন্তু সকলেই ইতালীয় নাটকের অনুকরণ করিয়াছেন।

জর্ম্মনীতে Lessing, Goethe, Schiller প্রভৃতি অনেক লেখক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া tragedy লিখিবার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে পুরোহিতগণ (Ecclesiastics) প্রথমে প্রায়ই ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্য হইতে দুই একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া দুই একখানি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া নিজেরা উহার অভিনয় করিতেন। ঐ দৃশ্যকাব্যগুলি দুই শ্রেণীর হইত, mysteries and miracles (অর্থাৎ অতি নিগূঢ় ও অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ নাটক) এবং Moralities (নীতিগর্ভ নাটক)। বাইবেলের অদ্ভুত ঘটনা কিংবা মহাত্মাদের গল্প অবলম্বনে প্রথম শ্রেণীর নাটক এবং ঘটনাবলীর সহিত কাল্পনিক উপদেশময় (imaginary) দৃশ্য সংযোগে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক লিখিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই জাতীয় নাটকের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় এবং নূতন প্রণালীতে নাটক লিখিত হইতে থাকে। নিকোলাস উদল (Nicolas Udall) নামক একজন অধ্যাপকের লিখিত Ralf Roister Doisterই নূতন ধরণের প্রথম comedy (১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ)। ইহার দশ বৎসর পরে Norton এবং Lord Buckherest গর্বুদক নামক (Gorbudoc) প্রথম tragedy লেখেন। উহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হয়।

সেক্স্পীয়রের সময় পর্য্যন্ত বিলাতে নাটকের প্রায় এই দশা। মার্লোই প্রথম রঙ্গমঞ্চের উপর অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত নাটকাভিনয় প্রথা প্রচলিত করেন। তৎপরে সেক্স্পীয়র ক্রমে ক্রমে নাট্যগ্রন্থের সর্ব্ববিধ বিভাগে পূর্ণপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ তাঁহার সময়ে ষ্টেজের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল বলিয়া তিনি আহার্য্য অভিনয়ের কিছুই উন্নতি করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু বাঁচিক, সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়ে নাট্যকলার চরম উৎকর্ষ বিধান করিয়া গিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে ক্রমশঃ আহার্য্য অভিনয়ের পরিপুষ্টিব সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত নাটক রঙ্গালয় হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। নাট্যকারগণ ও সৎসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য নাটকাদি লিখিতেন না, কেবল আহার্য্য অভিনয়ের উপযুক্ত গ্রন্থ রচনা করিতেন। সুতরাং নাট্য-সাহিত্য কালে কালে ক্রমশঃ ইংলণ্ডে লুপ্ত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পুরাকালে হিন্দু ভূপতিগণ নাটকাভিনয়ে সর্ব্বদা পূর্ণোৎসাহ প্রদান করিতেন। অনেকে সভাস্থ কবিদিগের নিকট হইতে কাব্যাদি রচনা করাইয়া, অর্থদানে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া, নিজনামে উহাদের অভিনয় করাইয়া সাধারণের তৃপ্তি বিধান করিতেন। তন্মধ্যে মহীপতি শূদ্রক, হর্ষবর্দ্ধন ও বিগ্রহপাল সর্ব্বাগ্রণী।* পূর্ব্ব কালের ভূপতিবৃন্দ গান্ধর্ব্ববিদ্যার নিতান্ত অনুরাগী হইলেও মধ্যযুগে ভারত হইতে নাট্য চর্চ্চা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল। জাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাজার অনুরাগ এবং উৎসাহ না পাইলে কোন ললিত কলাই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের মুসলমান ভূপতিগণ, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ বশতই হউক বা সার্ব্বজনীন সুশিক্ষার অভাবেই হউক, নাট্যরসাস্বাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ভারত-নাট্যকলার সুপ্রসারে নিতান্ত অন্তরায় হইয়াছিল। এদিকে বহুশত বর্ষব্যাপী পরাধীনতায় ও নির্যাতনে হিন্দুগণও দিন দিন নিস্তেজ ও জীবন-হীন হইয়া পড়িতে ছিলেন। আবার নাট্যকলা জাতীয় সজীবতা ও বিলাসের পূর্ণ পরিচায়ক। তাই মুসলমানরাজত্বে নাটককারের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বহু শতাব্দী পরে ইংরাজ-রাজ আমাদের দেশের আধিপত্য লাভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্ব কীর্ত্তি-কলাপের আদর বাড়িতে লাগিল। বস্তুতঃ ইংরাজ-রাজত্বে প্রত্নতত্ত্বের সমাদরে ভারতের অশেষবিধ লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইতেছে। বর্ত্তমান ইংরাজজাতি, এমন কি উদীয়মান সমুদায় ইয়ুরোপীয় ও

* শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিক ও হর্ষবর্দ্ধন কৃত রত্নাবলী, প্রিয় দর্শিকা ও নাগানন্দ সর্ব্বত্র বিদিত। আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে একটি মস্জিদ আছে। প্রাচীন হিন্দুপ্রাসাদের মালমস্লায় মস্জিদটি নির্ম্মিত হয়। এই মস্জিদ্ গাত্রে প্রস্তরোপরি কবিবর সোমদেব বিচরিত 'ললিত-বিগ্রহ-রাজ-নাটক' এবং মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল রচিত 'হরকেলি নাটক' খোদিত আছে। Indian Antiquary Vol. XX. P. 205.

মার্কিণবাসিগণ, পুরাতত্ত্বের যেরূপ সমাদর করিতেছেন, উহাতে বেশ আশা হয়, ভারতের, এমন কি মিশর, বাবিলন, পারসীক, গ্রীক্ প্রভৃতি পুরাকালীয় বিশ্ববরেণ্য জাতির কাল পাথারের অতলগর্ভে বিলীন গৌরব রাজি, আবার সূর্য্যালোকে লোক নয়নের বিষয়ীভূত হইয়া, অতীত জগতের প্রকৃত অভিনব ইতিবৃত্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবে। ফলতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের এক অভিনব জাতীয় জীবনের যেরূপ উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিতেছে, তাহাতে আবার যে এদেশে পুনরায় কালে শকুন্তলা, কিংবা মৃচ্ছকটিকের মত নাটক লিখিত হইবে না কে বলিতে পারে।

ইয়ুরোপে নাট্যাভিনয় হয়, তাই তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদের দেশেও বিখ্যাত নাটকগুলি অভিনয়ের জন্যই রচিত হইয়াছিল। ভবভূতির বীরচরিত, মালতীমাধব ও উত্তরচরিত কাল প্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা মহোৎসবের জন্যই রচিত হইয়াছিল। মহারাজ মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনয়ের জন্য হয়গ্রীববধ রচিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বে অভিনয় ছিল না, কাজেই নূতন নাটক রচিতও হয় নাই, যাহা ছিল তাহাও অনাদরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।*

বঙ্গীয় নাটক ও নাট্যশালা

যদিও ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে নাট্যানুশীলন হইত এবং ভারতবাসিগণ পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির বহু পূর্ব্বে নাট্যকলার পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধন করিয়া ছিলেন, তথাপি আমাদের বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পকালই প্রকৃত নাট্যালোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালায় শ্রব্যকাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও স্মৃতির ভূরি ভূরি আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নাট্যসমালোচনায়, বা প্রকৃত নাট্য বিরচনে, বাঙ্গালার পারদর্শিতার কথা কিছুই জানা যায় না।† বাঙ্গালায় গৌরব ভট্টনারায়ণ প্রকৃত বাঙ্গালী নহেন। তৎপরে চৈতন্য চন্দ্রোধর, ললিতমাধব বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি যে স্বল্প কয়েকখানি নাটক আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃত নাটক পদবাচ্য হইতে পারে না, উহাদিগকে নাট্যকাব্য বলিলেই ভাল হয়।

প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব পারিষদবর্গের সহিত কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন, আপামর জনসাধারণে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হইত। মহাপ্রভুর কৃষ্ণলীলা সংস্কৃত ভাষায় না বাঙ্গালায় বিরচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে যখন জনসাধারণের সমক্ষে উহা অভিনীত হইত, তখন

* লোপের মাত্রাটা এত অধিক হইয়াছিল যে, এত প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত ১০০ খানি নাটকও আবিষ্কৃত হয় নাই।

† সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াগিয়াছে যে সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বঙ্গবাসী ছিলেন না, তিনি উড়িষ্যাদেশবাসী ছিলেন।

বঙ্গভাষাতেই হওয়ার বিশেষ সম্ভব। তাহা হইলে মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণলীলা' আমাদের বঙ্গভাষার আদি দৃশ্যকাব্য। বস্তুতঃ এই সময় হইতেই বঙ্গভাষার প্রকৃত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতে থাকে।*

আমাদের বঙ্গীয় নাট্যকলা ও নাট্যশালার প্রকৃত উত্থানের সঙ্গে ভারতীয় নাট্যকলা কিংবা উহার ক্রমাবনতি-সমুত্থিত যাত্রা, হাফআকড়াই, কথকতা, পুতুলবাজি, ছায়াবাজি প্রভৃতির বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। বর্ত্তমান বঙ্গরঙ্গালয় ও তথায় অভিনীত নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন প্রভৃতির উৎপত্তি ও ক্রম পরিপুষ্টি, এমন কি অভিনয়-ভঙ্গী, সঙ্গীতের সুর তাল লয়, নৃত্যবিলাস ও দৃশ্যপটাদি বিরচন, সকলই বিলাতি রঙ্গালয়ের অনুকৃতিতে গঠিত।

আমাদের নাট্যানুরাগ ও নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ বটে, তবে তাঁহারা যে হাতে কলমে ধরিয়া শিখাইয়াছেন তাহা নহে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলেই সাহেবদের কলিকাতায় এক থিয়েটার হয় এবং তখনকার ইংরাজ রাজপুরুষেরাই উহার অনুষ্ঠাতা ও অভিনেতা ছিলেন। ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় ইংরাজদিগের দ্বারা যতগুলি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাদের মধ্যে সাঁসুচি থিয়েটার (Sans-Soci Theatre) বিশেষ খ্যাত।** এখানে যাতায়াতে সে সময়ের অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আবার এদিকে সুবিখ্যাত ইয়ুরেসিয়ান Prof. L.V. Derozio. এবং তৎপরে Captain Richardson মহোদয়দের প্রিয়তম ছাত্রদিগের সেক্‌স্‌পীয়রকৃত নাটকে পূর্ণাভিরতির ফলেই বাঙ্গালায় বহুশতাব্দী পরে আবার নাট্যানুশীলন আরম্ভ হয়। কালেজে বিনা সাজ পোষাকে বিনা দৃশ্যাবলীতে কেবল আবৃত্তিতে প্রায় প্রত্যহই একরূপ অভিনয় হইত। তাহাতেই সাহিত্যামোদী ছাত্রগণ পরম প্রীতি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। প্রোক্ত দুই অধ্যাপক অধিকন্তু ছাত্রদিগকে ইংরাজি থিয়েটার দেখিবার জন্য টিকিট দিতেন। এইরূপে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে নাট্যানুরাগ জাগিয়া উঠিল। তেমনি Oriental Seminary বিদ্যালয়ের অধ্যাপক Hermann Jaffroy ছাত্রদিগের মধ্যে নাট্যানুরাগ উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন।

---

* কিন্তু তখন কি প্রণালীতে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইত, এখনও উহার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদিত কতগুলি নাটক মাত্র পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে লোচনদাসের 'জগন্নাথ বল্লভ', যদুনন্দন দাসের 'বিদগ্ধমাধব বা রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব' এবং প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সব অনুবাদ নাটক-রীতিতে হয় নাই, উহারা ব্যাখ্যাসহ পয়ারাদি ছন্দে রচিত মূলের অনুবাদ মাত্র। উহারা অভিনয়ের জন্য লিখিত নহে, অভিনয়ের উপযোগীও নহে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃত বঙ্গভাষার নাট্যগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

** সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ Mr. Horace Heman Wilson, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক Mr. Stocquler, বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারী H.M. Parker, বোর্ডের মেম্বার Mr. Torrens এবং ব্যারিষ্টার Hume প্রভৃতি এই নাট্যমন্দিরে অভিনয় করিতেন।

হিন্দুকালেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারী তখনকার কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদিগের প্রধান শিক্ষার স্থল ছিল। সুতরাং তখনকার প্রায় সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত যুবকের হৃদয়েই ইঁহারা নাট্যানুরাগ বেশ বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই ফলে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' নামক এক নাটকের অভিনয় হয়।* ঐ নাটক ও উহার অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান যায় না। পরে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজের বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন।** নবীনবাবুর বাটীস্থ অভিনয় যাত্রারই নবসংস্কার হইয়াছিল মাত্র। প্রত্যেক দৃশ্যপটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একজন অভিনেতা সেই দৃশ্যসংক্রান্ত বিষয় ভারতচন্দ্র হইতে আবৃত্তি করিয়া দর্শকদিগকে শুনাইতেন। তদ্ব্যতীত প্রতিদৃশ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদিগকেও রঙ্গভূমিতে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বকুলমূলে উপবিষ্ট সুন্দর বা মালিনীর গৃহ দেখিবার জন্য দর্শককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইত। কিন্তু এই অভিনয়ে স্ত্রীচরিত্র স্ত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল।† অতঃপর শিক্ষিত ও অভিজাত মহোদয়গণের আন্তরিক নাট্যানুরাগ সত্ত্বেও বাঙ্গালায় ভাল নাটক না পাওয়ায় কিছু দিন ইংরাজি নাটকেরই অভিনয় হয়। এই ইংরাজী অভিনয়ে সময় সময় টিকিট বিক্রিয়ও হইত। অতঃপর ১২৬৩ সালেই বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রকৃত আরম্ভ বলা যায়, কারণ ইহার পর হইতেই নানাস্থানে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। পাথুরিয়া ঘাটার নিকটে চড়কডাঙ্গায় শ্রীযুক্ত জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটীতে ১২৬৩ সালে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত) "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" নাটক প্রথম অভিনীত হয়। পুরুষদ্বারাই স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইয়াছিল।* উহার পরদিনই সিমলায় ছাতুবাবুর বাড়ীতে বাঙ্গালায় শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হয়। তৎপরে মহাশ্বেতার

---

* Calcutta Review Vol XIII. 1850, Page 160. রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত সেই বৎসরের "সংবাদ কৌমুদী".

* কেহ কেহ বলে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পূর্ব্বে General Assembly's Institution-এর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাচাঁদা শিক্দার ভদ্রার্জ্জুন নাটক রচনা করেন। সর্ব্বাগ্রে চিনাবাজার ডোমটুলিতে ইংরাজদিগের নাট্যশালায় ইংরাজিতে 'বিদ্যাসুন্দর' The Disguise নামে অভিনীত হইয়াছিল।

† Vide Hindu Pioner of 1833. কিন্তু 'কলিকাতা মান্থলি জারন্যাল' নামে প্রাচীন মাসিকপত্রে দেখা যায় যে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার শুঁড়োর উদ্যানবাটীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ Horace Heman Wilson কৃত উত্তর রামচরিতের ইংরাজি অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দু ও সংস্কৃত কালেজের অনেক সুযোগ্য ছাত্র অভিনেতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

* ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে সাহেব ও বাঙ্গালীর সেকস্পীয়রের নাটকাদির অভিনয় দর্শনেই, দেশীয় শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মহোদয়দের মনে বাঙ্গালায় নাট্যাভিনয়ের ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই যাঁহার যেমন শক্তি তিনি তদ্রূপ নাট্যসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন।

অভিনয় হয়। এই সময়েই চুঁচুড়ায় কুলীনকুল সর্ব্বস্বের অভিনয় হয়। বাঙ্গালা-নাটকাভিনয়ের এই এক নূতন যুগ বলিতে হয়, কেননা এ সময়ে যেখানে যত চেষ্টা হইয়াছে, সর্ব্বত্র "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" ও "শকুন্তলা" ব্যতিরেকে অন্য নাটকের অভিনয় হয় নাই।† ঐ সনের চৈত্রমাসে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের প্রযত্নে তাঁহারই বাটীতে বেণীসংহার নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়। ইহাতে স্বয়ং সিংহ মহাশয়, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার Mr. W.C. Banerjee, সুবিখ্যাত অভিনেতা বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। ইহার আটমাস পরে কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতেই ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বিক্রমোর্ব্বশীয়ের বঙ্গানুবাদ অভিনীত হয়। এই সব অভিনয় দর্শনে শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ সম্প্রদায় এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে আর কাহারই যাত্রা, হাফ-আখড়াই, কবি, পাঁচালী কিংবা কথকতায় শ্রদ্ধা রহিল না। সকলেই থিয়েটার ও দৃশ্যাভিনয়ের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

ছাতুবাবুর বাটীতে শকুন্তলার অভিনয়ের অন্তে একদিন শ্রীযুক্ত (তৎপরে স্যার মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন—'দেখুন, দুই একদিনের আমোদে এত অর্থব্যয় না করিয়া স্থায়িভাবে একটী নাট্যশালা সংস্থাপিত করিতে পারিলে বোধ হয় অধিক উপকার হয়।' বক্তার ন্যায় শ্রোতাও একজন নাট্যামোদী ছিলেন, সুতরাং এই প্রস্তাব তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা প্রতাপচন্দ্র সাদরে গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ সকলেই প্রায় এই প্রস্তাবে পূর্ণানন্দ প্রকাশ করিলেন। সুতরাং রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত সুন্দর উদ্যানবাটীতে স্থায়ী নাট্যশালা নির্ম্মিত হইল। জাতীয় নাট্যশালার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় একতান বাদন সংগঠিত করিবার জন্য সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতি প্রভূত যত্নে ও পরিশ্রমে ইংরাজি রীতির অনুকরণে এক একতান বাদন সম্প্রদায় গঠিত করিলেন। বাঙ্গালায় এই প্রথম নাট্যশালা ও তৎসংক্রান্ত একতান বাদন সম্প্রদায়। এই রঙ্গালয়ে সর্ব্ব প্রথমে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদিত রত্নাবলীর অভিনয় হইয়াছিল। ইহার সঙ্গীতগুলি সে সময়কার সর্ব্বপ্রধান সঙ্গীত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহাশয় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত মহোদয়দের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বারা উহার ইংরাজি অনুবাদ করান হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই রত্নাবলী প্রথম অভিনীত হয়। তৎপরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হয়। এই প্রথম ইংরাজি ওয়ালার নাটকের অভিনয়। এই সময় সুবিখ্যাত কেশব সেনের উদ্যোগে সিন্দুরিয়াপটীতে ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কৃত 'বিধবা বিবাহ' নাটকের

---

† ইংরাজি অভিনয়ের জের তখনও একেবারে মেটে নাই। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার গৌরীভা গ্রামস্থ বাটীতে মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতিকে লইয়া সেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেট অভিনয় করেন।

প্রথম অভিনয় হয়। ইহাতে সুবিখ্যাত কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও রাখালচন্দ্র সেন মহাশয়গণ অভিনেতা হইয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গালয়ে এই প্রথম বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় (বৈশাখ, ১২৬৭ সাল)। 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'বিধবা বিবাহ' নাটকই প্রথম ইংরাজি আদর্শে লিখিত নাটক।

এই সময়ে বাগ্‌বাজারে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এক নাট্যাভিনয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহারা ১২৭১ সালের মধ্যকালে 'নলদময়ন্তী' নাটকের অভিনয় করেন। ইহারাই প্রথমে বিদেশে যাইয়া নাট্যসম্প্রদায়ের বিদেশে অভিনয়ের প্রবর্ত্তন করেন। দুই বৎসর পরে এই সম্প্রদায়ে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'ইন্দুপ্রভা' নাটকের অভিনয় হয়।* কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটারের মত স্থিরভাবে কোথায়ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এখানে ক্রমে মাইকেলের পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হয়। ইতিমধ্যে মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' নামক দুইখানি প্রহসন বিরচিত করেন। কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়া থিয়েটারে উহারা অভিনীত হয় না। ১২৭২ সালের চৈত্রমাসে ভবানীপুরস্থ 'অবৈতনিক নাট্যমন্দির' সম্প্রদায় সার রমেশ মিত্রের পুরাতন বাটীতে তদীয় মধ্যমভ্রাতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় নাটক 'সীতার বনবাসের' অভিনয় করেন।

বস্তুতঃ বেলগাছিয়া নাট্য শালার গঠন হইতে চারিদিকে একটি জীবন্ত নাট্যাভিনয় চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও শকুন্তলার একটা যুগ গিয়াছিল, এই যুগে সেইরূপ মাইকেলের 'পদ্মাবতীর' আদর অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। ১২৭০ সালে পাথুরিয়া ঘাটায় ˚গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পশ্চাৎ স্যার মহারাজা) একটি নাট্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ১২৭১ সালে মালবিকাগ্নিমিত্রের বঙ্গানুবাদের অভিনয় করেন। তৎপরে সুবিদ্বান্ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা সংবলিত 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া তথায় অভিনীত করান। বাঙ্গালা আদি সাধারণ থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এখানেই প্রথম নাটকাভিনয় দেখেন ও শেখেন।** যতীন্দ্রমোহনের এই নাট্যসম্প্রদায়ে ক্রমে তাঁহার প্রণীত 'বুঝলে কিনা?' 'মালতীমাধব,' 'উভয় সঙ্কট,'

---

* এই দলের অন্যতম অভিনেতা শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মিত্র একটি স্বতন্ত্র বাদক দল গঠন করেন। এই দলে বাগ্‌বাজার ও শ্যামবাজার নিবাসী কতিপয় যুবক যোগ দেন, তন্মধ্যে বসুপাড়ার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামবাজারের ডাক্তার দুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর, পশ্চাৎ বাঙ্গালার আদি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। এই বাদক দলের হিঙ্গুল খাঁ (ওরফে হেম বাবু) উত্তরকালে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতা ও সঙ্গীতাচার্য্য হইয়া ছিলেন। ইন্দুপ্রভা নাটক সেক্‌স্‌পীয়কৃত Merchent of voice-এর ছায়াবলম্বনে রচিত।

** এই সময়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু আত্মীয়তা সূত্রে যতীন্দ্রমোহনের বাটীতেই অবস্থান করিতেন। এই তাঁহার প্রথম অভিনয় দর্শন। তিনি এইখানে থাকিয়াই অভিনয়বিদ্যাসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তখন তিনি স্কুলে পড়িতেন, সুতরাং নাট্যাভিনয়ের কোনও সম্পর্কে থাকিতেন না।

'চক্ষুদান', 'রুক্মিণী-হরণ', 'রসাবিষ্কারবৃন্দক', অভিনীত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ে সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর একতান বাদক সম্প্রদায় বাজাইতেন। পাথুরিয়াঘাটায় বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হইবার সময় জোড়াসাঁকোতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে 'জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরীন্দ্রবাবুর উভয় পুত্র গণেন্দ্র নাথ ও গুণেন্দ্রনাথ উহার পৃষ্ঠপোষক, এবং কেশববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী ও প্রোফেসর প্যারিচাঁদের পুত্র শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার পরামর্শ দাতা ছিলেন। ১২৭৩ সাল ২২ শে পৌষ রামনারায়ণের 'নবনাটক' এখানে প্রথম অভিনীত হয়। ইহারা কেবল সমাজ সংস্কারক নাটক ও প্রহসনেরই অভিনয় করিতেন। এখানকার অভিনয় দেখিয়াই সুবিখ্যাত অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতেন, 'অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার ও শুনিবার বাকি ছিল তাহা তাহার সম্পূর্ণ হইয়া গেল'। এখানকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের সুখ্যাতি কলিকাতার সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়া পড়িল। 'চোর বাগান অবৈতনিক থিয়েটার' হইতেই অর্দ্ধেন্দুবাবু থিয়েটারের সাক্ষাৎ সংস্রবে আসেন। ঐ সম্প্রদায়ে ভোলানাথ বাবুর 'কিছু কিছু বুঝি' নামক নতুন প্রহসনের অভিনয়ের মহালায় হেমেন্দ্রবাবু (মহর্ষির দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ও অর্দ্ধেন্দুবাবু দল গঠন করেন। অর্দ্ধেন্দু বাবুর নাট্যাভিনয় কার্য্যে এই হাতে খড়ি। মুস্তফী মহাশয়ের বিচিত্র স্বরভঙ্গী ও অনুকরণপটুতাই তাঁহার নাট্যশিক্ষকতার অনুকূল হইয়াছিল। ১২৭৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক এই প্রহসনের প্রথম অভিনয় হয়। এই সঙ্গে মুস্তফীর বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় এই দলে যোগদান করেন। তিনিই রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। এই তাঁহার এই কার্য্যে হাতে খড়ি। মধুসূদন ইহাদের অভিনয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—'মৃত্তিকেরে বাবা মৃত্তিকে' (অর্থাৎ অন্যসবকে মাটি করিল)। এই অভিনয় হইতে মুস্তফী ও সুর মহাশয়ের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

এই সময়ে বহুবাজারে একটি নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়া তথায় মনোমোহন বসু মহাশয়ের 'সতী নাটক' ও 'রামাভিষেক নাটক' অভিনীত হয়। বাঙ্গালা নাটকের এই আর এক যুগ। যেমন প্রথম যুগে কুলীনকুল সর্ব্বস্ব ও শকুন্তলা, দ্বিতীয় যুগে পদ্মাবতী, তেমনি 'রামাভিষেক' নাটকের এক নবযুগ আরম্ভ হইল। অভিনয়ের এই তৃতীয় যুগে সর্ব্বত্রই 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় হইতে আরম্ভ হইল।

বঙ্গনাট্য-সম্প্রদায়ে গিরিশচন্দ্রে প্রথম প্রবেশ।

পূর্ব্বোল্লিখিত 'বাগ্‌বাজার একতান বাদন সম্প্রদায়ের' অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেবল বাদ্যের সুখ্যাতিতে প্রীত না হইয়া বাগ্‌বাজারে হরলাল মিত্রের গলিতে (মুখুয্যে পাড়ায়) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে একটি নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে নগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ববন্ধু

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়, শ্রীযুক্ত আপানচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগ দেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় নগেন্দ্র বাবুর আগ্রহ সত্ত্বেও তখন যোগ দিতে পারিলেন না। গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু। তিনি ইহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিদ্বান্ ও নাট্যরসজ্ঞ বলিয়া নগেন্দ্রনাথ তাহাকে মহাসমাদরে এই দলে আহ্বান করিলেন, গিরিশচন্দ্রও সাদরে সুহৃদয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার এটি একটি বিশিষ্ট দিন, কেননা গিরিশচন্দ্রের নাট্যসমাজে এই প্রথম হাতে খড়ি। কিন্তু অনভিজ্ঞতায় কিছু আসিল যাইল না, প্রতিভাবান্ গিরিশচন্দ্র প্রবীণ অধ্যাপকের ন্যায় দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয়ার্থ স্থির করিয়া মহালা দিতে আরম্ভ করিলেন। দীনবন্ধু বাবুর লেখায় নট-নটী লইয়া কোন প্রস্তাবনা ছিল না। কিন্তু তখনও প্রস্তাবনা ব্যতিরেকে নাটকের অভিনয় হইত না, সুতরাং গিরিশবাবু নিজেই প্রস্তাবনা লিখিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রথম হইতেই তিনি গ্রন্থকার ও অভিনয় শিক্ষক হইলেন। কিন্তু গিরিশবাবু তখন আফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহার সহকারিরূপে অর্দ্ধেন্দুবাবু (এখন তাঁহার অন্য কোথায় ও কার্য্য ছিল না বলিয়া) নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে আখড়াই-এর আড্ডা ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে উঠাইয়া আনা হইল। ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাসে পূজার সময়ে সপ্তমীর রাত্রে মুখুয্যে পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে "The Bagbazar Amateur Theatre" নামে এই দলের প্রথম অভিনয় হয়। আবার কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে গিরিশবাবুর শ্বশুরালয়ে ইহাদের পুনরভিনয় হয়। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি চারিদ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অভিনেতাদের ও হৃদয়ে অভিনয় চিকীর্ষা বলবতী হয়। এই সম্প্রদায়ের চতুর্থাভিনয় রজনীতে তোষাখানার দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতে স্বয়ং গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে তিনি ষ্টেজের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া গিরিশচন্দ্রকে বিশেষ প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—'আমার নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।' এইদিন সধবার একাদশীর পর দীনবন্ধুবাবুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়। উহাতে গিরিশচন্দ্র একটী কবিতায় উহার প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রন্থকার পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গিরিশচন্দ্রের ভূয়োভূয় ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন।*

---

* প্রস্তাবনাটী এই—

"মাতলামীটে ফুবিয়ে গেল, দেখুন বুড়র রঙ্।
বাসর ঘরে টোপর পরে কিবা বিয়ের ঢঙ্।।

এই সম্প্রদায় খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময়ে (১২৭৬ সাল, আশ্বিন) অভিনয়ে (পশ্চাৎ সুবিখ্যাত অভিনেতা) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসুকে প্রাপ্ত হন। তৎপরে বাগবাজার সম্প্রদায় অর্থাভাবে গতাসুপ্রায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, অবশেষে শ্যামবাজারে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাটীতে, ইতিপূর্ব্বে গিরিশবাবুর শ্যালক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দেব যে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার কাঠকাটরা দ্বারা ও বৃন্দাবন পাল মহাশয়ের পোষ্যপুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র পাল মহাশয়ের অর্থসাহায্যে, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র পাল মহাশয়দের একরূপ ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রমে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত করিলেন। ১২৭৮ সালের বর্ষাকালে এই রঙ্গমঞ্চে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। তথায় ঐ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তে The National Theatre নাম হইল।*

এই অভিনয়ে দীনবন্ধুবাবু ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই অভিনয়ে পরম প্রীত হন। আবার অর্থাভাব হওয়ায়, সম্প্রদায় বহুকষ্টে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের অনুকম্পায়, তাঁহার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা ঘাটের চাঁদনীর উপরে বারোয়ারী বৈঠখানায় উঠিয়া গিয়া মহালা দিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে দলে একটা শৃঙ্খলা হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক হইলেন, ধর্ম্মদাস বাবু ম্যানেজার হইলেন, কার্ত্তিকবাবু ড্রেসার হইলেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু ডিরেক্টর ও শিক্ষক হইলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের গায়ক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় আবশ্যক মত নেপথ্য হইতে গান গাইতেন। গিরিশবাবু এখন এদলে ছিলেন না। নীলদর্পণের মহালা চলিল। এই সময়ে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অর্দ্ধেন্দুবাবুর প্ররোচনায় তাঁহার কাশীধামের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দলে যোগ দিলেন। তৎপরে পাথুরিয়াঘাটার মোড়ে মধুসূদন সান্যালের বৃহৎ বাড়ির উঠানটি মাসিক ৩০ টাকায় ভাড়া করিয়া ঐ সম্প্রদায় ষ্টেজ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মদাস বাবুই ষ্টেজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ১২৭৫ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ে নীলদর্পণ অভিনীত হইল। প্রথম দিনেই ৭০০ সাত শত টাকার টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমে এখানে 'জামাই বারিক', 'নবীন তপস্বিনী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়। অতঃপর

আয়না নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল্।
ক্ষমা করিবেন দোষ রসিক মণ্ডল।।
আস্‌ছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার ফুরালো আমার কথা।।"

* তখন এই সম্প্রদায়ে ছিলেন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, সুরেশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলু বাবু), ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিঙ্গুল খাঁ (হেমবাবু), যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, শশিনাথ দাস ইত্যাদি।

মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র এই সম্প্রদায়ে আবার যোগদান করিয়া নায়ক ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতার বড় বড় সাহেব, এমন কি বড় লাট সাহেব পর্য্যন্ত, ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়দর্শনে আসিতেন। ১২৭৯ সালের বর্ষার প্রাক্কালে (১৮৭৩, মার্চ) ন্যাশনাল থিয়েটার নানাকারণে বন্ধ হইতে বাধ্য হয়।

সান্যাল বাড়ীতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ছাতুবাবুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ একটি সাধারণ থিয়েটার খুলিতে প্রলুব্ধ হন। তারপর মাইকেল, Mr. O. C. Dutt, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রভৃতির পরামর্শে শরৎবাবু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লইয়া, ছাতুবাবুর মাঠ ভাড়া করিয়া একটি স্থায়ী নাট্যশালা নির্ম্মাণ করেন। ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, আগষ্ট) Bengal Theatreএ প্রথম শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় হয়। এখানে বারাঙ্গনা লইয়াই অভিনয় আরম্ভ হয়। তাহারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিত।* এই থিয়েটারে ক্রমে মাইকেলের 'মায়াকানন', 'বিষ কি ধনুর্গুণ', 'উঃ মোহান্তের একি কাজ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রত্নাবলী', 'এঁরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব', 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অভিনীত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গিয়া দুইটি দল হইয়া যায়। একদলে ধর্ম্মদাস বাবু প্রভৃতি ও অপর দলে অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি থাকেন। ধর্ম্মদাস বাবু টাউনহলে ষ্টেজ বাঁধিয়া National Theatre নাম দিয়া অভিনয় করিয়া দেশীয় হাঁসপাতালে ও অন্যান্য সৎকার্য্যে বিস্তর সাহায্য করেন। উহাতে সময় সময় গিরিশবাবুও অভিনয় করিতেন। দেখাদেখি অর্দ্ধেন্দুবাবুর দলও 'অপেরা হাউস' ভাড়া লইয়া "Hindu National Theatre" নাম দিয়া অনেক অভিনয় করেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে 'মোহান্তের এ কি কাজ' দেখিতে গিয়া ধর্ম্মদাস বাবু, ভুবন বাবু ও নগেন্দ্রবাবু আবার থিয়েটার করিবার মতি স্থির করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর ৬/১ নং বীডন ষ্ট্রীটে Great National Theatre-এর ভিত্তি স্থাপিত করেন। ধর্ম্মদাসবাবু তখনকার লুইস থিয়েটারের আদর্শে এই নাট্যশালা প্রস্তুত করেন। ঐ বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলা হয়। উহার পর বৎসরই বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে এখানে স্ত্রী অভিনেত্রী নেওয়া হয়। কিছুকাল পরে ভুবনবাবু থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া উহা ভাড়া দেন। শেষে প্রতাপ জহুরী Great National Theatre প্রকাশ্য নিলামে ক্রয় করেন। গিরিশবাবু আবার ম্যানেজার হন। কিছুদিন বাদে, জহুরীবাবুর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায়, গিরিশচন্দ্র গুরুমুখ রায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ৬৮নং বীডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যোগ দেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই ষ্টার থিয়েটার খোলা হয়।

---

* Mr. O. C. Dutt, পণ্ডিত শামাশ্রমী ও মাইকেলের পরামর্শমত শরৎবাবু বারাঙ্গনা লইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যাত্রার দলেও মেয়েরা অভিনয় করিত।

জুবিলীর বৎসর বাবু গোপাললাল শীল একটি নাট্যশালা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর প্রযত্নে একটি দল গঠিত হয়। শীল বাবু বীডন ষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের বাটী এবং জমি ক্রয় করেন। তৎপরে নূতন করিয়া Emerald Theatre গৃহ নির্ম্মিত হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী ইহার অধ্যক্ষ হন এবং তাঁহার রচিত 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন' অভিনীত হয়। ইহাদের দ্বারা আদর্শ থিয়েটার চলে না জানিয়া শীল বাবু ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা বোনাস ও ৩৫০ সাড়ে তিন শত টাকা মাসিক বেতনে গিরিশবাবুকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। গোপালবাবুর নিকট হইতে লব্ধ ২০,০০০ বিশ হাজার টাকার মধ্যে ১৬,০০০ ষোল হাজার টাকা তিনি ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায়কে দিয়াছিলেন। উহাদ্বারা তাঁহারা হাতীবাগানে নূতন ষ্টার রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঁপ্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় Great National থিয়েটারের জমি ক্রয় করিয়া গিরিশচন্দ্রকে লইয়া Minerva Theatre গৃহ নির্ম্মাণ করেন ও তথায় গিরিশবাবুর পরিচালনায় এক নূতন সম্প্রদায় গঠিত হয়। তাহার পর উহা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের হস্তগত হয়। তাহার পর উহা শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়দ্বয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। ঐ সময়ে মীনার্ভা থিয়েটার কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। শেষে এক মহেন্দ্রবাবুর কর্ত্তৃত্বে, মহেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবুর পরিচালনায় উহা কলিকাতার আদর্শ থিয়েটার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যখন এমারেল্ড থিয়েটার ধ্বংস হয় সেই সময় কবি রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বীণা-রঙ্গভূমি নামে এক নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া বালক অভিনেতা দ্বারা অভিনেত্রীর কার্য্য চালাইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি উহাতে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিলেন। শেষে স্ত্রী অভিনেত্রী লইয়াও উহা আর টিকিল না।

এমারেল্ড থিয়েটারে পরে অমরেন্দ্রবাবু পরিচালিত ক্লাসিক থিয়েটার, তারপরে শরৎবাবু পরিচালিত কোহিনুর থিয়েটার, পরিশেষে এক্ষণে মনোমোহনবাবুর 'মনোমোহন থিয়েটার' মহা সমারোহে চলিতেছে।

বেঙ্গল থিয়েটার গৃহে বেঙ্গলের অন্তে কত কত নূতন নূতন থিয়েটার হইল ও গেল, পরিশেষে এক্ষণে চিনাই থিয়েটার চলিতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় ঁমহেন্দ্রবাবুর কনীয়ান্ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি. এ.- পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার, ঁগোপাললাল শীলের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত গিরিমল্লিক মহাশয় পরিচালিত ষ্টার থিয়েটার এবং মনোমোহন বাবু পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটার, এই তিনটী সাধারণ থিয়েটার বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে উপেন্দ্রবাবুর পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।*

* মহেন্দ্রবাবু যেরূপ সুবিদ্বান্ ও নাট্যকলাবিত্ ছিলেন, তাঁহার কনীয়ান্ উপেন্দ্রবাবু ও তাদৃশ সুধী ও নাট্যবিদ্যাসুপণ্ডিত, সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্র আদর্শ। এইজন্য বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটার 'কাপ্তানের বিলাসভূমি' না হইয়া নাট্যকলার প্রকৃত লীলামন্দির, নাট্যাসেবী ও নাট্যমোদীর প্রকৃত 'বাণী-বিনোদ-নিকুঞ্জ।'

দ্বিতীয় কাণ্ড

গিরিশ প্রতিভার উন্মেষ ও পরিপুষ্টি

বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা ও গিরিশচন্দ্রের জীবনী পাঠে দেখিতে পাই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যসম্প্রদায় ও রঙ্গালয় কতিপয় নাট্যামোদী বন্ধুর আন্তরিক উদ্যোগে একরূপ তাহাদ্বারাই গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে কলিকাতায় নাট্যাভিনয় হইত বটে, তবে উহা অভিজাত মহোদয়দের সখের ছিল এবং একরূপ দৃশ্যপটাদি বিবর্জ্জিত বলিলেই হয়। ললিত নাট্যাভিনয় যে চতুঃষষ্টি কলার শ্রেষ্ঠ, উহা গিরিশচন্দ্রই এদেশে সর্ব প্রথমে বুঝিয়াছিলেন ও আজীবন গ্রন্থরচনায়, দৃশ্যপটাদিকল্পনে, এবং চতুর্ব্বিধ অভিনয়ে সুধী দর্শকমাত্রকেই প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকেই ইয়ুরোপীয় ও মার্কিণ প্রদেশস্থ রঙ্গালয় সংক্রান্ত বিবিধ গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার বিধিদত্ত নিত্য নবভাবোন্মেষিণী প্রতিভা দ্বারা রঙ্গালয় নির্ম্মাণবিধি, দৃশ্য-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা, নাট্যগ্রন্থরচনা ও অভিনয়ের অধ্যাপনা করিতে হইত।* অসম্পূর্ণ হইলেও সুগঠিত থিয়েটারে সুবিচক্ষণ অভিনেতা ও অধ্যক্ষের অধীনে কবিকুলচূড়ামণি সেক্স্পীয়রকে অনেক দিন যাবৎ শিক্ষানবিশ থাকিয়া পরিশেষে গ্লোব থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে সকলই নূতন গড়িয়া লইতে হইয়াছে। তিনিই তাঁহার সম্প্রদায়স্থ সকলের নেতা ও শিক্ষক, অথচ তাঁহার নেতা বা শিক্ষক কেহই ছিল না। কি লক্ষ লক্ষ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে কেবল অদম্য উৎসাহ ও অনুপম প্রতিভাবলে তাহাকে পদে পদে অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহা সর্ব্ববর্ণনার অতীত, শুদ্ধ অনুমেয়।

---

* অবশ্য প্রথমেই তিনি দৈবানুগ্রহে প্রতিভাবান্ অর্দ্ধেন্দু ও ধর্ম্মদাসকে দুই হস্তের ন্যায় পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা প্রতিভাবান্ হইলেও বৈজ্ঞানিক শিল্পী (Scientific professors of the art) ছিলেন না। সুতরাং গিরিশ উদ্ভাবিত বিষয়ের সুপ্রয়োগ ও অধ্যাপনায় হস্তস্বরূপ হইলেও মূল নাট্যকলা বিজ্ঞানের অনুশীলনে কোন সাহায্য করিতে পারিতেন না।

কেবল রঙ্গালয় গঠন কেন, অভিনয়-শিক্ষা, অনুরূপ দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদের পরিকল্পনা, সর্ব্বোপরি বিবিধ শ্রেণীর নাট্যপ্রণয়ন, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি বর্ত্তমান নাট্যসমাজে প্রকৃতই নাট্যাচার্য্য। সেক্‌স্‌পীয়র অনুপম নাট্যরচনায় জগতের সাহিত্যাকাশে চিরোজ্জ্বল মহাগ্রহরূপে চিরদিন দীপ্যমান থাকিবেন। গিরিশচন্দ্রও কি নাট্যপ্রণয়নে, কি অভিনয় অধ্যাপনে, কি দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি পরিকল্পনে, কি সঙ্গীত বিরচনে, কি নৃত্য পরিধাবনে, কি অভিনয়ে, সর্ব্বোপরি রঙ্গালয়-সুপরিচালনে, সর্ব্বত্র উদ্ভাবয়িতৃরূপে ষ্টিফেন্সন্, ওয়াট, নিয়ুটন, লিবাইন্‌টস, এডিসন্ প্রভৃতির ন্যায় সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়পটে চিরদিন উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। আমরা তাহাকে নাট্য বিরচনে সেক্‌স্‌পীয়র, মোলিয়র, রেসিনি, ম্যাটার-লিঙ্ক্ ও ইবসেন, নাট্যাভিনয়ে বারবেজ, গ্যারিক ও আয়ার্ডিং এবং রঙ্গালয় পরিচালনে দেবর্ষি ভরতের সঙ্গে তুলনা করিব। বস্তুতঃ একাধারে এতগুলি বিশিষ্টগুণের সুসমাবেশ কচিৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

নাট্যরচনায় গিরিশ প্রতিভা বিশ্বতোমুখী। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস সুন্দরের সমাবেশে অদ্বিতীয়, দিব্য কুসুমকুঞ্জ ব্যতীত 'গোবরফুলেরকেয়ারি' তাঁহার কাব্যকাননে কোথায়ও পরিলক্ষিত হইবে না। সেক্‌স্‌পীয়র পার্ব্বত্য অরণ্যে অভিনব কাব্যোদ্যান বিরচন করিয়াছিলেন; তাঁহার কাব্যকাননে কণ্টকীলতা হইতে পারিজাত তরু পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। মোলিয়র মানবহৃদয়ের লঘু ও তরল ভাবপুঞ্জের অভিনব কাব্যোপবন গঠন করিয়াছিলেন; তথায় তাম্বুল-আলিঙ্গিত পূগতরু নাই, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গাকার মহামহীরুহ নাই, আছে যূথী-জাতি-মল্লিকামালতী-কুসুমকুঞ্জ, আছে নির্গন্ধা অথচ হিতকরী অপরাজিতা, আর আছে শফরী-সমাকুল কুসরিৎ, বর্ষাহৃষ্ট ভেকরব। গিরিশচন্দ্রের কাব্যোদ্যানে কালিদাসের বাসন্তিক ভ্রমর-গুঞ্জন, শারদ-নির্ঝর-ঝাঙ্কৃতি, শিশির-বিকসিত-তারকাসম-কুন্দভাতি, গ্রীষ্ম সুভগসলিলাবগাহ, বর্ষাশোভী নীল-নীরদ-বলয় ও হেমন্তকান্তি কনক রসনিস্যন্দী হেমকূট; সেক্‌স্‌পীয়রের মধুর প্রাণমনোবিমোহিনী নিষ্পাপগাথা, উচ্চাশয়ের বিভীষণ নারক-তাণ্ডব, পাপের আপাতমধুর পরিণামে সর্ব্বনাশী বিলাস বিভ্রম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দারুণ সংঘর্ষ, সুসজ্জিত বাগানে আকস্মিক বজ্রনিপাত ও বিসংবাদী রসসমুচ্চয়ের সুমোহন সমাবেশ; এবং মোলিয়রের উন্মুক্ত রসবিলাস, নির্দ্দোষ কৌতুকতরঙ্গ, পাষাণে প্রেমপ্রস্রবণ, ঠিকে ভুল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, কৃপণের ধন কূপের পাণী—সকলই সুসম্বদ্ধ হইয়া সুমোহন সূত্রে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তী লেখককে পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ করিতেই হইবে। কিন্তু 'অরসিকের রস বর্ণন' বাঙ্গ্লার ন্যায় গিরিশচন্দ্রের অনুকরণ কোথায়ও হেয় অনুকৃতিতে পর্য্যবসিত হয় নাই। কালিদাস যেরূপ বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, সেক্‌স্‌পীয়র যেরূপ গ্রীক্ ও রোমক কবিদের অনুগমন করিয়া গিয়াছেন, মোলিয়র ও রেসিনি যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ইতালীয়,

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডীয় কবিদের অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও তদ্রূপ তাহাদিগকে অনুবর্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতিভা কখনও চলিত পথে চলে না, সে আপনার পথ আপনি করিয়া লয়, নীচ অনুকৃতি তাহাতে স্থান পাইবে কোথায়?*

এতদ্ব্যতীত গিরিশচন্দ্রে আর একটি অভিনব ভাবের অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই, যাহা কালিদাস, ভবভূতি, সেক্‌স্‌পীয়র, মোলিয়র, রেসিনি, ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, কল্ডিরণ, কিংবা অন্য কোনও নাট্যকারে পরিলক্ষিত হয় না। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস বাঙ্গালার একেবারে নিজস্ব। সংস্কৃত নাটকে সাঙ্গরূপক আছে, ইংরাজিতে মিষ্টিরি, মিরাকল ও মোরালিটি দৃশ্যকাব্য আছে, কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নাট্য-সম্পৎ পরিশূন্য। মাস্‌ক্‌, টেবিলু প্রভৃতিও প্রায় তাদৃশ। কিন্তু কি ইয়ুরোপে, কি এসিয়ায়, কোথায়ও কেহ ভক্তিবন্যার উচ্ছ্বাসে গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।* তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল', 'রূপসনাতন' ও 'চৈতন্যলীলা' বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে অপ্রতিম চির নূতন আনন্দলহরী। যে প্রেম ও ভক্তিগঙ্গার উচ্ছ্বাসে শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র বঙ্গ ভাসাইয়া নিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রও তাঁহার প্রোক্ত নাটক তিনখানিতে উহার জীবন্ত চিত্র প্রদর্শিত করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমি হইতে একরূপ 'অবিশ্বাস', 'নাস্তিকতা' প্রভৃতি বিদূরিত করিয়াছিলেন। এই তিনখানি নাটক বঙ্গবাসীর

---

* প্রতিভা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—

"প্রতিভা চলার পথে চলে না, সে আপনার পথ আপনি করিয়া লয়। পূর্ব্বে বিলাত হইতে জাহাজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ছয় মাসে ভারতবর্ষে আসিত। প্রতিভা সুয়েজ ক্যানাল প্রস্তুত করিয়া ছয়মাসের পথ ছয় সপ্তাহে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। আবার বাষ্পীয় যানের উন্নতিতে তাহাও ক্রমে তিন সপ্তাহে পরিণত হইয়াছে।

কবি সরলতা ও সত্যের উপাসক। প্রকৃত কবি নিজের কোনওরূপ মনোভাব সাধারণের নিকটে গোপন করেন না, এবং সংসারে লোকচরিত্র যেমন দেখেন, অকপটে তেমনি বর্ণনা করেন। কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে কে তুষ্ট হয়? এই জন্য লোকশিক্ষক কবি অনেক সময় নিন্দাভাজন হ'ন। জীবনে যশোলাভ তাঁহার ভাগ্যে কদাচ ঘটে। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে ঋষি যে সকল সত্যের উপলব্ধি করেন, তাহার সম সাময়িক লোক তাহা ধারণা করিতে পারে না। পরে যখন সাধারণের সে সকল উপলব্ধি করিবার সময় আসে, তখন তাঁহার আদর হয়। প্রতিভার দুর্ভাগ্য সে সময়ের অগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সময়ের ও মানব সাধারণের দোষ গুণ দেখাইয়া দেওয়া নাট্যকারের প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু লোকে কখন কখন ভ্রান্তিবশতঃ ঐ সকল দোষ ব্যক্তিগতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য কবিকে সময়ে সময়ে অনেক নিন্দা, শত্রুতা, এমন কি নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয়।" গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,—

'তুচ্ছ লোকে তুচ্ছ করে, লেখনী ধরিয়া করে,
কখনো করিনি কা'রো কুরব রটন।'

* ইংলণ্ডের টেবিলুর অনুকরণে মুকুলমুঞ্জরা ও মাস্কের অনুকরে পাঁচকনে প্রভৃতি গিরিশ বিরচিত নাটক ও প্রহসন মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহারা জুয়ারের সঙ্গে আসিয়াছে আবার ভাটার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, কেহ পরবর্ত্তীকালে আর উহাদের সন্ধান রাখিবে না, কেননা, উহারা কৃত্রিম, রঙ্গীন ছবিমাত্র, কৃত্রিমতার আদর তাৎকালীক, পরে সকলেই ভুলিয়া যায়।

নিকটে শুদ্ধ প্রথম শ্রেণীর নাটক বলিয়া সমাদৃত নহে, উহারা বঙ্গীয় হিন্দুমাত্রেরই প্রাণের পূজনীয় জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র।

গিরিশচন্দ্র কখনও নিজহস্তে লিখিয়া নাট্যরচনা করিতেন না। তিনি বর্ণনীয় বিষয়ের চিন্তায় তন্ময় হইয়া মুখে বলিয়া যাইতেন, এবং লেখক লিখিয়া যাইত। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের রচনায় কোথায়ও অস্বাভাবিকত্ব বা কৃত্রিমত্ব লক্ষিত হয় না। সময়ে সময়ে এক চরিত্র একভাবে অঙ্কিত করিতে করিতে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাব চিত্তে উদ্রিক্ত হইবামাত্র তিনি, যাহা কিছু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন ভাবানুযায়ী আবার বলিয়া যাইতেন, লেখকও লিখিয়া যাইত। নাট্য রচনায় ইহার চেয়ে সুন্দরতর রীতি আর কি হইতে পারে? ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবার পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ নানাস্থান হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক একমনে পাঠ করিতেন। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। যদবধি তিনি সর্ব্ব বিবরণ পাঠে প্রীতচিত্ত না হইতেন তদবধি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। সমুদায় বিবরণগুলি যখন ঠিক মনোমধ্যে সুবিন্যস্ত হইয়া যাইত তখনই লেখককে লিখিতে বলিয়া তিনি বলিয়া যাইতেন।*

এদেশের রঙ্গালয় ও অভিনেতৃবৃন্দ অনেকের চক্ষে নিন্দিত হইলেও সাধারণের নিকটে পরম সমাদরের আস্পদ, এবং নাট্যরথিগণ, কি জীবদ্দশায় কি জীবিতাবসানে, তাঁহাদের প্রতিভা-প্রসূত নাট্যসাহিত্যের জন্য আপামর সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকটে চিরদিনই পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বিশ্ব বিদ্যালয়কর্ত্তৃক বঙ্গ সাহিত্যের সমাদরের সঙ্গে সঙ্গে সৎ-সাহিত্যহারের মধ্যমণি নাট্যকলারও সমাদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কবিবর গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্যার্থী মাত্রেরই হৃদয়পটে প্রগাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলিতে নিত্য পূজিত হইতেছেন।

বস্তুত সর্ব্ব বিদ্যাই সর্ব্বত্র শৈশবে সকলের সাদরের সামগ্রী হইতে পারে না। ক্রমশঃ ভূরি চর্চ্চায় উহার ক্রমবিকাশে উপকারিতার মাত্রা পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নাট্যবিদ্যা, যেমন কল্পনামূলক (theatrical) তেমনি ব্যবহারমূলক (practical) উহাতে কল্পনায় ফলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারমূলক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির নিগূঢ় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। নাটকের কাব্যাংশ আখ্যানবস্তু যেমন কল্পনামূলক, তেমনি চতুর্বিধ অভিনয়াঙ্গ ব্যবহারমূলক। আখ্যান বস্তুটি বর্ণনাপ্রধান হইলে নাটকের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না, কেননা নাটক

---

* শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবু একদিন গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'দাদা, অনেক নাট্যকারই নাটক লিখিবার পূর্ব্বে নাটকীয় আখ্যানবস্তুটি কল্পনা করিয়া, দৃশ্যাদিতে ভাগ করিয়া, পশ্চাৎ রচনায় প্রবৃত্ত হতে আপনি কি করেন? গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি আগে নায়ক চরিত্র কল্পনা করি, তারপর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা প্রভৃতি সৃষ্টি করি। দেখ, যতপ্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস লেখা উহারই নীচে।" গিরিশ প্রসঙ্গ ১৭৫ পৃষ্ঠা।

দৃশ্য-কাব্য, দৃশ্য বিষয়ই ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য। অভিনয় কলার ক্রমোন্নতি জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্রম-পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ। বস্তুতঃ ইয়ুরোপে তাড়িত বিদ্যার (electricity) ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়গুলি সহসা কল্পনাতীত রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতের পুরাকালীয় কালিদাস, ভাস, শূদ্রক, ভবভূতি প্রভৃতির নাটকাদি অধ্যয়নেও অবগত হওয়া যায় যে এতদ্দেশেও বৈজ্ঞানিক অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় কলার বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকে শারদ পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রভাতের বর্ণনায় একই সরোবরে যুগপৎ সূর্য্যোদয়ে কমলবিকাশ ও চন্দ্রাস্তগমনে কুমুদ-নিমীলন দৃশ্যটি এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সমুদীয়মান বর্ত্তমান রঙ্গালয়বর্গের পক্ষেও বিস্ময়কর ব্যাপার। আবার মাতলি-পরিচালিত ব্যোমরথে মহারাজ দুষ্যন্তের শূন্যমার্গে বিচরণ ও সানুমতীনাম্নী অপ্সরার তিরস্করণী বিদ্যাবলে প্রমোদবন-রক্ষিকাদিগের সমীপেই অদৃশ্যভাবে অবস্থান প্রকৃত পক্ষে রঙ্গালয়সংক্রান্ত আহার্য্য শোভার চরমোৎকর্ষ সূচিত করে না কি? এমন কি, ঐ নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রথারূঢ় দুষ্যন্তের মৃগানুসরণ দৃশ্যে যে দৃষ্টিবিভ্রমের (Optical illusion) সূচনা করে, তাহা কোন কালের দৃশ্যপটের অভ্যুন্নতির পরাকাষ্ঠা না সূচিত করিতেছে? বিক্রমোর্ব্বশীয়েও কবিবর ত্রোটক-সংক্রান্ত (melo-drama) দৃশ্যপট, সঙ্গীত, নৃত্য, পরিচ্ছদ ও দৃষ্টিনিক্ষেপ প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি উন্নতিশীল রঙ্গালয়ের প্রমাণ করিয়াছেন। ভবভূতির উত্তররামচরিতে তৃতীয়াঙ্কে ছায়া-সীতামূর্ত্তির সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার দৃশ্য, এমন কি, এখনকার রঙ্গালয়েও বোধ হয় দেখাইবার ক্ষমতা হয় নাই। মৃচ্ছকটিক নাটকে চৌর্য্য ব্যাপারের দৃশ্য অদ্যাপি সমুদায় রঙ্গাচার্য্যের নিকটে প্রগাঢ় প্রহেলিকাময়!

অভিনয়ের চারিটি প্রধান অঙ্গ, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। আঙ্গিক অভিনয়ে অভিনেতাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে, যে ভূমিকায় অভিনয় তাহাকে করিতে হইবে উহার রস ও ভাবের, অনুরূপ অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। এখানে প্রায়ই অনেকে নিরর্থক মুদ্রাদোষের হাস্যকর অভিনয় করিয়া সমগ্র অভিনয়টি দুগ্ধভাণ্ডে গোমূত্র প্রক্ষেপের ন্যায়, একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকেন। বাচিক অভিনয়ে অভিনেয় চরিত্রের অনুরূপ ভাষায় তদনুরূপ আবৃত্তি দ্বারা রস ও ভাবের অনুরূপ অভিব্যঞ্জক অভিনয় প্রদর্শন করিতে হইবে। এখানেও গ্রন্থকারের দোষে ভাষার অননুরূপতায় এবং অনেক সময়ে অভিনেতার রসাদি বোধের অভাবে অস্থানে উচ্ছ্বাস বা সুর বা চীৎকারে সমগ্র অভিনয়টি একেবারে নীরস ও বিরক্তিকর করিয়া তুলেন। আহার্য্য অভিনয়ে দৃশ্য ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির রস ও ভাবানুরূপ ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরর্থক অত্যন্ত ঝক্‌মকে দৃশ্য ও নানাবিধ শল্‌মা-চুমকি-কড়ম্বিত বহুমূল্য পরিচ্ছদের আঁড়ম্বরে অভিনয় নষ্ট হয় মাত্র। দেশ, কাল ও পাত্রোচিত দৃশ্য ও পরিচ্ছদ নিতান্ত দরকার। চাষার মুখে সাধুভাষা ও পণ্ডিতের ন্যায় উচ্চারণ

যেরূপ হাস্যকর, তদ্রূপ তাহাকে নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া আনয়ন করিলে হাস্যকর ব্যতীত আর কি হইবে। তবে নীলদর্পণের সাধুচরণ সাধু ভাষায়ই কথা কহিবে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কাপড় ও চাদর পরিবে। সাত্ত্বিক অভিনয়টি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাতে পাত্রের রস ও ভাবানুরূপ আকৃতি, প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বর হওয়া দরকার। Make up অর্থাৎ রঙ্ ইত্যাদি দ্বারা আকৃতিগঠন তত কষ্টসাধ্য নহে, কিন্তু প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বর শিক্ষা বড়ই কঠোর। ইহার জন্য গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। নানাবিধ প্রক্রিয়ায় অভিনয় শিক্ষকের প্রতি-অভিনেতাকে তদনুরূপ সাত্ত্বিকতা শিক্ষা দিতে হয়। গীতি ও নৃত্য সম্বন্ধেও ঐরূপ চতুর্ব্বিধ শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। বিনা শিক্ষায় কেবল সুস্বর গায়কের সঙ্গীত কাহারও প্রীতিপদ হয় না। সুর, তাল ও লয় সঙ্গীতের প্রাণ বটে, কিন্তু অভিনয়কালে গায়ককে চরিত্রানুরপ পুর্ব্বোক্ত চতুর্বিধভাবে সজ্জিত হইয়া গাইতে হইবে। নৃত্যের বেলাও ঐ নিয়ম নিতান্ত দরকার। বর্ত্তমানকালে বৈদ্যুতিক বিদ্যার পরিপুষ্টিতে দৃষ্টি-বিভ্রমকারী আলোরেখা-পাতের উপকারিতা অস্বীকার করিবার যো নাই। উহা দ্বারা পূর্ণমাত্রায় গীতিনাট্য প্রহসন প্রভৃতির কবিকল্পিত স্বপ্ন রাজ্যের উপস্থাপনা হইয়া থাকে। উহা ব্যতিরেকে গীতিনাট্যের অভিনয়ের স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়, লবণ হীন ব্যঞ্জনের মত নীরস হইয়া পড়ে। থিয়েটারের ম্যানেজারকে এই সব বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা না হইলে তিনি কিরূপে সঙ্গীত-অধ্যাপক-উদ্ভাষিত সুর, নৃত্যাচার্য্য-কল্পিত নাচ্ ও ভাবাভিব্যক্তি, অভিনয়-শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত আবৃত্তি-ক্রম প্রভৃতি ঠিক হইল কি না বিচার করিবেন? সর্ব্বোপরি দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ, 'মেক-আপ', গ্রন্থবিচার সকলই তাহাকে করিতে হয়। বস্তুতঃ রঙ্গালয় একটি বিশিষ্ট শিক্ষাস্থান, বিলাস-বিভ্রমের আগার নহে। স্কুল ও কলেজের অধ্যয়ন অপেক্ষা এখানকার পাঠাভ্যাস গুরুতর। তবে অভিনয় ও সঙ্গীতের অনুশীলন আশু প্রীতিকর ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া সুকঠিন হইলেও অভিনেতৃবৃন্দ সানন্দে উহার অনুশীলন করিয়া থাকেন। অনিদ্রায় রাত্রির পর রাত্রি অতীত হইয়া যাইতেছে তথাপি ক্লেশ বা শ্রান্তি বোধ হয় না। এজন্যই বোধ হয় নাট্যাভিনয় দ্বারা লোক-শিক্ষাকে প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর উপরের বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম লিখিত নাটকাবলীতে আমরা এক অভিনব ছন্দের অবস্থিতি দেখিতে পাই। উহা ছন্দোগ্রন্থ লিখিত কোনও ছন্দের সঙ্গে মিলিবে না। এই অদ্ভুত ছন্দ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের স্বীয় অভিমত কবিবর নবীনচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

*** তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ আর কিছুই নয়, 'গৈরিশ' ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ—'গৈরিশী ছন্দ' বলিয়া যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ

এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাবা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাবা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেই জন্য ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্, কোন ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, বা অন্য যে যে ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার হয় সকলগুলিই পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে কোনও বর্ণনা, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানে কথাবার্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা হউক, কোন্ ছন্দ অধিক। দীর্ঘত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণেঃ সহিত শেষচরণ মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয়,—যথা।

*** দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বাঁধিয়াছে করী।

লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয়চরণ ও শেষচরণ অনেক মিলিত হয় * * * *

বিরস বসন, রাণীর নিকটে যায়'।

এ সব বাদে পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষপদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। এখন আমার কথা এই যে এস্থলে নাটকে চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না। যথা,

'বীরবাহু চলি যবে গেলা স্বর্গপুরে,
অকালে।

এরূপ হামসোই হবে। বাঙ্গালা ভাবায় ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাবে। আর এক লাভ, ভাবা নীচ হইতে বিনা আয়াসে উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চৌদ্দর বড় কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু নাটকে অনেক স্থলেই তার প্রয়োজন।'

এই লিপিখানি পাঠ বেশ পরিস্ফুট হইতেছে যে অভিনয়োপযোগিনী ভাষার জন্য গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল। নাটকের ভাষা ভাবানুরূপিণী—যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হওয়া দরকার, অথচ বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠিত গদ্যে কিংবা ছন্দোবদ্ধ পদ্যে উহা প্রকাশ করিবার সম্ভব নাই, কেননা যদিও চলিত ভাষায় প্রহসন ও সহজ ভাব প্রকাশ করা যায়, তথাপি গম্ভীর চিন্তা-পরিজ্ঞাপক ভাষা মিত্রাক্ষর-সম্বন্ধ পদ্যে কিংবা বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী গদ্যে প্রকাশিত হইবার নহে। তাই তিনি এই নূতন, কেবল যতিলক্ষ্য অর্দ্ধছন্দো-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। মধুসূদন ইতিপূর্ব্বেই অমিত্রাক্ষরছন্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার আবার নবীন সারল্য বিধান করিলেন. গিরিশচন্দ্র সুতরাং অভিনেতার নিশ্বাসের মাত্রানুরূপ যতিলক্ষ্য করিয়া এই নূতন ছন্দের অবতারণা করিলেন। ইহা করিয়াছিলেন বলিয়াই তৎকৃত নাটকগুলি সকলেরই সুখ-পাঠ্য হইয়াছিল এবং অভিনয়কালে আবৃত্তির উচ্ছ্বাসে শ্রোতার প্রাণ মোহিত ও তন্ময় করিয়া তুলিত। ফলে যেমন গদ্য-ভাষার পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-চরিত্রের কথনানুরূপ ভাষা পাইলেন, অমনি ছন্দ ছাড়িয়া গদ্যেই লিখিতে লাগিলেন। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের শেষকালের গ্রন্থগুলিতে আর বড় ছন্দ পরিদৃষ্ট হয় না। ফলতঃ গিরিশচন্দ্র ভাষাকে প্রকৃত মনোভাব-জ্ঞাপিকা করিবার জন্যই এই অদ্ভুত ছন্দের অবতারণা করিয়াছিলেন, নূতন ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া

* থিয়েটার হইতে অভিনয়কালই পাওয়া যায়, রচনাকাল পাওয়া সুকঠিন। তবে রচনার অব্যবহিত পরেই যে উহাদের অনেকগুলিই অভিনীত হইয়াছে তাহা একরূপ জীবনী পাঠে জানা যায়।

লোকসমাজে স্মরণীয় হইবার জন্য নহে, তাই আবার যখন দেখিলেন ভাষার ঐশ্বর্য্য এখন এতদূর বাড়িয়াছে যে গদ্যেই তৎকৃত ছন্দ অপেক্ষা ভাবের অধিকতর স্বাভাবিকভাবে অভিব্যক্তি সম্ভব, তখনই ছন্দ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি ঠিক মনের ভাব প্রকাশিকা ভাষা চাহিয়াছিলেন, অভিনব ছন্দ চান নাই।

শ্রব্যকাব্যের কবির চিন্তাপ্রবাহ অভঙ্গ, গিরিপ্রবাহিণী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, ইচ্ছানুরূপ গতিশীল। কিন্তু দৃশ্য-কাব্যকারের স্বাধীন চিন্তা হইবার যো নাই। তাহাকে দেশ কাল ও পাত্র হিসাব করিয়া চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে। মিল্টন 'প্যারাডাইসলষ্ট', সম্বন্ধে শ্রব্য কাব্য লিখিতে পারেন' কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়র 'প্যারাডাইসলষ্ট' লিখিয়া অভিনয় করিতে পারেন না। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য লিখিলেন। গিরিশচন্দ্রকে তাহা হইতে অনেক বাদ দিয়া অভিনয়োপযোগী (অর্থাৎ শ্রোতৃবৃন্দের সহজ বোধাপযোগী) করিয়া, দৃশ্যকাব্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বহু আয়াসে অভিনয় করিতে হইয়াছে। নাট্য-প্রতিপাদ্য বস্তু ও শ্রব্য-কাব্য প্রতিপাদ্য বস্তুর বিষয় বিভিন্ন। নাট্যে দৃশ্যের দিকে প্রধান দৃষ্টি, দুই একটি অদৃশ্য বা সূচ্য বিষয় থাকিলে তাহা মাত্রসঙ্গীতে কিংবা দুই এক কথায় সূচিত করিয়া দৃশ্য বিষয়ই পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শিত করিতে হইবে। তারপর দর্শকবৃন্দের অভিরুচি, অভ্যাস ও চিন্তাশক্তির হিসাব করিয়া নাট্যকারকে বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শ্রব্যকাব্য বর্ণনাত্মক—শুধু কল্পনা বারিধি, উহার সমালোচনা সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু নাটকের সমালোচনা তাৎকালীক, বিবেচনারও অপেক্ষা সহে না। সুতরাং নাটককারের রচনায় অনেক বাধা; তাঁহার অনেক সংযম অনেক অভিজ্ঞতার আবশ্যক।

এক্ষণে গিরিশ প্রতিভার ক্রম বিকাশ প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা অগ্রে তাঁহার নাট্যাবলীর অভিনয়-কালানুসারিক* একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। তৎপরে প্রতিভার কালানুযায়ী উন্মেষক্রম ও পরিপুষ্টি দেখাইতে চেষ্টা করিব। মানুষের বয়ঃপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সংসারাভিজ্ঞতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ও সেই সঙ্গে প্রতিভারও পরিপূর্ত্তি হয়। কৈশোরান্তে যৌবনসন্ধিতে সমগ্র জগৎ আমাদের নিকট অতি সরল, একেবারে জটিলতা-পরিশূন্য, স্বপ্ন-বিজড়িত, নানাবর্ণে রঞ্জিত ও চির সুখ-সৌন্দর্য্যময় প্রতীয়মান হইতে থাকে, সুতরাং তখনকার রচনা ও যৌবনের উচ্ছ্বাসান্তে পূর্ণ বয়সের বিরচিত বিষয় কখনও একরূপ হইতে পারে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ভাবসমাধানও পরিবর্ত্তিত হইবে। গিরিশচন্দ্রে, সেক্‌স্‌পীয়রে, কালিদাসে, মোলিয়রে, এমনকি ভবভূতিতেও এ পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতে পাই।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যাবলীর তালিকা

প্রথম যুগ—(১২৮০-১২৯৭ সাল)

(গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত)

যৌবন—৩০-৪৭ বৎসর।

রঙ্গনাট্য।

১। মাউসি। ২। Charitable Dispensary. ৩। ধীবর ও দৈত্য। ৪। আলিবাবা। ৫। দুর্গাপূজায় পঞ্চরং। ৬। Circus Pantomime. ৭। যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপনচুম্বন (A kiss in the Dark). ৮। সাহস হইল আজি কবি চূড়ামণি।*

নাম		প্রথম অভিনয় রজনী	
৯। আগমনী	(গীতিনাট্য)	১৪ই আশ্বিন,	১২৮৪ সাল।
১০। অকালবোধন	(")	১৮ই আশ্বিন,	"
১১। দোললীলা	(")	ফাল্গুন,	"
১২। মায়াতরু	(")	১০ই মাঘ,	১২৮৭সাল
১৩। মোহিনী প্রতিমা,	(")	২৮ শে চৈত্র	
১৪। আলাদিন (পঞ্চরং)		"	"
১৫। আনন্দরহো	(গীতিনাট্য)	৯ই জ্যৈষ্ঠ,	১২৮৮ সাল।
১৬। রাবণবধ	(")	১৬ই শ্রাবণ,	"
১৭। সীতার বনবাস	(")	২রা আশ্বিন	"
১৮। অভিমন্যু বধ	(")	১২ই অগ্রহায়ণ	"
১৯। লক্ষ্মণ বর্জ্জন	(খণ্ড নাটক)	১৭ই পৌষ,	"
২০। সীতার বিবাহ	(নাটক)	২৮শে ফাল্গুন,	"
২১। ব্রজবিহার	(গীতিনাট্য)	চৈত্র	"
২২। রামের বনবাস	(নাটক)	৩রা বৈশাখ	১২৮৯ সাল।
২৩। সীতাহরণ	(")	৭ই শ্রাবণ,	"
২৪। ভোটমঙ্গল	(ব্যঙ্গ্যনাট্য)	২২শে আশ্বিন,	"
২৫। মলিনমালা	(গীতিনাট্য)	১২ই কার্ত্তিক,	"
২৬। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	(নাটক)	১লা মাঘ,	"

(বীডনষ্ট্রীটস্থিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

২৭। দক্ষযজ্ঞ	(নাটক)	৬ই শ্রাবণ,	১২৯০ সাল।

* এই আটখানি রঙ্গনাট্য গিরিশচন্দ্রের আদি রচিত। ইহারা দীনবন্ধু ও মধুসূদনের নাটকাদির অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর বসোয়েল অবিনাশবাবু পর্য্যন্ত এই রঙ্গনাট্যগুলির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

নাম		প্রথম অভিনয় রজনী	
২৮। ধ্রুবচরিত্র	(,,)	২৭শে শ্রাবণ,	,,
২৯। নলদময়ন্তী	(,,)	১লা পৌষ,	,,
৩০। কমলেকামিনী	(,,)	১৭ই চৈত্র,	,,
৩১। বৃষকেতু	(খণ্ড নাটক)	১৫ই বৈশাখ,	১২৯১ সাল।
৩২। হীরার ফুল	(গীতিনাট্য)	,,	,,
৩৩। শ্রীবৎস চিন্তা	(নাটক)	২৬শে জ্যৈষ্ঠ,	,,
৩৪। চৈতন্যলীলা	(,,)	১৯ শ্রাবণ,	,,
৩৫। প্রহ্লাদচরিত্র	(,,)	৮ই অগ্রহায়ণ,	,,
৩৬। নিমাই সন্ন্যাস	(,,)	১৬ই মাঘ,	,,
৩৭। প্রভাস যজ্ঞ	(,,)	২১শে বৈশাখ,	১২৯২ সাল।
৩৮। বুদ্ধদেব চরিত	(,,)	৪ঠা আশ্বিন,	,,
৩৯। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	(,,)	২০শে আষাঢ়	১৯৯৩ সাল।
৪০। বেল্লিকবাজার	(প্রহসন)	১০ই পৌষ,	১২৯৩ সাল।
৪১। রূপসনাতন	(নাটক)	৮ই পৌষ,	১২৯৪ সাল।
(এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত)			
৪২। পূর্ণচন্দ্র	(নাটক)	৫ই চৈত্র,	১২৯৪ সাল।
৪৩। বিষাদ	(,,)	২১শে আশ্বিন,	১২৯৫ সাল।
(হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)			
৪৪। নসীরাম	(নাটক)	১৩ই জ্যৈষ্ঠ,	১২৯৫ সাল।*
৪৫। প্রফুল্ল	(,,)	১৬ই বৈশাখ,	১২৯৬ সাল।
৪৬। হারানিধি	(,,)	২৪শে ভাদ্র,	১২৯৬ সাল।
৪৭। চণ্ড	(,,)	১১ই শ্রাবণ,	১২৯৭ সাল।
৪৮। মলিনাবিকাশ	(গীতিনাট্য)	২৯শে ভাদ্র,	,,
৪৯। মহাপূজা	(সাঙ্গরূপক)	১০ই পৌষ,	,,

*গিরিশচন্দ্র শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীলের এমারেল্ডে অবস্থানকালে নসীরাম নাটক লিখিয়া হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য প্রদান করেন। চুক্তিপত্র অনুসারে অন্যায় বলিয়া গিরিশবাবুর নাম লুকাইয়া 'সেবক প্রণীত' বলিয়া অমৃতবাবু উহা প্রকাশিত করেন। 'নসীরাম' নাটকই হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক। নসীরাম চরিত্রে গিরিশচন্দ্র স্বীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং পরমহংসদেবের 'কামিনীকাঞ্চন' কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। নাটকখানি অদ্বৈত বেদান্ত ধর্ম্মসার হইলেও নাট্য সম্পদে কোন অংশে ন্যূন নহে। অমৃতবাবুর 'নসীরামের' ভূমিকায় অভিনয় অদ্যাদি আদর্শরূপে গৃহীত।

দ্বিতীয় যুগ—(১২৯৯-১৩১১সাল)
প্রৌঢ়—(৪৯-৬১)
(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

নাম		প্রথম অভিনয় রজনী	
৫০। ম্যাক্‌বেথ	(নাটক)	১৬ ই মাঘ	১২৯৯ সাল।
৫১। মুকুলমুঞ্জরী	(,,)	২৪শে মাঘ,	,,
৫২। আবুহোসেন	(গীতিনাট্য)	১৩ই চৈত্র,	,,
৫৩। সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	(প্রহসন)	২২শে আশ্বিন,	১৩০০ সাল।
৫৪। জনা	(নাটক)	৯ই পৌষ,	,,
৫৫। বড়দিনের বক্‌সিস্‌	(প্রহসন)	১০ই পৌষ,	,,
৫৬। স্বপ্নের ফুল	(সাঙ্গরূপক)	২রা অগ্রহায়ণ,	১৩০১ সাল।
৫৭। সভ্যতার পাণ্ডা	(প্রহসন)	১১ই পৌষ,	,,
৫৮। করমেতিবাই	(নাটক)	৫ই জ্যৈষ্ঠ,	১৩০২ সাল।
৫৯। ফণিরমণি	(গীতিনাট্য)	১৩ই পৌষ,	,,
৬০। পাঁচক'নে	(প্রহসন)	২২শে পৌষ,	,,

(হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

৬১। কালাপাহাড়	(নাটক)	১১ই আশ্বিন,	১৩০৩ সাল।
৬২। হীরক জুবিলি	(গীতিনাট্য)	৭ই আষাঢ়,	১৩০৪ সাল।
৬৩। পারস্যপ্রসূন	(,,)	২৭শে ভাদ্র	,,
৬৪। মায়াবসান	(নাটক)	৪ঠা পৌষ,	,,

(ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত।)

৬৫। দেলদার	(গীতিনাট্য)	২৮শে জ্যৈষ্ঠ,	১৩০৬ সাল।
৬৬। পাণ্ডবগৌরব	(নাটক)	৬ই ফাল্গুন,	,,

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

৬৭। মণিহরণ	(গীতিনাট্য)	৭ ই শ্রাবণ,	১৩০৭ সাল।
৬৮। নন্দদুলাল	(,,)	১ লা ভাদ্র,	,,

(ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত)

৬৯। অশ্রুধারা	(সাঙ্গরূপক)	১৩ই মাঘ,	১৩০৭ সাল।
৭০। মনের মতন	(নাটক)	৭ই বৈশাখ,	১৩০৮ সাল।
৭১। অভিশাপ	(গীতিনাট্য)	১২ই আশ্বিন,	,,
৭২। শান্তি	(সাঙ্গরূপক)	২৪শে জ্যৈষ্ঠ	১৩০৯ সাল।
৭৩। ভ্রান্তি	(নাটক)	৩রা শ্রাবণ,	,,

তৃতীয় যুগ—(১৩১১-১৩১৮ সাল)
বার্দ্ধক্য—(৬১-৬৮)
(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

নাম		প্রথম অভিনয় রজনী	
৭৪। আয়না	(প্রহসন)	১০ই পৌষ,	”
৭৫। সৎনাম	(নাটক)	১৮ই বৈশাখ,	১৩১১ সাল।
৭৬। হরগৌরী	(গীতিনাট্য)	২০শে ফাল্গুন,	১৩১১ সাল।
৭৮। বলিদান	(নাটক)	২৬শে চৈত্র,	”
৭৯। সিরাজদৌল্লা	(নাটক)	২৪শে ভাদ্র,	১৩১২ সাল।
৭৯। বাসর	(গীতিনাট্য)	১৩ই পৌষ,	”
৮০। মীর কাসিম	(নাটক)	২রা আষাঢ়,	১৩১৩ সাল।
৮১। য্যায়সা কা ত্যায়সা	(গীতি-প্রহসন)	১৭ই পৌষ,	”
৮২। ছত্রপতি শিবাজী	(নাটক)	৩২শে শ্রাবণ,	১৩১৪ সাল।
৮৩। শাস্তি কি শান্তি	(নাটক)	২২শে কার্ত্তিক,	১৩১৫ সাল।
৮৪। শঙ্করাচার্য্য	(নাটক)	২রা মাঘ,	১৩১৬ সাল।
৮৫। অশোক	(নাটক)	১৭ই অগ্রহায়ণ,	১৩১৭ সাল।
৮৬। তপোবল	(নাটক)	২রা অগ্রহায়ণ,	১৩১৮ সাল।
৮৭। গৃহলক্ষ্মী	(নাটক)	৫ই আশ্বিন,	১৩১৯ সাল।*

নিত্যানন্দ বিলাস (গীতি নাটক), চাবুক (প্রহসন), এবং বিধবার বিবাহ (প্রহসন), শেষে পীড়িত অবস্থায় কবিবরের লিখিত, উহারা অদ্যাপি কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই।

গিরিশ-নাট্যাবলীর অভিনয়কাল সমালোচনায় তাঁহার প্রতিভার পরিস্ফুরণের তিনটি বিশিষ্ট যুগ আমরা দেখিতে পাই। প্রথম যুগের মধ্যে আবার কিছুদিন যাবৎ কবিবরকে শিক্ষানবিশের ন্যায় ভীতভীত পাদবিক্ষেপ কাব্য-সরোবরে অবগাহন করিতে দেখিতে পাই। 'মাউসি' প্রভৃতি আটখানি রঙ্গনাট্যে তিনি প্রথমে হাত মক্স করিয়াছিলেন। তৎপরে 'আগমনী' হইতে 'আলাদিন' পর্য্যন্ত সাতখানি গীতিনাট্যে প্রভাত অরুণের কিরণ রেখার ন্যায় গিরিশ-প্রতিভার স্ফুলিঙ্গমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। নাটক রচনায় 'আনন্দ রহো' শিক্ষানবীশের হস্তামর্শনমাত্র। 'রাবণবধ'ই গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত প্রথম নাটক। 'রাবণবধ' পৌরাণিক নাটক, সুতরাং কবিকে এখানে আখ্যানবস্তু বা চরিত্রাঙ্কনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয় নাই, কেবল কৃত্তিবাসের বিবরণকে

* অপূর্ণ রাখিয়া গিরিশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পঞ্চম অঙ্ক লিখিয়া পূর্ণ করিয়া দেন। তৎপরে উহা অভিনীত হয়।

নাটকাকারে পরিবর্ত্তন ও ভাষা সন্নিবেশ বিষয়ে স্বীয় প্রতিভার স্ফুরণ করিতে হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকাবলীর অভিনয় এবং অনেকবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ও মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ'-মহাকাব্যের নাটকাকারে পরিবর্ত্তনে প্রতিভাবান্ গিরিশের প্রখ্যাত লোকচিত্তহর বিবরণের নাটকাকারে পরিবর্ত্তনে বেশ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তারপর নাট্যরঙ্গ ও গীতিনাট্যগুলির রচনায় ভাষাবিন্যাসে ও বেশ দখল হইয়াছিল। সুতরাং 'রাবণবধ' হইতে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পর্য্যন্ত পৌরাণিক নাটকগুলির রচনায় তাঁহার কোনই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এইরূপে আটখানি রঙ্গনাট্য, সাতখানি গীতিনাট্য, নয়খানি পৌরাণিক নাটক এবং মধ্যে 'ব্রজবিহার' ও 'মলিনমালা' গীতিনাট্য এবং 'ভোটমঙ্গল' ব্যঙ্গনাট্য লিখিয়া জন-সমাজে সুপরিচিত গিরিশচন্দ্র নূতন ষ্টার থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইয়া নূতন ধরণের পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজি musical opera র (কেবল গীতিপূর্ণ নাটিকার) আকৃতিতে 'মলিনমালা' লিখিয়া রঙ্গালয়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জনে বিফলমনোরথ হইয়া নূতন রঙ্গালয়ে অভিনব দৃশ্যাবলী মধ্যে 'দক্ষযজ্ঞ' লিখিয়া ভয়ে ভয়ে অভিনয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও এক শ্রেণির দর্শকগণের নিতান্ত প্রীতিপদ হওয়ায়, তিনি অবিলম্বে অন্য শ্রেণীর দর্শকদিগের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য পূর্ব্বমার্গানুসারে প্রণীত 'ধ্রুব চরিত্র' তিন সপ্তাহ বাদে অভিনীত করিলেন। কিন্তু দৈনন্দিন 'দক্ষযজ্ঞের' পক্ষপাতী বাড়িতে লাগিল। ক্রমে নব সংস্কৃত নাটকাকারে গ্রথিত পুরাণের কথা সুধীবৃন্দের অধিকতর প্রীতিপ্রদ হওয়ায়, গিরিশচন্দ্র বিলাতী নাটকের ঠিক অনুকরণে 'নল দময়ন্তী' রচিত করিলেন। দৃশ্য ও অন্যান্য বিষয় তৎকালীন ইয়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের অনুকরণে হইলেও তাঁহাকে আখ্যানবস্তু পৌরাণিক রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯০ সালের ১লা পৌষ 'নলদময়ন্তী'র অভিনয় হইল। অভিনয়দর্শনে আপামর দর্শকবৃন্দ এত চমৎকৃত হইয়া গেলেন, যে উহার প্রতি-অভিনয়-রজনীতে স্থানাভাবে বহুদর্শককে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রথম যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'নলদময়ন্তী'ই সমুদায় নাট্য-সম্পৎ-পরিপূরিত। উহাতে কবিত্ব, ভাষাপরিপুষ্টি, চরিত্রবিশ্লেষণ, আখ্যানৈকাতানতা, ঘটনাবৈচিত্র, ঘাত-প্রতিঘাত, দৃশ্যপট-বিরচন-কুশলতা প্রভৃতি পরবর্তী নাটকীয় প্রয়োজনাবলির সুসমাবেশ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ মহারাজ নল, রাজ্ঞী দময়ন্তী, পুষ্কর, সুনন্দা, ঋতুপর্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র হইলেও গিরিশের হস্তে প্রোজ্জ্বল জীবন্ত চিত্ররূপে দর্শকের নিকটে সর্ব্বদা প্রতিভাত। কবির 'বিদূষক' চরিত্রটি একেবারে নিজস্ব, উহারই পূর্ণ পরিপুষ্টি 'জনা' এবং 'পাণ্ডব-গৌরবে' পরিলক্ষিতু হয়। 'নল দময়ন্তীর' পূর্ণকৃতার্থতা দর্শনে গিরিশচন্দ্র কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে 'কমলেকামিনী' নাটক বিরচিত করেন। ১২৯০ সালে, ১৭ই চৈত্র 'কমলে কামিনী' ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 'কমলেকামিনীতে' কাব্যসম্পদের

অপেক্ষা অভিনয় সম্পদের প্রাবল্য অনেক বেশী। এখানিকে Drama না বলিয়া Play বলিলে ভাল হয়। আঙ্গিক ও আহার্য্য অভিনয়ে 'কমলে কামিনী' 'নলদময়ন্তীকে'ও অতিক্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু কাব্যসম্পদে এবং বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে উহা বহু নিম্নে।

তৎপরে 'বৃষকেতু' নামক খণ্ড নাটক ও 'হীরারফুল' নামে গীতিনাট্য রচিত হয়। 'বৃষকেতু' ইংরাজী হিসাবে একখানি সুন্দর (after dramatic piece) । অঙ্গনাথ কর্ণের দানশক্তির পরীক্ষা এই খণ্ড নাট্যখানির আখ্যান বস্তু। মহাভারত অন্তর্গত ঔশনীর বৃত্তান্ত হইতে দাতাকর্ণ বিবরণ যে শিশুবোধে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাই নাটকাকারে বিবৃত হইয়াছে। কি নাট্যসম্পদে, কি চরিত্র-গ্রথনে, কি দৃশ্যসম্পদে, সর্ব্ব বিষয়ে 'বৃষকেতু' প্রশস্য। চারি বৎসর পূর্ব্বে 'লক্ষ্মণ বর্জ্জনে' যে নাট্য-রচনার স্ফুলিঙ্গ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, 'বৃষকেতু' উহার পূর্ণ দীপ্তি। 'হীরার ফুল' গীতি নাট্যখানি কবির গীতিনাট্য রচনাবিষয়িণী প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশের পরিচায়ক। 'হীরার ফুল' গীতিনাট্যে সাহিত্যোপবনে একখানি অপূর্ব্ব, চির নূতন দিব্য কাব্য-কুসুম। এরূপ গীতিনাট্য বঙ্গ সাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন গীতিনাট্য, তেমনি সাঙ্গরূপক, যেমন আখ্যান মহিমা, তেমনি কাব্য মধুরিমা—হীরারফুল' গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিনাট্য। অতঃপর গিরিশ-প্রতিভার পূর্ণ যৌবন কুসুম-বিকাশ। এই বিকাশের প্রারম্ভ 'চৈতন্য-লীলায়'। তা'রপর ক্রমে 'বুদ্ধদেব চরিত, 'বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর', 'রূপসনাতন,' নসীরাম', 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিষাদ' নামক নাটক-কুসুমগুলি পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক এক করিয়া বিকসিত হয়। 'চৈতন্য-লীলায়' যে বিশ্বজনীন প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, উহা 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'নিমাই-সন্ন্যাস' ও 'প্রভাসযজ্ঞে' পূর্ণোচ্ছ্বাসে বহিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে এক নব জীবনে উজ্জীবিত করে। অতঃপর 'বুদ্ধদেব চরিত,' 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর,' 'রূপসনাতন' ও 'নসীরাম' বাঙ্গালা থিয়েটারকে ধর্ম্ম-মন্দিরে পরিণত করিয়া দেয়। বস্তুতঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম সংস্কারকগণ বঙ্গ দেশের যে উপকার কখনও করিতে আশা করিতে পারেন নাই, এই নাটকগুলির অভিনয়ে বাঙ্গালার তদপেক্ষা অধিকতর উপকার হইয়াছে। ইহারা ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ হইতে 'মদিরা বিলাস', ধনি গৃহ হইতে 'বিলাসিনী প্রমোদ', সাধারণ লোকের চিত্ত হইতে 'নাস্তিকতা' দূর করিয়াছে এবং জনসাধারণের চিত্তকন্দরে 'ভগবদ্ ভক্তি' ধীরে ধীরে জাগাইয়া তুলিয়াছে। নাট্যসম্পদেও 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'বুদ্ধদেব চরিত' এবং 'নসীরাম' গিরিশ প্রতিভার পূর্ণ পরিপুষ্টি-জ্ঞাপক। 'বিল্বমঙ্গল', 'চিন্তামণি', 'পাগলিনী,' 'সিদ্ধার্থ,' 'গোপা', 'গৌতমী', 'রাহুল', 'নসীরাম', 'অনাথনাথ', 'বিরজা' ও 'সোণামণি'—ইহাদের প্রতি চরিত্র জীবন্ত মানুষের চিত্র। বিল্বমঙ্গলের মানসিক দ্বন্দ্ব, সিদ্ধার্থের ত্যাগ ও সাধনা এবং অনাথনাথের আন্তর বিচারণা, ইহাদের প্রত্যেকটিই মৌলিক, অথচ পূর্ণ পরিপুষ্ট নাটকীয় সৌন্দর্য্য-সুধাবিলসিত। 'গোপা' ও 'বিরজা'

এক ছাঁচে তোলা, অথচ দুই রকমের দুইটি বিচিত্র আর্য্যাঙ্গনা। 'পাগলিনী'তে যার আরম্ভ, 'নসীরামে' তাহার পরিপুষ্টি, শেষে কালাপাহাড়ের 'চিন্তামণি'তে উহার পরিসমাপ্তি। এই তিন চরিত্রে কবি তাঁহার গুরুদেবকে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ হিন্দু সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ কিরূপ হইবে, তাহা এই তিন চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই যুগের 'পূর্ণচন্দ্র' কবির নব-বিষয়-সঞ্চারিণী প্রতিভার প্রথম বিকাশ, ভাব-প্রধান (romantic) নাটক রচনার প্রথম সৃষ্টি। এখানে কবিবরকে ভয়ে ভয়ে দীনবন্ধুর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক আমাদের চির প্রচলিত 'বিজয় বসন্তের' অপর সংস্করণ মাত্র। 'রাজা রাসালু' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে কবিবর এই নাটকখানি রচনা করেন। ইহার 'দামোদর', 'সুন্দরা' ও 'তাহার সখী'র চরিত্র দীনবন্ধুর অনুকরণে লিখিত হইলেও কবির মৌলিকত্ব অনেক আছে। 'পূর্ণচন্দ্রে' পূর্ণ-কৃতার্থতা লাভ করিয়া কবি তাঁহার কল্পনা রাজ্যের সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্টতম সরঞ্জামে 'বিষাদ' নাটক নির্ম্মিত করেন। 'বিষাদ' গিরিশ-প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশ, কাব্যকাননের পারিজাত, নাট্যসরোবরের শতদল। উহার 'সরস্বতী', 'অলর্ক', 'মাধব', ও 'উজ্জ্বলা' চরিত্র শুধু বঙ্গ সাহিত্য নহে, জগতের নাট্য সাহিত্যাঙ্কিত চরিত্রমালার মধ্যমণি। 'বিল্বমঙ্গল', 'রূপ সনাতন' ও 'বিষাদ' নাটকের আখ্যান-বস্তু কবিবর 'ভক্তমাল' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্য হইতে আহরণ করিয়াছেন বটে। কিন্তু মহাভারতীয় আখ্যান ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' যেরূপ প্রভেদ, ভক্তমাল-বিবৃত আখ্যান ও এই সব নাটকে ততোধিক বৈলক্ষণ্য। ইহার পরই কবিবর আবার নূতন ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচালনা করিলেন, সামাজিক নাটক প্রণয়নে মনোহভিনিবেশ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে অভিনীত দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকগুলিতে কেবল একশ্রেণীর সামাজিক দোষগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাদের পূর্ব্বে ও পশ্চাৎ অভিনীত উমেশচন্দ্রের 'বিধবা বিবাহ', রামনারায়ণের 'নব নাটক', মনোমোহনের 'প্রণয় পরীক্ষা,' উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', শিশিরকুমারের 'নয়শো রূপেয়া' প্রভৃতিতে নাট্যসৌন্দর্য্যের অনেক অভাব। এই সব দেখিয়া কবিবর নিতান্ত দুঃসাহসে 'প্রফুল্ল' প্রণয়ন করিলেন। প্রফুল্লের 'যোগেশ', 'রমেশ', 'সুরেশ', 'উমাসুন্দরী', 'জ্ঞানদা', প্রফুল্ল', 'পীতাম্বর' প্রভৃতি চরিত্র কলকাতার জীবন্ত চিত্র। বস্তুতঃ গিরিশ বাবু একটী প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনেই প্রফুল্ল রচনা করেন। উহাতে আখ্যাত 'মদনদাদা' চরিত্র দীনবন্ধুর 'রাজীব লোচনের' পুনঃসংস্কার হইলেও, নূতনত্ব অনেক আছে। গিরিশচন্দ্রের 'কাঙ্গালী চরণ' ও 'জগমণি' চরিত্র পূর্ব্বের ছায়া হইলেও উহা একযোড়া অভিনব দৃশ্য চিত্র। ফলতঃ প্রফুল্ল নাটকে স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকতা ও ঘটনার অতিরঞ্জন থাকিলেও, উহা ঘটনাবৈচিত্রে একখানি অতি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী সামাজিক নাটক। যোগেশের মুখে উচ্চারিত 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' চিরদিন বাঙ্গালার সুরস-সাহিত্যে সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। প্রফুল্লের কৃতকার্য্যতায় আবার ছয় মাস যাইতে না যাইতেই 'হারানিধি'

প্রণীত হইল। হারানিধির আখ্যানবস্তু গিরিশচন্দ্রের কতকগুলি প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনা হইতে আহৃত। হারানিধির 'অঘোর' বাস্তবিক হারানিধিই বটে। প্রফুল্ল বিয়োগান্ত, কিন্তু হারানিধি 'মিলনান্ত', সুতরাং হারানিধির অভিনয়ে 'প্রফুল্লে'র ন্যায় দর্শকবৃন্দের তাদৃশ মনোমাদনা ঘটে নাই। কিন্তু নাটকীয় সম্পদে 'হারানিধি' প্রফুল্ল হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। এই নাটকের 'মোহিনীমোহন', 'হরিশ', 'সুশীলা', 'নব'* 'কাদম্বিনী,' নীলমাধব', 'হেমাঙ্গিনী' ও 'অঘোর' চরিত্র ঠিক বাঙ্গালী চরিত্রই হইয়াছে। কোথায়ও বিসংবাদ বা অসামঞ্জস্য নাই। তবে নাটকীয় কার্য্য বিষয়ে (denouement) 'প্রফুল্লে'র স্থান অনেক উচ্চে। ইহার পর গিরিশ-প্রতিভা ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়নে পরিচালিত হয়। প্রায় এক বৎসর অন্তে তাঁহার 'চণ্ড' অভিনীত হয়। এই 'চণ্ড' নাটকে পশ্চাৎ 'সিরাজদৌল্লা' প্রভৃতিতে প্রকটিত গিরিশ-প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ গিরিশকৃত ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'চণ্ডের' স্থান বিশেষ কিছুই নাই। 'চণ্ড' ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের হাতে খড়ির জ্ঞাপক মাত্র। তাহা তিনি নিজেও বেশ জানিতেন, কেননা একমাস যাইতে না যাইতেই তাহাকে 'মলিনা বিকাশ' নামক নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দকে তৃপ্ত করিতে হইয়াছিল। 'মলিনা বিকাশ' গীতিনাট্য সম্পদে 'হীরার ফুলের' নিম্নেই প্রতিষ্ঠাপ্য। ইহার আখ্যানবস্তু, সঙ্গীত ও দৃশ্যগুলি বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর, বড়ই কবিতাময়, বড়ই চিত্তহর। কিন্তু নাট্যসম্পদে 'হীরার ফুল' অনেক উচ্চে। অতঃপর বড়দিনের 'মহাপূজা' সাঙ্গরূপক অভিনীত হয়। এই 'মহাপূজা'ই পশ্চাৎ পাঁচ বৎসর পরে বিরচিত 'স্বপ্নের ফুলে'র অধিবাস। এই সাঙ্গরূপক প্রণয়নে গিরিশ নাট্য জীবনের প্রথম যুগের অন্ত।

আমরা এই যুগের সমালোচনায় গিরিশ প্রতিভার গীতিনাট্যে ও ভাব-প্রধান নাটকে পূর্ণোন্মেষ এবং ঐতিহাসিক নাটকে ও সাঙ্গরূপকে ছায়ারাজি মধ্যে অস্পষ্ট আলোকরেখা-সম্পাত দেখিতে পাই। আমাদের বঙ্গসমাজ সামাজিক নাটকের আখ্যান-বস্তু প্রদানে ইংরেজসমাজের ন্যায় বিশ্বতোমুখ নহে, সুতরাং 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি'র পরে গিরিশচন্দ্র অনেক দিন সামাজিক নাটক প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েন নাই।

নব প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভায় গিরিশ নাট্যজীবনের দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভ। এ যুগে তিনি সেক্‌স্‌পীয়র, মোলিয়র, রেসিনি, লর্ড লিটন প্রভৃতি প্রতীচ্য মনীষিগণের প্রতিভা স্বদেশে প্রস্ফুটিত করিয়া, বঙ্গনাট্যসাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হন। বহু আয়াসে তিনি কবিকুলচূড়ামণি সেক্‌স্‌পীয়রের অনুপম নাটক 'ম্যাক্‌বেথের' বঙ্গানুবাদ করিয়া সুবিখ্যাত উইলার্ড সাহেব দ্বারা দৃশ্যপট অঙ্কিত করাইয়া, গিলসাহেব দ্বারা সাজসজ্জা ঠিক করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর সমক্ষে প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ বিদেশীয় সাহিত্য রত্নভাণ্ডারের একখানি অমূল্য রত্ন উপস্থাপিত করেন। যাঁহারা পূর্ব্বে

---

* Mr. ডি. এস্. রায় এই 'নব' চরিত্রের ছায়ায়ই তাহার 'বঙ্গনারীর' কেদার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজীতে অভিনীত 'হ্যামলেট্', 'জুলিয়াস্-সিজার', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গভাষায় গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাক্‌বেথের' অভিনয় দেখিয়া এত মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, যে সকলেই এক বাক্যে তাঁহাকে বাঙ্গালার গ্যারিক আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি লেডি ম্যাক্‌বেথ, ম্যাগডাফ প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিকাগুলি এমন সুন্দররূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে কলিকাতায় তখন করিষ্থিয়ান থিয়েটারে অভিনীত আমেরিকার মিলেনার কোম্পানীর 'ম্যাক্‌বেথের' অভিনয়, মিনার্ভার অভিনয়ের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয় নাই, ইহা কি সাহেব কি বাঙ্গালী সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন। তবে গিরিশচন্দ্র কালের অনেক অগ্রবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'ম্যাক্‌বেথের' নাট্য-সৌন্দর্য্য সাধারণ দর্শকবৃন্দ কিছুই উপভোগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে মিনার্ভার 'মিসর-কুমারী' ও 'কিন্নরী'র অভিনয়ের আপামর জনসাধারণের কি পূর্ণহৃদয়ের সমাদর! 'কিন্তু তখন বঙ্গবাসী বিদেশীয় আখ্যানবস্তু ও আচরণ বুঝিতে পারিত না, চেষ্টাও করিত না। তাই আমরা গিরিশের ভাষান্তরিত সেক্‌স্‌পীয়রের অন্য নাট্যরত্নগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। 'ম্যাক্‌বেথ' সাধারণের রুচিকর হইল না দেখিয়া অমনি তিনি লর্ড লিটনের ছায়াবলম্বনে রচিত 'মুকুলমুঞ্জরা' অভিনীত করিলেন। এবার আবার গিরিশের নাটকের 'জয় জয় কার' হইল, কেননা ইংরাজী আখ্যানবস্তু গ্রহণে অক্ষম হইলেও, চিত্তচমকপ্রদ মনোহর বিলাতি ভাব সকলেরই মনের মতন। ক্রমে ইংরাজী গীতিনাট্যের অনুকরণে পূর্ব্ব লিখিত 'আবুহোসেন', তৎপরে মোলিয়র ও রেসিনীর ছায়ায় চিত্রিত 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন', 'বড়দিনের বক্‌সিস্,' 'সভ্যতার পাণ্ডা', প্রভৃতি রঙ্গনাট্য অভিনীত হইতে লাগিল, আর দর্শকবৃন্দ অজ্ঞাতসারে উন্নীত ইউরোপীয় নাট্যাভিনয়ে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন আর পৌরাণিক কিংবা ভাব-প্রধান দেশীয় নাটকে লোকের তৃপ্তি হইত না, কেননা সন্দেশ পাইলে আর কেহ চিনি খাইতে চায় না। এই সময়ে তিনি কাশীদাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বান্তর্গত 'জনা' আখ্যায়িকা গ্রহণে অভিনব সুমার্জ্জিত বিলাতীভাবপূর্ণ 'জনা' নাটক অভিনীত করিলেন। জনার অনেক উপাদান মাইকেলের বীরাঙ্গনাকাব্যের অন্তর্গত 'জনার পত্র' তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত সেক্‌সপীয়রের 'তৃতীয় রিচার্ডের' মার্গারেট চরিত্র ও 'চতুর্থ হেনরি' নাটকের ফলষ্টাফ চরিত্র জনার দুই প্রধান চরিত্রের ছায়া স্বরূপ গিরিশ প্রতিভাকে চালাইয়া লইয়াছিল। জনার অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যত সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে আর ঘটে নাই। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সর্ব্ববিধ দর্শকই জনার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের অধিকারীগণও দীর্ঘকাল প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ 'ম্যাক্‌বেথের' অকৃতার্থতাই জনায় গিরিশ-প্রতিভার অভূতপূর্ব্ব কৃতার্থতার হেতু হইল। অতঃপর তিনি দুই বৎসর পরে 'ভক্ত-মাল' গ্রন্থ হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া 'করমেতি

বাই' নাটক বিরচিত করিয়া অভিনয় করেন। 'করমেতি'তে চৈতন্যের অবাধ প্রেম, বিল্বমঙ্গলের প্রাণপণ কৃষ্ণান্বেষণ ও রূপসনাতনের কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপীয় নাটকের ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। জীবন্ত 'মীরাবাই' করমেতিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অধিকন্তু ইয়ুরোপীয় দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ ও দৃষ্টি-বিভ্রমকারী আলোরেখাপাত 'করমেতি'র দর্শকগণের প্রাণের ভিতর অপূর্ব্ব তানময় স্বপ্নসঙ্গীতের ন্যায় বাজিয়া উঠিল। ফলতঃ রঙ্গালয় লোকারণ্য হইয়া পড়িল। অতঃপর গিরিশবাবু ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া 'পুরাতনের গোঁড়াদের' মধ্যে মিনার্ভার বিজাতীয় ভাব বজায় রাখিতে পারিলেন না। এখানে অভিনীত তাঁহার প্রথম দার্শনিক নাটক 'কালাপাহাড়' তাহার পশ্চাৎ পরিপক্ক ও সর্ব্বনাট্যালঙ্কার-পরিপুষ্ট 'শঙ্করাচার্য্যে'র অধিবাস মাত্র। এ নাটকে যে সব দার্শনিক প্রশ্নের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, 'শঙ্করাচার্য্যে' তিনি উহাদের উত্তর দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'কালাপাহাড়' না নাটক হিসাবে, না দর্শন হিসাবে বিশেষ আদরের জিনিষ। তবে এখানে গিরিশচন্দ্রের ভাষাগত সম্পূর্ণতা পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কালাপাহাড়ের অকৃতার্থতায় 'পারস্যপ্রসুন' নামক গীতিনাট্য রচিত ও অভিনীত হয়। 'পারস্যপ্রসূনে' গিরিশ প্রতিভার বিশেষ দীপ্তি কিছুই লক্ষিত হয় না। তৎপরে গিরিশচন্দ্র 'মায়াবসান' নামক বিজ্ঞান-মূলক নাটক অভিনীত করেন। 'মায়াবসান' ও 'কালাপাহাড়ে'র ন্যায় পাণ্ডিত্য-পরিপূর্ণ, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে বা অভিনেয় দৃশ্যকাব্য হিসাবে ইহার বিশেষ কিছু মূল্য নাই। আমাদের মনে হয় আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পরীক্ষার জন্যই গিরিশচন্দ্র এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ক্লাসিক থিয়েটারে গিয়া 'পাণ্ডব-গৌরব' নামে দণ্ডিপর্ব্ব হইতে আখ্যানবস্তু সংগ্রহ পূর্ব্বক নূতন নাটক প্রণয়ন করেন। 'পাণ্ডব-গৌরব' বিয়োগান্ত 'জনার' সংযোগান্ত পুনঃসংস্কার। গিরিশচন্দ্র যে 'ট্রাজেডি' ও 'কমেডি' উভয় প্রণয়নে তুল্য ক্ষমতাশালী তাহা 'জনা' ও 'পাণ্ডব-গৌরব', 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধিতে' আমরা বেশ দেখিতে পাই। অতঃপর গিরিশচন্দ্র একখানি নূতন ধর্ম্ম-মূলক নাটক, 'সৎনাম' প্রণয়ন করেন। 'সৎনাম' একখানি সাধারণ নাটক মাত্র। উহা বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে বিশ্রামকালের লিখিত 'ফণিরমণি' প্রভৃতির ন্যায় থিয়েটার রাখার একখানি নাটক। ক্লাসিকে প্রদত্ত 'ভ্রান্তিও' 'কালাপাহাড়' ও 'মায়াবসান' সংমিশ্রিত একটি পাঁচন। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে অবস্থানকালে 'পাণ্ডব-গৌরব' ব্যতীত আর কোনও উল্লেখযোগ্য নাটক প্রণয়ন করেন নাই, ষ্টার থিয়েটারে রচিত 'মায়াবসানে'ই একরূপ দ্বিতীয় যুগ অবসান হইয়াছে।*

---

* ফলত ঃ গিরিশ-নাট্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বঙ্গরঙ্গালয়ে ইয়ুরোপীয় নাট্যকলার অনুপ্রবেশনে বঙ্গ নাট্যাবলী ও রঙ্গালয়ের অপ্রত্যাশিতরূপ অভ্যুন্নতিই প্রধান লক্ষণ। উহার প্রারম্ভ 'ম্যাক্‌বেথে,' অবসান 'পাণ্ডবগৌরবে।' একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই জানা যায় যে, 'জনা', 'করমেতিবাই',

১৩১১ সাল হইতে গিরিশ নাট্য জীবনের তৃতীয় যুগের আরম্ভ। এই যুগই গিরিশ প্রতিভা স্ফুরণের চরম যুগ। এই যুগের বিশেষ লক্ষণ, গিরিশচন্দ্রের অমর ঐতিহাসিক নাটকত্রয়ের প্রকাশ। এই যুগের আরম্ভ 'বলিদানে', সমাপ্তি 'তপোবলে'। ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' এমন কি অসমাপ্ত 'গৃহলক্ষ্মী' ইহারা প্রত্যেকে বঙ্গীয় সামাজিক নাট্য-সাহিত্য-মন্দিরের এক একটি অক্ষয় হীরক স্তম্ভ। বলিদানের তুল্য বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত নাটক বা উপন্যাস, এমন কি প্রবন্ধ, আজি পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। প্রতি দরিদ্র হিন্দু কন্যার পিতা-দ্বারা করুণাময়-চরিত্র প্রতিদিন নির্ম্মম বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের বক্ষের উপর অভিনীত হইতেছে। বলিদানের 'জবী' 'রেমোমামা', 'মোহিত', বাঙ্গালায় প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রফুল্ল ও হারানিধিতে কবিবর নানা কারণে প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শেষের তিনখানি নাটকে প্রতিচ্ছত্রে কবির প্রাণের মর্ম্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই বলি 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' ও 'গৃহলক্ষ্মীতে' নাট্যসম্পদের পূর্ণতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক সাহিত্য-হিসাবে ইহারা চিরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের কেন্দ্রস্থানে অবস্থান করিবে। তারপর 'সিরাজদৌল্লা', 'মিরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' সম্বন্ধে অধিক কিছু বক্তব্য নাই। ইহারা নব ভারত ইতিহাসের তিনটি উজ্জ্বলতম উচ্ছ্বাস রূপে চিরদিন ঐতিহাসিক মাত্রেরই পূজার ও উপাসনার সামগ্রী হইয়া থাকিবে। নাটকীয় চরিত্রবিশ্লেষণ ও কাব্যাংশেও ইহাদের স্থান সেক্‌স্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকের সমকক্ষ। কেবল এই তিনখানি ঐতিহাসিক নাটকই পৃথিবীর নাট্যকার-সম্প্রদায়ে গিরিশচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে সংরক্ষিত করিবে। এই যুগের 'হরগৌরী' আর একখানি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের ইয়ুরোপীয় ছাঁচে প্রদর্শনের বিফল প্রয়াসের নিদর্শন। কুম্ভকারের সকল হাঁড়ীগুলিই মনোমত হয় না। 'বাসর' খানি 'ফণিরমণি' ও 'মণি-হরণ' শ্রেণীর গীতিনাট্য। ম্যাক্‌বেথের অকৃত-কার্য্যতা 'য্যায়সা কা ত্যায়সায়' পূর্ণফল প্রদান করিয়াছে। স্থান, কাল ও পাত্রের একত্র যোটকতার ভাবাভাবের এমনই ফলাফল! গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' বহু প্রত্ন-তত্ত্বের ফলে রচিত হইলেও নাটকরূপে আদৌ বিকশিত হয় নাই। উহাতে ইয়ুরোপীয় ভাবগুলি জগাখিচুরি পাকাইয়াছে মাত্র। কিন্তু 'শঙ্করাচার্য্য' ও

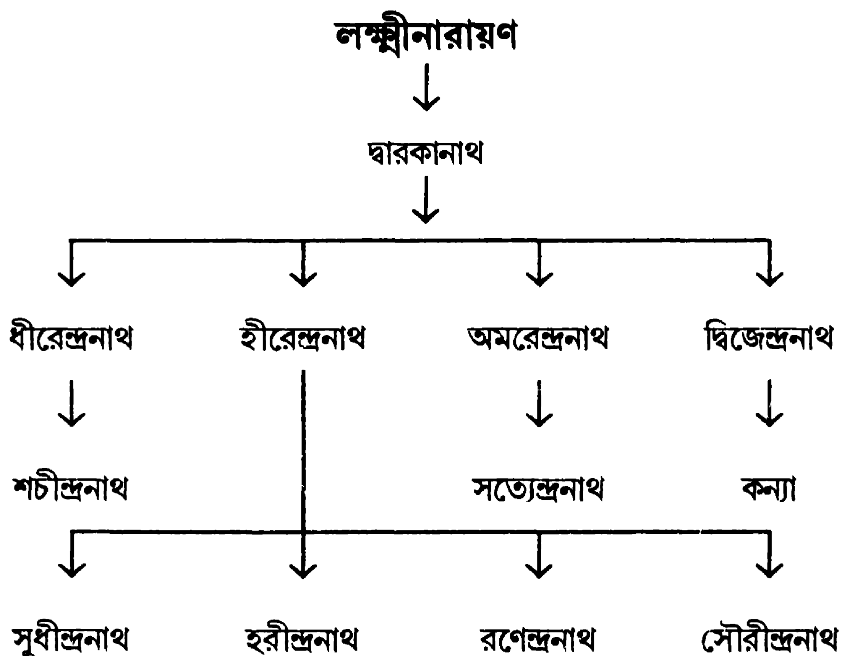
'কালাপাহাড়', 'মায়াবসান' ও 'পাণ্ডবগৌরব' বঙ্গনাট্যোপবনে বিকসিত ইয়ুরোপীয় কুসুম নিকর। কিন্তু যেমন দীনবন্ধু ও উপেন্দ্রনাথের নাটকাবলীতে ইয়ুরোপীয় comedy পরিস্ফুট, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেরূপ অর্দ্ধজীর্ণ ভাব নাই। গিরিশচন্দ্র ইয়ুরোপীয় ভাবগুলি বেশ দেশীয় ঘটনাবলীতে সুন্দররূপে মিশাইয়া দেশীয় ভাষায় দেশীয় জনসাধারণের মানসিক অনুশীলনের অনুরূপ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। করমেতির যোয়ানাবার্ক ভাবটি বলিয়া না দিলে ধরা বড় শক্ত। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠ ডি, এল, রায় মহাশয়ের সাজাহানে সকলেই King Lear দেখিতে পান, দীনবন্ধুতে Love's Labour Lost, Much Ado About Nothing Taming. Of The Shrew প্রভৃতি ইংরাজী নাটক পাঠকমাত্রেই দেখিতে পান।

'তপোবল' গিরিশ প্রতিভার চরম যুগের অমর নিদর্শন। প্রকৃত নাট্যকার যে একজন কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তাহা গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বিষাদে', 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবলে' এবং 'সিরাজদ্দৌলা' 'মিরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজীতে' পূর্ণ প্রদর্শিত হইয়াছে। গিরিশনাট্যের চরিত্রগুলির আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহারা এক অপূর্ব্ব অননুকরণীয়, অথচ স্বভাব-প্রসূত চিত্র। ১২৮০ সাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ বৎসরকাল গিরিশচন্দ্র বঙ্গীয় রঙ্গালয় ও নাট্যকলার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ বঙ্গীয় নাট্য সমাজ জগতের নাট্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, বঙ্গীয় নাটক সর্ব্বত্র সভ্যসমাজে সুপরিচিত এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থানও জগৎ সাহিত্যে হেয় নহে। আর কিছুর জন্য না হইলেও শুদ্ধ এই কারণে গিরিশচন্দ্র বঙ্গবাসীর চির নমস্য এবং শ্রদ্ধা কুসুমে ও ভক্তি চন্দনে পূজনীয়।

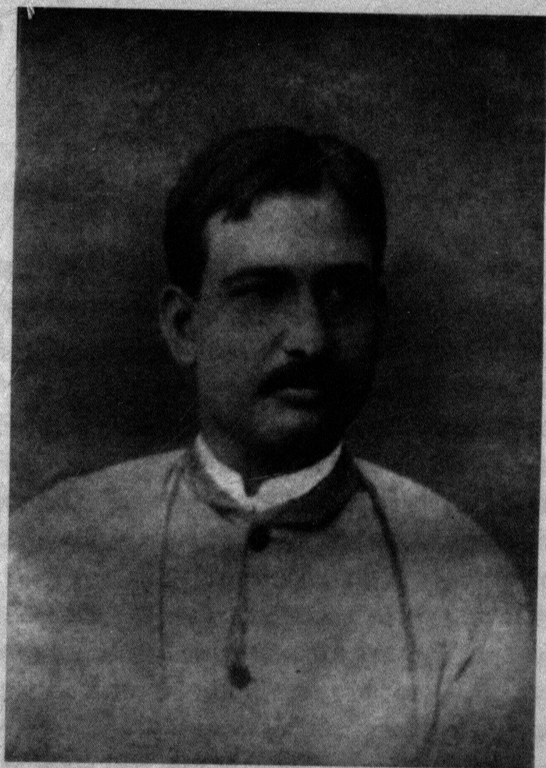
সমাপ্ত

অমরেন্দ্রনাথ

বংশ-বিন্যাস



লক্ষ্মীনারায়ণ
দ্বারকানাথ
ধীরেন্দ্রনাথ
হীরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ
দ্বিজেন্দ্রনাথ
শচীন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনাথ
কন্যা
সুধীন্দ্রনাথ
হরীন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
সৌরীন্দ্রনাথ



অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম উল্লাস

শৈশব ও কৈশোর

আমরা অদ্য যাঁহার জীবনী লিখিতেছি, তাঁহার নামের সহিত বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক লোকই পরিচিত। সময় সময় এমন এক একটী লোক জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা সৌভাগ্যবলে নিজেই তাঁহাদের কর্মজীবনের সার্থকতা অনুভব করিয়া যাইতে সমর্থ হয়েন। অমরেন্দ্রনাথও সেই শ্রেণীর একজন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল বাগবাজারে মাতুলালয়ে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। জননীর জঠর হইতে যে দিন অমরেন্দ্রনাথ প্রথম ধরার আলো দেখিতে পান সে দিন কে ভাবিয়াছিল যে একদিন এই শিশুর নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইবে। যিনি একদিনের জন্যও থিয়েটার দেখিয়াছেন, এমন কি যিনি শুধু থিয়েটারের নামটুকু মাত্র শুনিয়াছেন, তিনিও জানেন অমরেন্দ্রনাথ কে। বঙ্গ নাট্যশালার জন্য অমরেন্দ্রনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ভবিষ্যতেও যাঁহারা বঙ্গ-রঙ্গশালার অতীত ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা কেবলমাত্র একবার উল্‌টাইবেন, তাঁহারাও দেখিবেন তথায় অমরেন্দ্রনাথের নাম গগনপৃষ্ঠে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অনশ্বর সুবর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া দিব্য প্রতিভালোকে পূর্ণপ্রদীপ্ত। ভগবানের করুণা ব্যতীত মানুষের কীর্তি চিরদিনের মত বিশ্বের বুকের উপর অঙ্কিত হইয়া থাকে না। একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অমরেন্দ্রনাথের উপর ভগবানের বিশেষ করুণা ছিল, তাই অমরেন্দ্রনাথের নাম বিশ্বের বুকের উপর এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যতদিন বঙ্গনাট্যশালার অস্তিত্ব লুপ্ত না হইবে, যতদিন বঙ্গনাট্যশালাকে সহৃদয় সাহিত্যসেবীগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন, ততদিন অমরেন্দ্রনাথের নাম বঙ্গবাসী কখনও ভুলিবেন না।

মাতুলালয়ে অমরেন্দ্রনাথ যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সে দিন বাগবাজারের বোসেদের বাটীতে দীনবন্ধুবাবুর সধবার একাদশীর অভিনয় হইয়াছিল। গৃহে কেহই নিরানন্দ ছিলেন না। আমরা শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মুখে শুনিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট প্রায়ই বলিতেন, 'বাড়ী শুদ্ধ সবাই সধবার একাদশীর

অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ সেই সময়ে আমার মাতৃদেবীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। ঠিক যে সময় অভিনয় আরম্ভ হয় সেই সময়ই আমার জন্ম হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমার জন্ম থিয়েটার লগ্নে, আমি থিয়েটার করিব না তো থিয়েটার করিবে কে?'

গোলগাল ফুটফুটে ছেলেটীকে দেখিবামাত্রই মাতুলালয়ে সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "আহা! ছেলেটি যেন আকাশের পূর্ণচন্দ্র ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছে।" সত্যই অমরেন্দ্রনাথ যে দিন ভূমিষ্ঠ হন সে দিন তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে যেন একটা মধুর লাবণ্যধারা 'ঠিকরাইয়া' পড়িতেছিল।

অমরেন্দ্রনাথের পিতার নাম শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত। দ্বারকা বাবু রেলির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম ধীরেন্দ্রনাথ, মধ্যম হীরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় অমরেন্দ্রনাথ, চতুর্থ বিজয়েন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্রনাথের বাল্য জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তিনি সে সম্বন্ধে নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীতে তখন প্রায়ই শখের যাত্রা হইত। আমি নিবিষ্ট মনে যাত্রা শুনিতাম। যাত্রার ভীম, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি মহারথিগণের অভিনয় ও অঙ্গ ভঙ্গী একাগ্র চিত্তে নিরীক্ষণ করিতাম। দেখিতে দেখিতে মনে ভাবিতাম কি সুন্দর! উপভোগ করিবার এমন মনোহর সামগ্রী বিশ্ব সংসারে আর কিছুই নাই! এইরূপ একদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে।

সেদিন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পালা হইতেছিল। আমি তখন আমার পিতার পার্শ্বে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিলাম। ক্রমে সেই দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে উঠিল না। আমি আর তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চীৎকার করিয়া পিতাব উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'বাবা, বাবা, ইহাকে রক্ষা করুন।'

এই দিনের যাত্রার অভিনয় আমার অন্তরের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাত্রার নায়কদের অনুকরণে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার বাসনা আমার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে আছে পূজার ভাসানের দিন মার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া লইয়া আমার নিজের জন্য ও বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের জন্য বাঁকারির তীর ধনুক কিনিতাম; উহা হইতে একখানি নিজে লইতাম ও বাকিগুলি তাহাদের দিতাম। তারপর তাহাদের সকলকে লইয়া যাত্রার অনুকরণে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধের অভিনয় করিতাম। এই প্রকার যুদ্ধ ক্রীড়ায় একদিন বড়ই প্রমাদ ঘটিয়াছিল। আমার ধুনকের তীর একটা বালকের চক্ষুর একটু উপরে ললাটে গিয়া বিঁধিয়াছিল, আহত স্থান হইতে দরদর ধারে রক্তস্রোত ছুটিয়াছিল, তাহার ফলে মা আমাকে এমন প্রহার দিয়াছিলেন যে, তাহার বেদনা আমাকে বহুদিন পর্য্যন্ত অনুভব করিতে হইয়াছিল।"

বালক ভবিষ্যতে কি হইবে অতি শৈশবে হইতই তাহার সূচনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে এমন অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা বড় বড় সেনাপতি হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাল্যজীবনে যুদ্ধ ক্রীড়ার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। মহাবীর নেপলিয়ান সম্বন্ধেও এরূপ অনেক জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, যাঁহার দেখিবার ক্ষমতা আছে তিনি যদি একটু বিশেষ ভাবে কোন শিশুর ক্রমশঃ বর্দ্ধমান জীবনী পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা হইলে তিনি সেই শিশু বড় হইলে কি হইবে অনায়াসেই ভবিষ্যৎ বাণী প্রদান করিতে পারেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যজীবনের যেটুকু আভাস দিয়াছেন সেইটুকু হইতেই আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিস্ফুট চিত্র অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি?

অমরেন্দ্রনাথ ক্রমে দিন দিন মাতা, পিতা ও আত্মীয় স্বজনের আদর যত্নে বড় হইয়া উঠিতে লাগিলে। যথা সময়ে তাঁহার হাতে খড়ি হইল। তখন তিনি তাঁহাদের আদি বাড়ী চোরবাগানে ছিলেন। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি চোরবাগানের সুবখ্যিাত দত্ত-বংশে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দ্বারকাবাবু রেলির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চোরবাগানের পুরাতন বাটীতে পুত্র কন্যা লইয়া থাকিতে ননারূপ অসুবিধা হওয়ায় তিনি হাতীবাগানে জমী ক্রয় করিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও তৎপরে সপরিবারে আসিয়া হাতীবাগানের এই নূতন বাটীতে বসবাস করেন। অমরেন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হইবার কিছুদিন পরেই দ্বারকানাথ বাবু নূতন বাটীতে চলিয়া আসেন। এই বাটীর পশ্চাৎভাগে এখটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর তখন কটন ইন্‌ষ্টিটিউসন ছিল। অমরেন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু বলিয়াই দ্বারকা বাবু এই স্কুলে সর্ব্বপ্রথম অমরেন্দ্রনাথকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে কি হইবে, স্কুল-পাঠ্য কোন পুস্তকেই তাঁহার মন বসিত না। একটু সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গ ডাকিয়া লইয়া নানারূপ যাত্রার অভিনয় করিতেন। এই সম্বন্ধে স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম.—

***ক্রমে পড়াশুনার বয়স আসিল,—স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়াশুনা চলিতে লাগিল। আমার আগ্রহ কিন্তু ঐ সকল নাটকীয় খেলাধূলার দিকে। সেই যাত্রার ভীম ও দুর্য্যোধনের অনুকরণে বীররসাত্মক আস্ফালন আমার বাল্য জীবনের খেলাধূলার অকৃত্রিম নিদর্শন। অন্য কোন প্রকার খেলার দিকে আমার আদৌ আগ্রহ ছিল না। অবসর কালে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের পড়া শুনার দিকে মন যাইত না। কিন্তু যদি নাটক পাইতাম, আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করিতাম এবং পাছে কেহ তাহা জানিতে পারিয়া তিরস্কার করে এই আশঙ্কায় ত্রিতলে ছাদের উপর গিয়া গোপনে তাহা পাঠ করিতাম। জলপানির পয়সা বাঁচাইয়া কেবল নাটক কিনিতাম ও এইভাবে তাহা পাঠ করিতাম।

ইহার পর হাতীবাগানে আমাদের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইল। আমরা নূতন বাটীতে আসিলাম। বাটীর অনতিদূরে ষ্টার থিয়েটারের নূতন বাটী তখন প্রস্তুত হইতেছিল।

স্কুলের ছুটী হইলে বাটী আসিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়াই আমি গোপনে এই বাটীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতাম। প্রগাঢ় আগ্রহ সহকারে উক্ত থিয়েটার বাটী দেখিতাম—দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম,—কত কি ভাবিতাম। তখন আমার মনে হইত এই বাটীর সহিত যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের—যুগ-যুগান্তরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। যখনই আমি ফাঁক পাইতাম, তখনই এই বাটীর নিকট পলাইয়া আসিতাম ও কত কি ভাবিতাম।

ইঁহার অল্প দিন পরেই আমাদের চোরবাগানের বাটীতে একটী উৎসব উপলক্ষে "বেঙ্গল থিয়েটার" অভিনয়ার্থ আহূত হয়। আমরা সকলেই সেখানে গিয়াছিলাম। অভিনয়ের পালা ছিল—"দুর্ব্বাসার পারণ" ও "স্বাধীন জেনানা"। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও থিয়েটার দেখি নাই। মনে আছে যোগীন্দ্রনাথ ঘটক ভীম, মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদূষক, গণেশচন্দ্র ঘোষ দুর্য্যোধন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নেদারু গিরিশ) শকুনি, বর্ত্তমান বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারীর মাতা সাজিয়াছিলেন—দ্রৌপদী, কালীকিঙ্কর মল্লিক—যুধিষ্ঠির ও চিত্ররথ, বেঙ্গল থিয়েটারের লেখক ও বিজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যক্ষ কুঞ্জবিহারী বসু দুর্ব্বাসার শিষ্য সাজিয়াছিলেন। শিষ্যরূপী কুঞ্জবিহারীর রসিকতা এখনও আমার স্মরণ আছে। একটা দৃশ্যে শিষ্য দুইটী বাহির হইলেন,—প্রথম শিষ্যটী বলিলেন, "ঠাকুরটীর সবই উল্টো।"

দ্বিতীয় শিষ্য (কুঞ্জবাবু) উত্তর দিলেন, "পা টা শুদ্ধ।"

সেই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন। সে অভিনয় আমার কত মনোরম লাগিয়াছিল! —যেন এখনও আমার চক্ষুর উপর বিরাজমান রহিয়াছে। যে সকল অভিনেতৃদের নাম করিলাম, ইহাঁরা সকলেই তখনকার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

"দুর্ব্বাসার পারণ" অভিনয় দেখিবার পর হইতেই, উক্ত নাটকখানি পড়িবার ইচ্ছা আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিল। আমার বয়স তখন ১৩ বৎসরের মধ্যে। আমি তখন মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে পড়িতেছিলাম। একদিন স্কুল হইতে ফিরিবার সময় গাড়ী থামাইয়া গুরুদাস বাবুর দোকানের ভিতর ঢুকিয়া উক্ত নাটকখানির কত মূল্য তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম উক্ত পুস্তকখানা স্বতন্ত্র পাওয়া যায় না। উহা রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। যে খণ্ডে ঐ গ্রন্থখানি আছে সেই খণ্ডের মূল্য দুই টাকা। সেই সময় দুইটী টাকা একত্রে সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ আমাদের হাতে যাহাতে পয়সা কড়ি না পড়ে সেদিকে পিতার ও মেজদাদার (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং মেজদাদার শাসনও অত্যন্ত কঠোর ছিল। দৈনিক চারিটি পয়সা করিয়া আমার হাত খরচের জন্য বরাদ্দ ছিল। তাহাতে চানাচুরই খাও আর জীবে গজাই খাও, কারণ এই দুইটী জিনিস সে সময় আমার অত্যন্ত মুখরোচক ছিল।

দুই টাকার কমে পুস্তক পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়ই বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কেমন করিয়া দুইটী টাকা সংগ্রহ করিব—সেই চিন্তারয় অধীর হইলাম। বহুক্ষণ চিন্তার পর একটী উপায়ও স্থির হইল। আমার মাতাঠাকুরাণীর বিছানার নীচে টাকা কড়ি গুজিয়া রাখা অভ্যাস ছিল। বাজার করিয়া বা নোট ভাঙ্গাইয়া ভৃত্যেরা যে টাকা তাঁহার হাতে ফেরত দিত, তিনি অমনি তাহা বাক্স পেটরায় না রাখিয়া বিছানায় তোষকের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া দিতেন। আমি তাহা জানিতাম, সময়ে সময়ে লক্ষ্যও করিতাম। চিন্তার ফলে এই উপায়টী এক্ষণে আমার মনে উদিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ মাতার বিছানা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিছানার তলদেশ হইতে পাঁচটী টাকা খুঁজিয়া পাইলাম। আমি সেই টাকা হইতে দুইটী টাকা লইয়া অতি সন্তর্পণে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরদিন স্কুলের ছুটীর পর গুরুদাস বাবুর দোকান হইতে দুইটাকা দিয়া একখানা "দুর্ব্বাসার পারণ" ক্রয় করিয়া মহোল্লাসে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সেইদিনই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।"

যাঁহার বাল্যকাল হইতেই নাটক পড়িবার এরূপ ঝোঁক ধরে তাহার লেখাপড়া অর্থাৎ স্কুল পাঠ্য পুস্তক পাঠ যে কতদূর হয় সে কথা লেখাই বাহুল্য। অমরেন্দ্রনাথের অতি বাল্যকাল হইতেই নাটক পড়িবার একরোকা এমনই ঝোঁক আসিয়াছিল যে তাঁহার লেখা পড়ায় নিতান্তই অবহেলা হইতে লাগিল। তাঁহার লেখা পড়ার এই অবহেলা ক্রমেই তাঁহার আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্তবাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন ভাইকে বেশ করিয়া 'রুলের' আঘাতে লেখা পড়া চাড়য় হইবার জন্য রীতিমত শাসন করিলেন, কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। মধ্যম ভ্রাতার কঠোর শাসন সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবের পরিবর্তন হইল না, তিনি পূর্ব্বে যেমন দিবারাত্র নাটক পাঠ করিতেন, তাঁহার নাটক পাঠ সেইরূপই চলিতে লাগিল। হীরেন্দ্র বাবু ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি একদিন অমরেন্দ্রনাথের সেই সকল শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি (অর্থাৎ এ যাবৎ অমরেন্দ্রনাথ হাত খরচের চারিটী পয়সা বাঁচাইয়া যে কয়খানি নাটক কিনিয়াছিলেন সেগুলি) একস্থানে জড় করিয়া অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় অমরেন্দ্রনাথ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন,—এত দুঃখ তিনি জীবনে আর কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার মেজদাদা সেদিন যে তাঁহাকে রুলের বাড়ীতে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তত কষ্ট হয় নাই, যত কষ্ট হইল তাহার এতদিনের সঞ্চিত প্রিয় পুস্তকগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া দেওয়ায়। তাঁহার সেই সাধের পুস্তকগুলি যেদিন বাটীর উঠানের মাঝখানে ভস্মীভূত হইয়া গেল সেদিন তিনি সারাদিন অনাহারে থাকিয়া কেবলই কাঁদিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহাসমারোহে নূতন বাড়ীতে ষ্টার থিয়েটার খুলিবার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। যেদিন থিয়েটার খোলা হইল সেইদিন অমরেন্দ্রনাথের বাটীর অনেকেই থিয়েটার দেখিতে যাইবেন স্থির করিলেন, অমরেন্দ্রনাথও তাঁহাদের সহিত থিয়েটারে যাইবার জন্য আবদার ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্দ্রবাবু কিছুতেই তাঁহাকে থিয়েটারে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন, শেষে তাহার পিতা তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। পিতার নিকট থিয়েটার দেখিতে যাইবার অনুমতি পাইয়া সেদিন অমরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর যে আনন্দের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল সে কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি তখনি সাজিয়া গুজিয়া হাসিমুখে থিয়েটার দেখিতে রওনা হইলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়েছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ইহার কিছুদিন পরে ষ্টার থিয়েটার খোলা হইল। প্রথম রজনীতে গিরিশচন্দ্রের নসীরামের অভিনয়। বাটীর নিকটেই নূতন থিয়েটার নূতন উৎসবে খোলা হইবে, সুতরাং আমাদের বাড়ীর অনেকেই সেদিন থিয়েটার দেখিবার জন্য উৎসাহান্বিত। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বক্স রিজার্ভ করিতে পাঠাইলেন। আনন্দ ও উৎসাহে আমার অন্তর নাচিয়া উঠিল। আমি আমার পিতার 'আবদারে ছেলে' ছিলাম, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া বসিলাম, বলিলাম,—'মেজদাদাকে বলিয়া দিন আমি আজিকার মত থিয়েটার দেখিতে যাইব।'

পিতাঠাকুরের নিকট একবার দরবার করিলাম, তাহার পর মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া তাঁহাকেও ধরিলাম। মেজদাদা ত কিছুতেই সম্মত নন—আমি থিয়েটার দেখিতে যাই, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয়। অনেক কান্নাকাটি সুপারিস ইত্যাদির পর তিনি অনুমতি দিলেন।

সেদিন শুক্রবার, মনে আছে সেদিন ফুলদোল। হাতীবাগানের বাড়ীতে ষ্টারের প্রথম অভিনয় রজনী। আমরা অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা ইন্দ্রালয় তুল্য। নয়ন-মন-বিভ্রমকারী সুরম্য ভবন, অসংখ্য অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকমালা ও সুপরিচ্ছদধারী নানাশ্রেণীর সহস্র সহস্র শ্রোতার সমাগম প্রভৃতি দেখিয়া আমি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইলাম। ভাবিলাম আমি কোথায় আসিয়াছি! এত শোভা, এত সৌন্দর্য, নয়নাভিরাম এমন উজ্জ্বল দৃশ্য—এই প্রথম আমার চক্ষুর উপর উদ্‌ভাসিত হইল। ভাবিলাম যবনিকার বাহিরে রঙ্গপীঠেই যখন এত মাধুরী, না জানি যবনিকার অভ্যন্তরে—রঙ্গমঞ্চে আরোও কত অপার্থিব দৃশ্যলহরী প্রচ্ছন্ন আছে।"

আমার মনে আছে এই দিন অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বনামখ্যাত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টেজের উপর দর্শন দিলেন। একটা শাদা পাঞ্জাবী তাঁহার গায়ে ছিল। সহস্র সহস্র দর্শকের কৌতূহলোদ্দীপক লোচন তাঁহার উপর নিপতিত

হইল। অমৃতবাবু একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এই কবিতাটি মুদ্রিত হইয়া সমাগত দর্শকগণের মধ্যেও বিতরিত হইয়াছিল। যদিও এখন তাহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রথম কয়েকটী ছত্র আমার বেশ স্মরণ আছে। কবিতাটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উক্ত কবিতাটী এখন আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এমন সুন্দর কবিতার যতটুকু অংশ সংরক্ষিত করা যায় তাহাই লাভ বলিয়া মনে করি। যে কয় ছত্র আমার স্মরণ আছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

হে সজ্জন! পদে নিবেদন,
নির্ব্বাসিত মনোদুঃখে,
বঞ্চিলাম অতি সুখে,
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব যুগল চরণ;
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ,
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন।

ইহার পরবর্ত্তী ছত্রগুলি আর আমার মনে নাই। অতঃপর অভিনয় আরম্ভ হইল। এক বটবৃক্ষমূলে—নানা রঙ্-এর পোষাক পরিয়া কুর্দ্দো কুর্দ্দো মর্দ্দ মত—তাড়ীর ঝারা লইয়া

রূপিয়া লুকিয়ে রেখছ কোথা পা';
তুমি অমন করে শুঁড়ীর ঘরে
পায় ধরি আর যেও না।

বলিয়া বিকট স্বরে গান ধরিল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—নসীরাম, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র—অনাথনাথ, ৺অঘোরনাথ পাঠক—কাপালিক, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)—শম্ভু, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—ভূতনাথ, উপেন্দ্রনাথ মিত্র—রাজা, ৺মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী—মন্ত্রী এবং অভিনেত্রীদিগের মধ্যে ৺গঙ্গামণি—সোনা, ৺কাদম্বিনী—বিরজা, এবং ৺হরিমতি—মাধুরীর (এই অভিনেত্রী জীবিতা থাকিলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সুগায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইতেন) ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নসীরাম নাটকখানি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা বটে, কিন্তু সে সময় তিনি ৺গোপাললাল শীলের "এমারেল্ড" থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং অন্য রঙ্গালয়ে প্রকাশ্যভাবে কোন বই দেওয়া তাঁহার সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু শিষ্য ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ গিরিশচন্দ্র খালধারে খোলার ঘর ভাড়া করিয়া লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া অতি গোপনে এই নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাছে গোপাললাল শীল জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীলোক সাজিয়া গভীর রাত্রে এই বই লিখিতেন। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আসিয়া এই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন।"

এই সময় অমরেন্দ্রনাথের বয়স সবে মাত্র তের পার হইয়াছে। তিনি অভিনয় দর্শনের পর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু সেই দর্শন অবধি কেমন যেন একটা থিয়েটারের

মদিরায় তিনি একেবারে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যাত্রা দেখিবার পর হইতেই একজন অভিনেতা হইবার মতি তাঁহার প্রাণের ভিতর ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। আবার ষ্টার থিয়েটার দেখিয়া আসিবার পর হইতে সেই ইচ্ছাটা কর্ম্মকরী করিবার জন্য তিনি একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মাত্র ত্রয়োদশ বৎসরের একটী বালকের যদি একজন অভিনেতা হইবার এইরূপ প্রকট ইচ্ছা প্রাণের ভিতর বলবতী হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহার পক্ষে লেখাপড়া হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। অমরেন্দ্রনাথেরও স্কুল যাওয়া একরূপ বন্ধ হইল। কেমন করিয়া অভিনেতা হইতে পারিবেন তখন তাহাই হইল তাঁহার জপতপ। অমরেন্দ্রনাথের জন্ম অতি উচ্চ বংশে, তারপর তিনি ধনবানের সন্তান, কাজেই স্কুল হইতেই তাঁহার দুই চারিজন মোসাহেব জুটিয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রাণের বন্ধু ভাবিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনের এই অদমনীয় ইচ্ছার কথা তিনি তাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তিনি একদিন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, "ভাই, আমি সে দিন ষ্টার থিয়েটার দেখিতে গিয়েছিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা মুখে বলিবার নয়। আমার এক্টার হইবার ভারি ইচ্ছা। বলিতে পার কি করিলে এ্যাক্টার হওয়া যায়?"

বন্ধু আস্ফালন করিয়া উত্তর দিলেন, "এ আর এমন একটা শক্ত কি কাজ! একটা থিয়েটার খোল, তাহা হইলেই এ্যাক্টার হইতে পারিবে।"

থিয়েটার খোল কথাটা বলা যত সহজ, উহা কাজে পরিণত করা ততোধিক কঠিন। বন্ধু নির্ব্বিকারচিত্তে তো বলিয়া দিলেন থিয়েটার খোল, কিন্তু কথাটা অমরেন্দ্রনাথের প্রহেলিকার মত ঠেকিল। এ্যাক্টার হইতে হইলে যে একটা থিয়েটার খুলিতে হয় এ কথাটা এতদিন তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিয়া তিনি একেবারে 'মুষড়াইয়া' পড়িলেন। থিয়েটার কেমন করিয়া খুলিতে হয়, থিয়েটার খুলিতে কি কি প্রয়োজন, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না! তবে এইটুকু বেশ বুঝিলেন থিয়েটার খুলিতে হইলে এক রাশি টাকার প্রয়োজন। যদিও তিনি ধনীর পুত্র, কিন্তু তখনও তাঁহার পিতা জীবিত, সুতরাং অজস্র টাকা আসিবে কোথা হইতে!"

দ্বিতীয় উল্লাস

প্রমাদে পতঙ্গ-বৃত্তি

বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের শত সহস্র তাড়না। কিন্তু কিছুতেই অমরেন্দ্রনাথের দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার কেবল একই ধ্যান, একই জ্ঞান—কেমন করিয়া অভিনেতা হইব। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন শেষ বুঝিলেন ভ্রাতার লেখাপড়া হওয়া অসম্ভব, তখন তিনি তাঁহাকে পিতার সহিত আফিসে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ দুই চারি দিন পিতার সহিত আফিসে বাহির হইয়া, আবার আফিসে যাওয়া বন্ধ করিলেন। হীরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে আফিসে যাইবার জন্য রীতিমত তাড়াহুড়া আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে তাড়নায় কোনই ফল ফলিল না। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতা মাতার 'আদরের গোপাল' ছিলেন। মাতা পিতার স্নেহাধিক্য বশতঃই হীরেন্দ্রবাবুর কোন তাড়নাই ফলপ্রদ হইত না। আফিসে নিয়মিত বাহির হইবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুকে তাড়াহুড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া অমরেন্দ্রনাথকে যখন তখন তিরস্কার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পিতার এই কথায় হীরেন্দ্রনাথ কি বুঝিয়াছিলেন অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার পর হইতে তিনি আর কোনদিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথকে কোনরূপ তিরস্কার করেন নাই।

পিতা মাতার 'নন্দদুলাল' বলিয়া বাটীর কেহই অমরেন্দ্রনাথকে কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার এক মাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন মধ্যম ভ্রাতা, তিনিও যখন নীরব হইলেন তখন আর তাঁহাকে পায় কে? অমরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া এখন হইতে কেবল তাঁহার বদ্-সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র কার্য্যই হইয়াছিল তাঁহার সেই দলটী লইয়া দিন রাত কেবল একই চিন্তা—কেমন করিয়া থিয়েটার খোলা যাইতে পারে? তাঁহার দলটী যা জুটিয়াছিল তাহাদের ভিতর একটীও ভাল ছেলে ছিল না। কেমন করিয়া থাকিবে! যে সকল বালকদের একমাত্র চিন্তা কেমন করিয়া থিয়েটার খুলিব তাহাদের ভিতর কি ভাল ছেলে থাকিতে পারে? অমরেন্দ্রনাথ

যে দিন দিন নিম্ন হইতে অতি নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছেন, ক্রমশঃ আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি সে দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের তখন একমাত্র চিন্তা হইল,—কি উপায় করিলে এই বালকের স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারা যায়? নানা জনে নানা পরামর্শ দিল। শেষে স্থির হইল, ছেলের বিবাহ দিয়া একটী লাল টুকটুকে বৌ আনিলেই ছেলের স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। যেমন পরামর্শ স্থির অমনি কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। পিতা যদি ধনবান্ হন তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইতে বিলম্ব হয় না। চারিদিকে ঘটকঘটকীর ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। নানা দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ হইল। শেষে কয়েকটি পাত্রী দেখিবার পর একটী পাত্রী পছন্দ হইল এবং মহাসমারোহে যথা সময়ে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল। তখন অমরেন্দ্রনাথের বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর। অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনগণ ভাবিয়াছিলেন উদ্বাহবন্ধনে অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবে পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু বিবাহের পরও তাঁহার স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও সেইরূপই রহিলেন। মাঝখান হইতে বেশ একটু বাবু হইয়া পড়িলেন। বিবাহের পর হইতে তাঁহার হাতও একটু স্বচ্ছল হইল। পূর্ব্বে তাঁহার হাতে একটী পয়সাও পড়িত না, এক্ষণে মাসে মাসেই 'থক্‌থাক্' কিছু কিছু তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সেই টাকায় অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার দলবল লইয়া প্রায়ই ষ্টার থিয়েটার দেখিতে লাগিলেন। এদিকে যতই থিয়েটার দেখা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই তাঁহার মন থিয়েটারের ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল। থিয়েটারের ভিতরের ব্যাপারটা কি, তাহা জানিবার জন্য একটা অতৃপ্ত কৌতূহল তাঁহার সমস্ত প্রাণটাকে ক্রমাগত দুলাইতে লাগিল। উপাসকের নিকটে উপাসনা-মন্দিরের ন্যায় থিয়েটার তাঁহার কাছে একটী পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী ছিল। থিয়েটার সংশ্লিষ্ট-অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার চক্ষে নিতান্ত আদর ও সম্মাননার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে বলিতেন, "ভাই, এই যাঁহারা থিয়েটারে অভিনয় করেন তাঁহাদের কি সৌভাগ্য! আমার উহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বড় ইচ্ছা হয়।"

দলের মধ্যে একজন বেশ একটু মাতব্বর গোছের ছোক্‌রা ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "এ আর এমন একটা কি শক্ত কথা! তুমি কিছু টাকা জোগাড় কর, তারপর আমায় বলিও কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবে। তুমি যাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে চাও, আমি তাঁহার সঙ্গেই তোমার আলাপ করাইয়া দিব। তবে ভাই এ্যাক্টারদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার বাহিরে। তাঁহাদের চালচলন যা দেখি তাতে মনে হয় তাঁহারা যেন মস্ত এক একটা লাট সাহেব।"

অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সেই বন্ধুর কথা মহা আগ্রহভরে শুনিতেছিলেন। বন্ধু নীরব হইবামাত্র বেশ একটু আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলেন, "পারিবে? আমি টাকা যোগাড় করিতে প্রস্তুত আছি। কত টাকা যোগাড় করিলে তুমি ভাই আমায় আলাপ করাইয়া দিতে পারিবে?"

বন্ধু বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিছু বেশী টাকার প্রয়োজন,—দু' দশ টাকায় হইবে না। অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক টাকা জোগাড়ের দরকার। তারপর আমি দেখিয়া লইব কে কত বড় এক্ট্রেস।"

বন্ধুর কথায় অমরেন্দ্রনাথ যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এত টাকা এক সঙ্গে তখন তাঁহার যোগাড় করা বড় কঠিন ছিল। তথাপি তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে পঞ্চাশটি টাকা জোগাড় করিতে পারিবেন। সেই সময় তাঁহার বন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে পঞ্চাশ টাকার জন্য তুমি যে একেবারে চুপ করিয়া গেলে! এক্টারের সঙ্গে আলাপ করা কি সহজ ব্যাপার! তুমি পঞ্চাশ টাকার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া যাইতেছ, কিন্তু এই এক্টারের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য, এই যে একজন লোক পঞ্চাশ হাজার টাকা একদিনে খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল!"

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। অমরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রাত্রে শয়ন করিয়া তিনি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সত্যই এক্টারের সঙ্গে আলাপ করা সহজ ব্যাপার নয়। সত্যই কিছু টাকার প্রয়োজন। তাঁহারা শুধু শুধু কেন আমার সহিত আলাপ করিবেন? যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহাদের সম্মান কত! পঞ্চাশ টাকা লইয়াও তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। পঞ্চাশ টাকা খরচ করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করা যায় না। এখন কি উপায়ে টাকা যোগাড় করিতে পারা যায়?" বিবাহের সময় অমরেন্দ্রনাথ মূল্যবান্ আংটী, ঘড়ী ও চেন যৌতুক পাইয়াছিলেন! অনেক চিন্তার পর তাহার সেই তিনটীর কথা মনে পড়িল। তাঁহার প্রাণের আগ্রহ এমনই বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে তাঁহার আংটী ও ঘড়ীর চেন বিক্রয় করিয়া কালই টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং সেই টাকায় তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত থিয়েটারের কোন একজন অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত হইতে যাইবেন।

এই সকল চিন্তায় তাঁহার বহু রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা হইল না। শেষে তিনি সেই চিন্তা করিতে করিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই তিনি তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আংটী ও ঘড়ীর চেন জামার পকেটের ভিতর লুক্কায়িতভাবে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারই প্রতীক্ষায় তাঁহার দলবল একস্থানে সকলে জুটিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহারা সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার মনের কথা বন্ধুবর্গের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বন্ধুবর্গের আর আনন্দ ধরে না। তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন, 'ভাই, তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি পারিবে।'

মাঝখান হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "আমার মতে একেবারে আংটী ও চেন বিক্রয় করা উচিত নয়। এখন বাঁধা দেওয়া যাক, এর পর যদি কখনও সুবিধা হয়, পুনরায় ছাড়াইয়া লওয়াও যাইতে পারিবে?"

তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী তখনই কার্য্য শেষ হইয়া গেল। একজন যাইয়া আংটী ও ঘড়ী চেন বাঁধা দিয়া তখনই একশত টাকা লইয়া আসিলেন। অমনি স্থির হইয়া গেল রাত্রে তাঁহারা অমরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া একজন অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত হইতে যাইবেন। অভিনেত্রীর সহিত আলাপ করিতে যাইতে হইলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় জামার প্রয়োজন। দলের মধ্যে দু'একজনের তাহারও অভাব ছিল। অমরেন্দ্রনাথ তখনই হুকুম দিলেন, সেই টাকা হইতে তাঁহারা যেন কাপড় জামা কিনিয়া লয়েন। এইভাবে তখনকার মত সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরই বন্ধুগণ সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া তর্ক বিতর্কের পর কোথায় যাওয়া হইবে তাহাও স্থির হইল। তাঁহারা দুই চারিজন অভিনেত্রীর বাড়ী একে একে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের স্থান দিল না। সকলেরই বাবু আছেন, সুতরাং তাঁহাকে বসাইতে কেহই রাজি নয়। অমরেন্দ্রনাথের এরূপ স্থানে এই প্রথম গমন। ইহাদের সহিত পরিচয় করিবারও তাঁহার যেমন বেশ একটা আগ্রহ ছিল, তেমনি কেমন যেন একটা ভয়ও প্রাণের ভিতর হইতেছিল। দুই চারি বাড়ী হইতে ফিরিবার পর তাঁহার আর কোন বাড়ীতে যেন প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছিল না। তিনি মৃদুস্বরে তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "থাক ভাই, আজি আর কোথাও যাইয়া কাজ নাই, চল বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

কিন্তু বন্ধুরা তখন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায় না কোথায় না যাইয়া কিছুতেই বাড়ী ফিরিবেন না। কাজেই অমরেন্দ্রনাথকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে হইল। অনেক বাড়ীতে ঘোরাঘুরির পর শেষে তাঁহারা একস্থানে আশ্রয় পাইলেন। এটী কোন থিয়েটারের অভিনেত্রী নয়, তবে নাকি ইনি একদিন অভিনেত্রী হইবার আশায় কোন এক থিয়েটারে গিয়াছিলেন ও থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে ভবিষ্যতে হইতে পারেন এমন আশাও দিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ তাহার বন্ধুবর্গের সহিত গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহের আসবাবপত্র দেখিয়া তিনি যেন একটু অবাক্ হইয়া যাইলেন। গৃহের মধ্যস্থলে বিছানা পাতা, সেই বিছানার এক পার্শ্বে যাইয়া অমরেন্দ্রনাথ মহা-সঙ্কোচে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর তখন সবলে স্পন্দিত হইতেছিল, গলা যেমন কেমন কাট হইয়া আসিতেছিল। তাঁহারা সেই ফরাসের উপর উপবিষ্ট হইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই একজন বেহারা আসিয়া একটা প্রকাণ্ড জরিদার গুড়গুড়িতে একটা প্রকাণ্ড কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথের একজন বন্ধু সেই গুড়গুড়ির প্রকাণ্ড নলটা তুলিয়া লইয়া মৃদু মৃদু টানিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী ঠাকুরাণী

আসিয়া সেই ফরাসের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিন, একটা পান খান।" অমরেন্দ্রনাথ নিষ্পলক নয়নে সেই ললনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রায় সমুদায় ধনীর সন্তানের অধঃপাতের ইতিবৃত্ত এইরূপই বটে। প্রায় সকলকেই প্রথমে উৎকট কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গের কুপরামর্শে কুস্থানে গমন করিতে হয়। উহাতে সকলেরই প্রথমে বক্ষ স্পন্দিত হয়, চিত্ত অপ্রসন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে এমনই মহামোহ মদিরা চিত্ত অধিকার করিয়া বসিতে থাকে, যে অহিফেন-সেবীর ন্যায় তাহাকে প্রত্যহ তথায় না যাইয়া আর উপায় থাকে না। ইহাই তরুণ ধনি-তনয়ের পতঙ্গ-বৃত্তি।*

* এই দারুণ সংসর্গদোষের কথা অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আদর' নামক উপন্যাসে বেশ পরিস্ফুটভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আদর, তৃতীয় পরিচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় উল্লাস

সাধনার প্রথম সফলতা

অতি শৈশব হইতেই একজন নট হইবার ইচ্ছা প্রাণে বলবতী হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ ক্রমে একরূপ উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে নানারূপ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া মাঝে মাঝে এইরূপ নানা কুস্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। অসৎসঙ্গের যাহা পরিণাম হয় অমরেন্দ্রনাথেরও ক্রমেই সেইরূপ হইতে লাগিল। এই সকল স্থানে যাইতে প্রথম প্রথম তাঁহার যেরূপ সঙ্কোচ বোধ হইত ক্রমেই তাঁহার সেই সঙ্কোচের ভাবটা কাটিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে এই সকল স্থানে যাইয়া তিনি বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কত বড় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও ভ্রাতারা সমাজের কিরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন—এ সকল কথা তাঁহার একবারও মনে হইল না। তিনি পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া নিজেকে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ক্রমেই যে অধঃপাতে যাইতেছেন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সুপণ্ডিত আদর্শ-চরিত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহা যে লক্ষ্য করিতেছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথকে শাসন করিতে যাইলেই পিতা বিরক্ত হন, সেই কারণে তিনি আর অমরেন্দ্রনাথকে কোন কথা বলিতেন না। কিন্তু যখন লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদের বংশের মর্য্যাদা ভুলিয়া কুসঙ্গীদের কুপরামর্শে অতি কুস্থানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্তই পিতৃপদে নিবেদন করিলেন। পুত্রপ্রাণ দ্বারকানাথ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'যে উচ্ছন্ন যাইবে তাহাকে কি আর ধরিয়া রাখা যায়? নিরর্থক মার ধর করিয়া ফল কি? নিজে যদি উচ্ছন্ন যায় নিজেই কষ্ট পাইবে।' হীরেন্দ্রবাবু পিতার এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, কিন্তু কোন কথাও কহিলেন না। বিনা শাসনে অমরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের বয়স অনুমান যখন ১৩।১৪ বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের অসৎপথে যাইবার প্রথম কিছু কিছু বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থের অভাবে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর আর তাঁহার সে অভাব রহিল না। তিনি যথেচ্ছ পয়সা উড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই অমিতব্যয়িতায় তাঁহার অগ্রজ উভয় ভ্রাতাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা একদিন অমরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' অমরেন্দ্রনাথের উপর তখন তাঁহার অসৎ সঙ্গের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের শত উপদেশ তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করিল না, বরং ফল বিপরীত হইল। তিনি অল্পদিন পরেই তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ভ্রাতাদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া লইলেন এবং নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া একটা থিয়েটারের দল বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সঙ্গীরা তাঁহার এই চেষ্টায় শতরূপে সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

শৈশব হইতেই নিজে নট হইবার একটা দারুণ ইচ্ছা ছিল, তাহার উপর বন্ধুবর্গের উৎসাহ,—এদিকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাতেও যথেষ্ট টাকা আসিয়া পড়িয়াছে,—অত সুবিধা এক সঙ্গে মিলিত হইলে আর নট হইবার অধিক বিলম্ব হয় না। অমরেন্দ্রনাথ অতি সত্বরই তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া একটী থিয়েটারের দল গঠন করিলেন। বাগমারির একটী বাগানে এই দলের মহালা চলিতে লাগিল। অভিনয়ের জন্য পুস্তক স্থির হইল—পলাশীর যুদ্ধ। বাগানে পলাশীর যুদ্ধের মহালা যত চলুক আর নাই চলুক, বন্ধুবর্গের আমোদ প্রমোদের কোনই অভাব ছিল না,—চব্বিশ ঘণ্টাই আমোদ প্রমোদের তুফান বহিতে লাগিল। অর্থও রাশি রাশি ব্যয় হইতে লাগিল। অর্থও যেমন দুই হস্তে ব্যয় হইতে লাগিল, দলও ততই ভরাট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় ছয় মাসকাল পলাশীর যুদ্ধের মহালা দিবার পর, উহা কোথায় অভিনয় করা হইবে তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল, যে মিনার্ভা থিয়েটারের বাটী ভাড়া লইয়া এক রাত্রি পলাশীর যুদ্ধ অভিনয় করা হইবে। একদিন কয়েকজন বন্ধু যাইয়া মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া করিয়া আসিলেন, এবং অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া মহাধুমধামে এক রাত্রি পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় করিলেন। অমরেন্দ্রনাথের এই প্রথম নটরূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। পলাশীর যুদ্ধে অমরেন্দ্রনাথ সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটি তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সেই অভিনয় যেই দেখিয়াছে সেই শত মুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছে। এই অভিনয় সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ নিজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সে আজ বহু দিনের কথা। আমি তখন বিংশ বর্ষীয় যুবক। নাট্য শিল্পের প্রতি আমার আশৈশব অনুরাগ। নটের লাঞ্ছনা আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। নাট্য শিল্পের উন্নতি-সাধনে সকলেই উদাসীন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের পথ নিজেই ঠিক

করিয়া লইলাম। প্রতি পদে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অনেক প্রতিবাদ, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমায় ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু চির-পোষিত কর্ত্তব্য হইতে কখনই কিছুতেই বিচলিত হই নাই। নাট্য শিল্পের উন্নতির জন্য লাঞ্ছনার গুরুভার সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়াছি। সর্ব্ব প্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া গিরিশবাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ অভিনয় করি। আমি সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ার্থ যখন ঐকতান বাদন হইতেছিল,—এমন সময় দেখিলাম পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র এক শান্ত সৌম্য সুন্দর পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অনিমেষনেত্রে আগন্তুকের সেই অনিন্দ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত মূর্ত্তি ক্ষণকাল দেখিলাম। অলক্ষ্যে অন্তর মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বিনয় ও নম্রতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইতে লাগিল। সেই অভ্যাগত—নবীন অপরিচিতের চরণপ্রান্তে প্রণত হইবার জন্য মস্তক নত হইয়া পড়িল। গিরিশ বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অমর, কে আসিয়াছেন বল দেখি?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন গিরিশ বাবু কহিলেন,—"ইনিই কবি নবীনচন্দ্র।"

"পলাশীর যুদ্ধ" প্রণেতা কবিচূড়ামণি নবীনচন্দ্র—আমার সম্মুখে! আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের চরণ ধারণ করিলাম। তখনও পলাশীর যুদ্ধের সকল কথাই কানে বাজিতেছিল, তখনও কবির রসময়ী লেখনী ভঙ্গে অন্তরে বিবিধ রসের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তখনও দর্শকবৃন্দের পুলক-পূরিত করতালিধ্বনি রঙ্গালয় মুখরিত করিতেছিল—এই সকলের মধ্যে আবার গিরিশ বাবুর গুরু গম্ভীর বাণী—আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আবেগ আনিয়া দিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার কোমল হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে আমায় উঠাইলেন—মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল। দরিদ্রের অর্থলাভ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ সামগ্রী আমি লাভ করিলাম। কবিবরের অকৃত্রিম স্নেহলাভে আমি ধন্য হইলাম। তিনি আমার অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার উল্লেখ করিলে আত্ম-প্রশংসা করা হয়। আত্ম-প্রশংসা গুরুতর মহাপাপ।"

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া গিরিশবাবুর সঙ্গে আমি কবিবরের বাটীতে গমন করিলাম। তিনি যেরূপ সরলভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে আমি প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উত্তুঙ্গ গিরিপ্রতিম কুরুক্ষেত্র ও রৈবতক মহাকাব্য যাঁহার সৃষ্টি, তাহার মুখে অকৃত্রিম সরলতা—তাহার স্বভাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়! আমাদের সহিত কত কথাই কহিলেন। অনিমেষ নয়নে আমি তাঁহার সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পলাশীর যুদ্ধের কথা উত্থাপিত হওয়ায় গিরিশবাবু কবিবরকে 'দ্রুম করি দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার" এই পঙ্ক্তিটী সম্বন্ধে বলিলেন, যে উহা Lord Byron-এর Child Harold-এর 3rd Canto-এর 22nd Stanza হইতে

অনুকৃত। Byron Waterloo যুদ্ধের পূর্ব্বের রাত্রির বর্ণনা করিয়াছেন, আর উক্ত পংক্তিটী পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু নবীনবাবুকে জানাইলেন, যে "তাঁহার বিবেচনায় অনুবাদটি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। গিরিশবাবুর কথা শুনিয়া কবিবর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি হইলে ইহার কিরূপ অনুবাদ করিতেন?"

গিরিশবাবু চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

নিকটে বিকট পুনঃ বিপুল গর্জ্জন,
যে যেখানে অস্ত্র ধর কামান ভীষণ।

উহাতে কবি নতশিরে অনুবাদকের নিকট পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং নিজের লেখার প্রতিবাদে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

কবিবরের এই মহোদরভাব দর্শনে আমি বিস্মিত ও মোহিত হইলাম। নবীনচন্দ্রের সরলতা, সহৃদয়তা, ও উদারতার তুলনা ছিল না। বস্তুতঃ সরলতা ও সহৃদয়তাই জগতের প্রাণ। তাই একটী সরল, উদার, সহৃদয় প্রাণ চলিয়ে গেলে স্বতঃই যেন মনে হয় যে পৃথিবীটা শূন্য হইয়াছে।"

অমরেন্দ্রনাথ আশৈশব যে প্রাণের কামনা সাধনের জন্য কত লাঞ্ছনা, কত তাড়না সহ্য করিয়াও নিরাশ হন নাই, এতদিনে তাঁহার সেই বাসনা ফলবতী হইল। ঈশ্বরদত্ত একটা বিরাট শক্তি তাঁহার ভিতরে বিরাজমান ছিল, শত বাধা বিপত্তিতেও তাহা লুপ্ত হয় নাই। সিরাজের ভূমিকায় প্রথম অভিনয়েই তাহা বিকসিত হইয়াছিল। সেদিনকার প্রত্যেক দর্শকই তাঁহার অভিনয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার আত্মীয় স্বজন, যাঁহারা তাঁহাকে এই নটজীবন গ্রহণের জন্য কত গঞ্জনা দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও বলিতে হইয়াছিল "হাঁ, কালু আমাদের অভিনয়টা করিয়াছে সত্য।"

বাটীতে অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে কালু বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার ডাক নাম ছিল কালু। মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া অভিনয় করিবার পর আরও একবার অমরেন্দ্রনাথ কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া লইয়া এক রাত্রি অভিনয় করেন।* এইরূপ দুই এক রাত্রি থিয়েটার ভাড়া লইয়া অভিনয় করিবার পর একটী স্থায়ী থিয়েটার খুলিবার ইচ্ছা অমরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে। সেই সময় হইতে তিনি একটী থিয়েটার খুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কিন্তু এই কয়েক বৎসর জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় হওয়ায় তখন তাঁহার হাতে টাকা পয়সার বিশেষ সচ্ছলতা ছিল না। কাজেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে তখন বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ভবিষ্যতে যে কোথায়ও সঞ্চিত অর্থ পাইবেন সে আশাও তাঁহার ছিল না। কাজেই তাঁহাকে বেশ একটু চিন্তিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি হতাশ

*সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত করিন্থিয়ান থিয়েটারে সেই দিন অমরেন্দ্রনাথের পলাশীর যুদ্ধের অভিনয়ের দর্শক ছিলেন বলিয়া অমরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান হরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকটে স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন।

হইলেন না। কি উপায়ে একটা স্থায়ী থিয়েটার খোলা যাইতে পারে, দিবারাত্র কেবল সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

বিশ বৎসরের একটী সংসারানভিজ্ঞ বালক, হাতে একটী পয়সা নাই, সে কি কল্পনাও করিতে পারে যে 'আমি একটী থিয়েটার খুলিব?' অমরেন্দ্রনাথের বয়স তখন কেবলমাত্র বিংশতি বৎসর, হাতে একটী পয়সা নাই তথাপি তাঁহার আশা থিয়েটার খুলিবেন। অমরেন্দ্রনাথের ভগবদ্দত্ত একটী ক্ষমতা ছিল যাহার গুণে তিনি অতি সহজেই সকলের অতি আপনার জন হইতে পারিতেন। এক্ষণে কেবল সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি থিয়েটার খুলিবার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া অজস্র পিতৃধন নষ্ট করিয়া অমরেন্দ্রনাথের একটী লাভ হইয়াছিল যে, থিয়েটার সংক্রান্ত এমন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না যাহার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্টরূপে আলাপ হয় নাই। সকলেই তাঁহাকে বেশ একটু প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী—এই কয়েক জনের সহিত তাঁহার আলাপ কিছু অধিক দিনের। তিনি তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা একদিন তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভরসা দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে একরূপ কথাই দিলেন যে তিনি যদি থিয়েটার খুলেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার থিয়েটারে যোগ দান করিবেন। এইরূপে অভিনেতা ও অভিনেত্রী ঠিক করিবার পর অমরেন্দ্রনাথ একটী থিয়েটারের বাটী ভাড়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীলের প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটার তখন নানাকারণে বন্ধ ছিল। উক্ত থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের সেই থিয়েটারটি হস্তান্তর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ গোপাল বাবুর নিকট থিয়েটারটী ভাড়া চাহিলেন। গোপালবাবু অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠসহোদর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথকেও চিনিতেন। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে তিনি বলিলেন—"তুমিতো ধীরেণের ছোট ভাই! তুমি যে তোমার জীবন এইভাবে নষ্ট করিবে তাহা আমি কোনও প্রকারে অনুমোদিত করিতে পারি না। যাও, তোমাকে আমি থিয়েটার ভাড়া দিব না।" অমরেন্দ্রনাথ এইরূপে বিফল-কাম হইয়া শীল মহাশয়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ধরিয়া বসিলেন। সেই বন্ধুবরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তিনি স্বীকৃত হইয়া উপযুক্ত লেখাপড়া করিয়া থিয়েটার বাটী অমরেন্দ্রনাথকে ভাড়া দিলেন। থিয়েটার বাটী ভাড়া পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত থিয়েটার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন গৃহটী ধূলি-সমাচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত অব্যবহার্য্য। যাহা হউক, তিনি নবোদ্যমে, মহোৎসাহে থিয়েটার খুলিবার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

চতুর্থ উল্লাস

ক্লাসিকে অভিনয়-লীলা

থিয়েটার বাটী অনেক কষ্টে জোগাড় হইল বটে, কিন্তু কেবল থিয়েটার বাটী হইলেই তো আর থিয়েটার হয় না। থিয়েটার খুলিতে হইলে থিয়েটারের প্রধানতম উপাদান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রী জোগাড় হইবে কেমন করিয়া? জোগাড় করিবার প্রধান সহায় অর্থ,—তাহাই তাঁহার নাই। যে সময় অমরেন্দ্রনাথ এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইবেন, সেই সময় তাঁহার হস্তে একটী পয়সাও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সত্যই তখন তিনি অর্থের অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন। যাঁহারা থিয়েটার ভাড়া লইবার পূর্ব্বে তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে অনেকেই তাঁহার থিয়েটারে আসিতে অস্বীকার করিলেন। আবার কেহ কেহ এত অধিক দাবী করিলেন যে তাহা প্রদান করা তখন অমরেন্দ্রনাথের একেবারেই সাধ্যের বাহিরে ছিল। থিয়েটার ভাড়া লইয়া অমরেন্দ্রনাথকে কাজে কাজেই মহাবিপদে পড়িতে হইল। তখন তাঁহার বয়স কেবলমাত্র বিশ বৎসর। বিংশতি বৎসরের একটী যুবক,—তাহার সংসার জ্ঞান কতটুকু হইতে পারে। তিনি সরল মনে সকলেরই কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। একবারও ভাবেন নাই যে, যাঁহারা তাঁহাকে থিয়েটার ভাড়া লইবার জন্য পূর্ব্বে নাচাইয়াছেন,—তাঁহারাই এক্ষণে সরিয়া দাঁড়াইবেন। অমরেন্দ্রনাথ এতদিন স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পিতৃদত্ত অর্থ দুই হস্তে ব্যয় করিয়া আমোদ প্রমোদেই দিন কাটাইয়া আসিতেছিলেন। এরূপ ভাবে যে কখনও ঠেকিতে হইবে সে কথা তাঁহার একবারও মনে উদিত হয় না। যাঁহাদের চিরকাল তিনি বন্ধু ভাবিয়া আসিতেছিলেন, অর্থ ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। শেষে কয়েকজন মাত্র বাকি ছিলেন, থিয়েটার ভাড়া লইবার পর তাহারাও তাঁহাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। এত বিপদেও অমরেন্দ্রনাথ একেবারে দমিলেন না। ঈশ্বর দত্ত তাঁহার একটা অদ্ভুত শক্তি

ছিল যে তিনি কিছুতেই দমিতেন না। হাতে পয়সা নাই, একজনও সহায় নাই, তথাপি তিনি আশা ছাড়িলেন না। তখন 'একাই একশো' হইয়া থিয়েটার খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই দুর্দ্দিনে কেবল একজন তাঁহাকে ছাড়িলেন না। একমাত্র শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব তখনও তাঁহার সহায় রহিলেন। চুণিবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অমরেন্দ্রনাথ এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, যে যাহাই বলুক চুণি বাবু তাঁহার দলে যোগদান নিশ্চয়ই করিবেন। যখন তিনি আছেন ও চুণি বাবু আছেন, তখন অভিনেতার বড় বেশী অভাব হইবে না, যেমন করিয়া হউক অভিনেতা একরূপ যোগাড় হইয়া যাইবে। কিন্তু বিনা অর্থে অভিনেত্রী পাওয়া কঠিন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বঙ্গ নাট্যশালায় অভিনেত্রীর বড়ই অভাব। তখন বঙ্গ নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ অভিনেত্রীর অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। আজি কালিকার মতন তখন হরি, খেঁদী, টেপী প্রভৃতি অভিনেত্রী ছিল না। তখন অভিনেত্রী হইতে হইলে নানারূপ পরীক্ষা দিতে হইত। নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ রীতিমত যাচাই না করিয়া কাহাকেও অভিনেত্রী করিতেন না। কাজেই একটী বিশ বৎসরের তরুণ অনভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কোন শব্দই ছিল না। কাজেই তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন না।

বিপুল পিতৃধন নষ্ট করিয়া অমরেন্দ্রনাথের অপর কিছু লাভ হউক আর না হউক একটা কিন্তু লাভ হইয়াছিল। বঙ্গ নাট্যশালার অধিকাংশ লোকের নিকটেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। অভিনেত্রীদিগের মধ্যে অভিনেত্রীকুলমণি শ্রীমতী তারাসুন্দরী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী, অমরেন্দ্রনাথকে, কেন জানি না, একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন। অমরেন্দ্রনাথ একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে একাকী পাইয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত কথাই তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া বলিলেন, "তোমায় আমার থিয়েটারে যোগদান করিতে হইবে। তুমি তো আমায় বলিয়াছিলে আমি যদি থিয়েটার খুলি তাহা হইলে তুমি তাহাতে যোগ দান করিবে।"

অমরেন্দ্রনাথের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "আমার যোগ দিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ সময় কি আমার থিয়েটার করা উচিত?"

দুই দিন আগে যে অভিনেত্রী তাঁহার থিয়েটারে যোগ দিতে স্বীকৃত ছিল, যে তাঁহাকে থিয়েটার করিতে কত উৎসাহিত করিয়াছে, সহসা তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে বিশেষ বেদনা অনুভব করিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়াই হোক শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে নিজের থিয়েটারে লইয়া আসিবেন। কিন্তু সে কথা তারাসুন্দরীর নিকট ব্যক্ত করিলেন না। তিনি তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই গোপন করিয়া সে দিনকার মত সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর উপর ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহার অবস্থার কথাটা একবারও চিন্তা করিলেন না। তিনি নূতন থিয়েটার খুলিতেছেন। তাঁহার বয়স কেবল মাত্র কুড়ি বৎসর। তাঁহার দ্বারা থিয়েটার চলিবে কিনা প্রভৃতি নানা কথা ভাবিয়া দেখিলেন সে সময় শ্রীমতী তারাসুন্দরী কেমন করিয়া একটা বহু দিনের সুবিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার ছাড়িয়া তাঁহার নূতন থিয়েটারে যোগদান করিতে পারে? কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরীর উপর অমরেন্দ্রনাথের বেশ একটী অপ্রতিহত শক্তি ছিল। তিনি জানিতেন তারা মুখে যতই আস্ফালন করুক তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে আসিতেই হইবে, কারণ অমরেন্দ্রনাথ যখন ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবের পরিচালক ছিলেন, তখন শ্রীমতী তারাসুন্দরী ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবে অভিনয় করিত। এই ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবই অমরেন্দ্রনাথের প্রথম থিয়েটার। এই থিয়েটার দলের স্থায়ি কোন নাট্যশালা ভাড়া ছিল না। যখনই যে নাট্যশালায় সুবিধা হইত তাঁহারা সেইখানে তাঁহাদের অভিনয় করিতেন। অমরেন্দ্রনাথ, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতিকে লইয়া এই দল গঠিত করেন। এই দল প্রথম এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয় করেন, তাহার পর এই সম্প্রদায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করিবার বন্দোবস্ত করেন। শেষে একদিন বেঙ্গল থিয়েটারেও এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। বেঙ্গল থিয়েটারে এই সম্প্রদায় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিষাদ পুস্তকের অভিনয় করিয়াছিলেন। এই বিষাদ পুস্তকের অভিনয়েও অমরেন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন! কাজেই এ অবস্থায় অস্বীকার করিলেও অমরেন্দ্রনাথ বেশ জানিতেন শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাঁহার থিয়েটারে আনয়ন বড় কঠিন হইবে না। ইহা ব্যতীত শ্রীমতী তারাসুন্দরী অমরেন্দ্রনাথের নিকট আরও নানারূপে আবদ্ধ ছিল।

অমরেন্দ্রনাথ প্রায় দুই মাস কাল অহোরাত্র চেষ্টা করিবার পর কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া একটী সম্প্রদায় গঠন করিলেন এবং এমারেল্ড থিয়েটারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়া ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের হারানিধি নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি যে তারাসুন্দরীকে তাঁহার থিয়েটারে আনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনি তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব প্রভৃতিকে লইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে চৈত্র, প্রথম মহালা বসান ও নব বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে নূতন উদ্যোগে ও অদমনীয় উৎসাহে মহাসমারোহে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারের জীবন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটার খোলার তারিখ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় নাট্যমন্দিরে লিখিয়াছেন,—

"১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে অমরেন্দ্রনাথ, চুণিলাল দেব, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী প্রভৃতিকে লইয়া ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে "ক্লাসিক" থিয়েটারের উদ্বোধন করেন।

ইহার পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথ ইংলিশ থিয়েটার ও পরে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন।" *

ক্লাসিক থিয়েটার প্রথম যে রাত্রিতে খোলে সে রাত্রে পলাশীর যুদ্ধ ও বেল্লিক বাজার অভিনয় হয়। এই রাত্রে অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন থিয়েটারে নূতন সাজে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ভূমিকাটি যতদূর সুন্দর হওয়া সম্ভব তাহা অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অত আয়োজন সত্ত্বেও দর্শক সংখ্যা তেমন হইল না। পলাশীর যুদ্ধ ইতিপূর্ব্বে বহুবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য বোধ হয় দর্শক সমাগমের অভাব হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ সেইদিন হইতেই একখানি নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেন এবং অতি শীঘ্রই একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটক খানির নাম হরিরাজ। † অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত হরিরাজ নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দেন এবং মহাসমারোহে এই হরিরাজ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। হরিরাজ নাটকে অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই এক ভূমিকার অভিনয় করিয়াই তাঁহার নাট্য প্রতিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা এ কথা এক বাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের হারানিধি প্রথম অভিনীত হয়, না হরিরাজ নাটক প্রথম অভিনীত হয়, এ বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ সরকার নাট্যমন্দিরে লিখিয়াছেন,—

"নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথের নাট্য-জীবনের উন্মেষ—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকের অঘোরের চরিত্রে, বিকাশ—হরিরাজে এবং সমাপ্তি—সওদাগরের কুলীরকে। হারানিধি নাটকে "অঘোরের' ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহার পর হরিরাজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বঙ্গীয় নাট্য জগতের অভিনয় বন্যার একটা নূতন স্রোত ফিরাইয়া দিলেন—অমরেন্দ্রনাথের হরিরাজের চমকপ্রদ অভিনয় দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ চমকিত হইল।"

অমরেন্দ্রনাথ 'পলাশীর যুদ্ধের' অভিনয়ে দর্শক অভাব দেখিয়া, তাড়াতাড়ি হরিরাজ

---

* যতীন্দ্র বাবু অনেক দিন ক্লাসিক থিয়েটারে কার্য্য করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার উক্তি অধিকতর শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়। বিশেষতঃ ২৭শে চৈত্র প্রথম মহালা বসাইয়া ১লা বৈশাখ সমুদায় সাজ সরঞ্জামসহ একটী নূতন থিয়েটার খোলা একরূপ অসম্ভব। তবে 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁহাদের ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবের পুরাতন নাটক এবং এমারেল্ডের দৃশ্যপটাদি একরূপ ছিল, তাই চারি পাঁচ দিনেও প্রথম অভিনয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াও মনে করা যায় না।

† হরিরাজ নাটক সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ ও হ্যামলেটের সংমিশ্রণে সংযোজিত। নাটকখানি সম্পূর্ণ নাট্যসম্প*-পূর্ণ, সুতরাং অমরেন্দ্র বাবুর ন্যায় অপরিপক্ক-বুদ্ধি নবীন লেখক দ্বারা বিরচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। হরিরাজ নাটকই অমরেন্দ্রবাবুর শ্রেষ্ঠ নাটক। ইহার রচনায় অমরেন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা ও হরিরাজ চরিত্রের অভিনয়ে তাঁহার অভিনয় প্রতিভা পূর্ণ প্রকটিত।

নাটক রচনা করিয়া মহাসমারোহে অভিনয় করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তেমন দর্শকের সুবিধা হইল না। এখনকার মত তখনকার দিনে দর্শক এত সস্তা ছিল না। অধিকাংশ লোকেই নাট্যশালা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। যে অল্প সংখ্যক লোক থিয়েটার দেখিতে যাইতেন, তাহারাও অনেক দেখিয়া শুনিয়া তবে থিয়েটারে যাইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটার সদর্পে চলিতেছিল। সেই সময় যাঁহারাই পয়সা খরচ করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইতেন তাঁহারাই ষ্টার থিয়েটারে যাইতেন। কাজেই অমরেন্দ্রনাথের নূতন থিয়েটারে হরিরাজ নাটকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হইলেও দর্শকগণ নূতন থিয়েটার বলিয়া কেহই আসিতে চাহিতেন না। একেবারে দর্শকশূন্য রঙ্গালয়ে অভিনয় কার্য্য একরূপ সম্ভবপর নহে, কাজেই কি করিয়া দর্শক সংগ্রহ করা যায় অমরেন্দ্রনাথের তখন তাহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা। কি করিলে তাঁহার থিয়েটারে দর্শক অভাব দূর হইবে দিনরাত তিনি তখন কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি আছে, এই সময় এক একদিন ক্লাসিক থিয়েটারে এমনই দর্শকের অভাব হইত যে পথ হইতে লোক ডাকিয়া আনিতে হইত। সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যে এই সময় "ক্লাসিক" থিয়েটারের কোন অভিনেতার প্রধান কার্য্যই ছিল থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথবাহী ভদ্রলোকগণকে 'কাকুতি মিনতি' করিয়া ধরিয়া আনিয়া অভিনয় দেখান। মন্মথবাবুকেও নাকি একদিন এই সকল অভিনেতার হস্তে পড়িতে হইয়াছিল এবং তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া থিয়েটারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এইভাবে দর্শক জোগাড় করিবার ভিতরেও অমরেন্দ্রনাথের যে একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না তাহা নহে। তিনি ভাবিতেন এইভাবে দর্শক হইয়াও, তাহাদের মুখে মুখে যদি তাঁহার থিয়েটারের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন তাঁহার থিয়েটারে আর দর্শকের অভাব হইবে না। থিয়েটারের 'নেষা' বড় প্রচণ্ড। যে কখনও থিয়েটার দেখে নাই, তাহার কোন দিনই থিয়েটার দেখিবার আগ্রহ হইবে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আবার কোনদিন কোন ক্রমে একবার অভিনয় দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহার অভিনয় দেখিবার আগ্রহ এমনই বলবান হইয়া উঠিবে যে সে আর কিছুতেই অভিনয় না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। মন্মথবাবু বলেন, 'সেই যে একদিন আমি পীড়াপীড়িতে পড়িয়া থিয়েটার দেখিয়া আসিলাম তাহার পর আর আমি কিছুতেই অভিনয় দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। যখনই একটু সুবিধা পাইতাম তখনই থিয়েটার দেখিতে যাইতাম। এইভাবে থিয়েটার দেখার নেষাটা আমার বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই যে আমার ঠিক সর্ব্বপ্রথম থিয়েটার সন্দর্শন তাহা নহে, নাট্যানুশীলন ও অভিনয় দর্শনে তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তবে সেইদিন হইতে আমার দর্শনস্পৃহা বাড়িয়া গেল।'

অভিনয়মাধুরীতে দর্শকসংখ্যা সংবর্দ্ধন বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, এইবার একখানা গীতি নাটক (অপেরা) অভিনয় করিয়া দেখিবেন, তাহাতে দর্শক সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় কি না। তিনি এক খানি ভালো গীতিনাট্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। থিয়েটার লইয়া তখন তিনি এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজে যে লিখিবেন এমন অবকাশ তাঁহার আদৌ ছিল না, অথচ একখানি গীতিনাট্যের নিতান্ত প্রয়োজন। হরিরাজের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও দর্শক হয় নাই, এ অবস্থায় তিনি আর নাটক অভিনয় করিতে সাহস করিতেছিলেন না। কিন্তু তখন থিয়েটারে দর্শকের অভাব এমনই হইয়াছিল যে যাহা হউক একখানা কিছু নূতন পুস্তক আর না হইলেই নয়, অথচ তখন সুবিধা মত গীতিনাট্য হাতে নাই। কাজে কাজেই অমরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া আবার গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকের অভিনয় করিতে হইল। "হারানিধি" নাটকে অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভূমিকাটি তিনি এরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছিলেন যে, উহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি কোনদিন তাহা ভুলিতে পারিবেন না। "অন্ধ নাচার বাবা" ও "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্"—এই দুইটী উক্তি তিনি এমন ভাবে আবৃত্তি করিতেন যে মনে হইত সত্যই বুঝি একজন অন্ধ নাচার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমরা অমরেন্দ্রনাথের "হারানিধি" নাটকে অঘোরের ভূমিকা দেখিয়াছি। সে অভিনয় আজিও আমাদের প্রাণের ভিতর একটা চিরস্থায়ী দাগ টানিয়া দিয়া কানের ভিতর ঝঙ্কার দিতেছে। যাঁহারা "হারানিধি"তে অমরেন্দ্রনাথের অঘোরের ভূমিকা দেখিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে অমরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন প্রতিভাবান্ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

কেবল অমরেন্দ্রনাথের উপরই 'জন্ম-অভিনেতা' এই আখ্যাটি প্রযোজ্য। কেননা আমাদের দেশে যাঁহারাই অভিনয় করিয়াছেন (অর্থাৎ অন্য যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়াছেন,) বা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই একজন না একজন অভিনয়-গুরু ছিলেন অর্থাৎ অভিনয় বিদ্যা তাঁহারা একজন না একজনের নিকট শিখিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথের কেহ গুরু ছিল না। তাঁহার সংস্কার জন্মগত,—প্রাক্তনার্জ্জিত ভগবদ্দত্ত তাঁহার যে প্রতিভা ছিল তাহা আপনিই বিকশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

হারানিধি নাটকে অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকায় একটী সম্পূর্ণ প্রাণস্পর্শী নূতন ছবি দেখাইলেও দর্শক তেমন জুটিল না। আমাদের মনে হয় তাহার একমাত্র কারণ ক্লাসিক থিয়েটারে "হারানিধি" অভিনয় হইবার বহু পূর্ব্বে "হারানিধি" নাটক ষ্টার থিয়েটারে অনেকবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ষ্টার থিয়েটারে "হারানিধি" নাটকে অঘোরের ভূমিকা Captain Bell (বেলবাবু) গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলবাবুর ন্যায় অভিনেতা অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অঘোরের ভূমিকা অভিনয় করিয়া উক্ত ভূমিকাটি একরূপ জ্বালাইয়াই দিয়াছিলেন। অন্য অভিনেতা সে ভূমিকা গ্রহণ

করিতেই সাহস করিত না। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ সেই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। এই অঘোরের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ ও বেলবাবুর মধ্যে কাহার অভিনয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল এ কথা বলা বড় কঠিন। এ সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ষ্টার থিয়েটারে যখন প্রথম "হারানিধি" খোলা হয় তখন বেল দাদা (Captain Bell) অঘোরের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। তেমন স্বাভাবিক অভিনয় বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই অঘোরের ভূমিকায় যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত এবং সর্ব্বজন বিদিত। আমার বিশ্বাস Captain Bell ও অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকাভিনয়ে কেহই উনিশ বিশ ছিলেন না। কি সুন্দর জীবন্ত ছবি! আমি জীবনে তাহা ভুলিব না।"

যাহা হউক হারানিধি দাঁড়াইল না। একটা রঙ্গালয় চালাইতে হইলে প্রত্যহই টাকার প্রয়োজন। এ অবস্থায় যদি বই না দাঁড়ায় তাহা হইলে স্বত্বাধিকারীকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটার ভাড়া লইয়াছিলেন তখন তাঁহার হস্তে একটী পয়সাও ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে থিয়েটার খুলিলেই পয়সার সচ্ছল হইবে। থিয়েটার খোলা হইল, অথচ দর্শক নাই। পয়সার আমদানী নাই, অথচ প্রতিদিনই পয়সার প্রয়োজন। অমরেন্দ্রনাথ মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আর এক দিনও সময় নষ্ট করা যায় না। এখন যেমন করিয়াই হউক যত শীঘ্র সম্ভব একখানা নূতন পুস্তক খুলিতেই হইবে, কেন না সত্বর কিছু টাকা না হইলে তিনি আর থিয়েটার কিছুতেই রাখিতে পারেন না। এখন নূতন পুস্তক পাওয়া যায় কোথায়? সে সময় নানা ঝঞ্ঝাটে তাঁহার মনের এমন অবস্থা হইল যে নিজে যে কোন পুস্তক লিখিবেন তাহারও উপায় ছিল না। দুই একখানা নূতন নাটক তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু নাটক খুলিতে কেমন যেন তাঁহার মন সরিতেছিল না, কাজেই তিনি তানানা করিয়া সময় কাটাইয়া দিতেছিলেন। বিধিলিপি খণ্ডন হইবার নয়। বিধাতাপুরুষ সূতিকাগারে যাহার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা শত প্রলয়েও ওলোট পালট হইবার নয়। অভিনয় কলার একটা নূতন দিকে আলো দিবার জন্যই অমরেন্দ্রনাথের আজন্ম কামনা—তাঁহার প্রাণের বাসনা কি কখন অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে। "যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ. মহাশয় "আলিবাবা" নামক একখানি অপেরা লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। লোক পরম্পরায় এ কথা অমরেন্দ্রনাথের কানে আসিল। ক্ষীরোদবাবুর অপেরা খানির কথা শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ সেই পুস্তকখানি ক্ষীরোদবাবুর নিকট হইতে লইয়া আসিলেন এবং উহা ছাটিয়া কাটিয়া বাড়াইয়া সম্পূর্ণ অভিনয়োপযোগী করিয়া লইয়া মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহোৎসাহে মহালা চলিতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককেই বলিয়া দিলেন যে, "আগামী

শনিবারে এই অপেরাখানা খোলা চাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যাহাতে সকলে প্রস্তুত হইতে পারে সে বিষয়ের উপর সকলেরই যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। আগামী শনিবারে প্রথম অভিনয় হইবে।" কাজেই আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া কেবলই দিন রাত উহার মহালা চলিতে লাগিল। সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ যখনই থিয়েটারে আসিতেন তখনই দেখিতেন, কেবলই সখীদিগের নাচ ও গান চলিতেছে। পরের কষ্ট অমরেন্দ্রনাথ আদৌ দেখিতে পারিতেন না,—পরের কষ্ট দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সখীগণের এই নিদারুণ পরিশ্রম দেখিয়া তিনি মহাবিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখনই তাঁহার সম্প্রদায়ের অপেরা মাষ্টারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখনই থিয়েটারে আসি, দেখি এরা সবাই নাচিতেছে,—ব্যাপার কি! এরা কি বাড়ি টাড়ি যায় না?"

অপেরা মাষ্টার উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আগামী শনিবার আলিবাবা খুলিতে হইবে,—এ সময় যদি এরা বাড়ি যায় তাহা হইলে কি আর নূতন বই শনিবারে খোলা যাইবে?"

অপেরা মাষ্টারের কথায় অমরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া গেলেন,—বেশ একটু বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা খেলে কি?"

অপেরা মাষ্টার অপ্রস্তুতভাবে আবার উত্তর দিলেন, "বাজার থেকে জল টল খাবার আনিয়ে দেওয়া হয়েছে,—তাই সবাই খেয়েছে।"

এই সকল ক্ষুদ্র, সুকুমার বালিকাদের ওপর এরূপ অত্যাচার অমরেন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অমনি অপেরা মাষ্টারকে বলিলেন, "এখনই উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। শুধু বাজারের জলখাবার খাইয়া মানুষে কখনও এত পরিশ্রম করিতে পারে! কালি হইতে সবাই যেন আহারান্তে আসিয়া রিহার্সাল দেয়। এমন করিয়া অনাহারে রিহার্সাল দিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাতে বই শনিবারে অভিনয় হউক আর নাই হউক্।"

এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে অমরেন্দ্রনাথ গরীবের মা বাপ ছিলেন। কাহারও উপর কেহ যে উৎপীড়ন করে, বা তাঁহার জন্য যে কেহ উৎপীড়িত হয়, তাহা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। উপরিলিখিত ঘটনাটি হইতে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বলেন, উপরিলিখিত ঘটনাটি আলিবাবার মহালার সময় হয় নাই, অমরেন্দ্রনাথের স্বরচিত একখানি কৌতুক নাট্যের মহালা হইবার সময় ঘটে। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"যখন ক্লাসিক থিয়েটার জমিতেছিল, সেই সময় এক ববিবার রাত্রে তিনি নৃত্য শিক্ষক ও সঙ্গীত শিক্ষককে বলেন যে, আমি আজ যে কৌতুক নাটকখানি লিখিয়া

শেষ করিয়াছি,—আগামী ১লা সোমবার দিনের বেলা হইতে তাহার রিহার্সাল আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শনিবারেই তাহার অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহারা তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সোমবার বেলা তিনটার সময় অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারে আসিয়া দেখিলেন, নূতন নাটকের নাচ গান শিক্ষা চলিতেছে, কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়া, সন্ধ্যার সময় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও দেখেন নাচ গান চলিতেছে। নৃত্য শিক্ষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বালিকারা কাজ করিতেছে দেখিয়া গিয়াছিলাম, ইহার মধ্যেই আবার উহাদিগকে আনাইয়াছ?"

নৃত্যশিক্ষক উত্তর দিলেন, "উহাদিগকে আদৌ ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।"

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের আহারাদির কি ব্যবস্থা হইয়াছিল?"

উত্তরে শুনিলেন, "বাজার হইতে মিষ্টান্নাদি আনাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

অমরেন্দ্রনাথ বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "কি! ইহারা পরশু ও গতকল্য সমস্ত রাত্রি অভিনয় করিয়াছে। এখনও ইহাদের পেটে অন্ন পড়িল না! এখনই ইহাদের ছাড়িয়া দাও; আর বলিয়া দাও কালি হইতে ভাত খাইয়া বেলা দুইটার সময় আসে।"

নৃত্যশিক্ষক কহিলেন, "তাহা হইলে আগামী শনিবারে নূতন পুস্তক অভিনয় করা অসম্ভব।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অভিনয় না হয় আর এক কি দুই সপ্তাহ পিছাইয়া যাইবে। দুগ্ধপোষ্যা বালিকা বধ করিয়া আমি ব্যবসায় চালাইতে চাহি না।"

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকা গাড়ী ডাকাইয়া বালিকাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অনেক সময় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিনেতা বা কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিতে হইয়াছে, পরে তাহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া স্বয়ং ডাকাইয়া আবার তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্যে বাহাল করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা বিরল নহে।"

রীতিমত মহালা দিয়া যথাসময়ে অমরেন্দ্রনাথ "আলিবাবার" অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। "আলিবাবা"য় অমরেন্দ্রনাথ হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আলিবাবা সাজিয়াছিলেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য "কাসিমের" ভূমিকা লইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নৃপেনচন্দ্র বসু "আবদালা" ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী মর্জ্জিনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সাকিনার" ভূমিকা শ্রীমতী ভূষণকুমারীকে প্রদান করা হইয়াছিল। যে রাত্রে ক্লাসিকে আলিবাবার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, সে রাত্রে দর্শক অধিক না হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। অভিনয়ও হইয়াছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর। অমরেন্দ্রনাথ হোসেন সাজিয়া একটা নূতন ছবি দেখাইয়াছিলেন! আলিবাবার হোসেনের ভূমিকা নামমাত্র বলিলেই হয়, কিন্তু সেইটুকুর ভিতরই অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে বেশ একটী বিশেষত্ব ছিল। আলিবাবার অভিনয় আজি পর্য্যন্ত সমস্ত থিয়েটারেই হইতেছে। বহু অভিনেতা পুনরায় এই

হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মত তেমনটি কাহারও হয় নাই। যাঁহারা অমরেন্দ্রনাথের হোসেনের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন ও অন্যান্য অভিনেতার ঐ ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব অননুকরণীয় ভাব উদ্ভাসিত।

"আলিবাবা" অভিনয়ের প্রথম রাত্রে দর্শক সংখ্যা খুব অধিক না হইলেও এই অপেরার সুখ্যাতি অতি শীঘ্রই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলিবাবা অভিনয়ের সুখ্যাতি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিকের দর্শক সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ হইল। শেষে এমন হইল যে ক্লাসিকের ন্যায় অত বড় থিয়েটারেও দর্শকের স্থানাভাব হইতে আরম্ভ হইল। আলিবাবা অভিনয়ের প্রতি রাত্রেই বহু সংখ্যক দর্শক স্থানাভাবে নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথেরও ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। এক আলিবাবা অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ লক্ষ মুদ্রার অধিক লাভবান্ হইলেন। ক্লাসিকের মহাগৌরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হাটে বাজারে সর্বত্রই এক কথা—অমর দত্ত আর ক্লাসিক থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য সে সময় তাঁহার থিয়েটারে যেরূপ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ করিয়াছিলেন সেরূপ সমাবেশ আর কখনও কোন রঙ্গালয়ে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তখন ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, দানীবাবু, পণ্ডিত হরিভূষণ, অঘোর পাঠক, নৃপেন বসু, হীরালাল, অহীন্দ্র, সঙ্গীতাচার্য্য দেবকণ্ঠ বাগচী বংশীবাদক অমৃতলাল ঘোষ, হারমোনিয়াম শিক্ষক ভূতনাথ দাস, স্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর ও আশু পালিত, শ্রীমতী তিনকড়ি, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী, শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী ভুবনমোহিনী, শ্রীমতী রাণীসুন্দরী (বড়), শ্রীমতী ফিরোজবালা প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিরাজমান।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন প্লেগ কলিকাতায় দর্শন দেয় সেই সময় ক্লাসিক থিয়েটার মহা গৌরবে চলিতেছিল। প্লেগের আগমনে কলিকাতাবাসিগণ মহাতঙ্কে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সে সময়ে অনেককেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য পাইয়া অনেক দরিদ্র পরিবার সে সময় মহাবিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে, যখন প্লেগের আতঙ্কটা একটু কমিয়াছে সেই সময়, গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবগৌরব নাটকের অভিনয় ক্লাসিক থিয়েটারে মহাসমারোহে আরম্ভ হইল। "পাণ্ডব গৌরব" নাটকে অমরেন্দ্রনাথ ভীমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ভূমিকায়ও তিনি বিশেষ নাম পাইয়াছিলেন। "পাণ্ডব গৌরবের" ভীমের কথাটা মনে হইলেই আপনা হইতে অমরেন্দ্রনাথের কথা মনের ভিতর জাগিয়া উঠে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ, যখন পাণ্ডব গৌরবের অভিনয় ক্লাসিক থিয়েটারে পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল, তখন গিরিশচন্দ্র, ক্লাসিকের আশাতীত ধনাগম দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথকে বলেন, "আমার জন্যই তোমার থিয়েটার এমন চলিয়াছে। আমি না থাকিলে, ক্লাসিক কখনও এমন গৌরবে পরিচালিত হইত না। সুতরাং তোমায় আমাকে লাভের একটা অংশ প্রদান করা উচিত, তাহা না হইলে আমি তোমার থিয়েটারে থাকিতে পারি না।" কিন্তু স্বাধীনচেতা অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি আমার থিয়েটারের শিরোরত্ন; বস্তুতঃ বাঙ্গালার নাট্যজগতের কোহিনুর। আপনার পরিচালনায় এইসব অভিনেতৃকুলমণিদের প্রতিভারশ্মিতে আমার থিয়েটার আজি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। তবে আপনার অতিরিক্ত লভ্যাংশের দাবী করা ঠিক উচিত কি? ব্যবসায়ের হিসাবে আবার দুর্দিন আসা কতক্ষণ? তখন কি করিয়া চালাইব? আমায় মাপ করিবেন, প্রাপ্য দেয়াতিরিক্ত লাভের অংশ দেওয়া অসম্ভব।" সেই কথা শুনিয়া গিরিশচন্দ্র বেশ বিরক্তি অনুভব করিলেন, ইতিপূর্ব্বে এরূপ কথা তিনি কখনও কাহারও নিকটে শুনেন নাই। তখন ২৪পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি কিছু টাকা রোক দেওয়ায় ক্লাসিক হইতে গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী তিনকড়ি প্রভৃতিকে লইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিলেন। গিরিশচন্দ্র যে দিন ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করেন, সে দিন দোল, কলিকাতায় সর্ব্বত্র আবিরের ছড়াছড়ি চলিতেছিল।

গিরিশচন্দ্র সহসা মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করায় অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, "গিরিশবাবুর এ কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে, আপনি তাঁর নামে নালিশ করুন।"

অমরেন্দ্রনাথ তখন অপরিণামদর্শী যুবক মাত্র। পার্শ্বচরগণের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের নামে মামলা রুজু করিলেন। মামলা চলিতে লাগিল। দুই পক্ষের যে কিছু কিছু খরচ হইল না তাহা নহে। শেষ মামলায় অমরেন্দ্রনাথের পরাজয় হইল। গিরিশচন্দ্র মামলায় জয়লাভ করিয়া মিনার্ভার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু ক্লাসিকের গৌরব তাহাতে বিশেষ কিছুই ক্ষুণ্ণ হইল না। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক প্রায় সেইরূপ পূর্ব্ব গৌরবেই চলিতে লাগিল।

পঞ্চম উল্লাস

অদৃষ্টলীলা

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথও রাত্রিমধ্যে সীতারাম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া সপ্তাহকাল মাত্র মহালার পর ক্লাসিকে অভিনয় করিতে লাগিলেন। মিনার্ভায় সীতারামের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং ক্লাসিকে সীতারাম সাজিলেন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্রের সহিত এই প্রতিযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ হাস্যাস্পদ হন নাই। অমরেন্দ্রনাথের সীতারামের ভূমিকার অভিনয় যে মন্দ হয় নাই এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'ইহার পর গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম' নাট্যাকারে পরিণত করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথও সীতারাম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ক্লাসিকে অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তখন ক্লাসিকের হ্যাণ্ডবিলে সদর্পে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, "ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা—স্থবির নহে।" মিনার্ভা থিয়েটারে সীতারাম স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ। গুরু শিষ্যে সমরে স্রোত চলিতে লাগিল। এইভাবে কয়েক মাস অতীত হইল, তাহার পর গিরিশচন্দ্র আবার তিনকড়ি ও সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ক্লাসিকে যোগদান করিলেন। আবার ক্লাসিক অপ্রতিহত প্রতাপে রঙ্গলীলায় প্রবৃত্ত হইল।"

যখন ক্লাসিক থিয়েটারের যশোগৌরব শিখরদেশে উপনীত, সেই সময়, ১৩০৮ সালে, অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন। বঙ্গ রঙ্গালয়ের মুখপত্র হইয়া "রঙ্গালয়" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। "রঙ্গালয়" পত্র আইভরিফিনিস কাগজে মুদ্রিত হইত। রঙ্গালয় পত্রিকায় কাগজ, ছাপা, লেখা সমস্তই যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রঙ্গালয় পত্রিকার সহিত ক্লাসিক

থিয়েটারের অভিনীত নাটকাবলীর বিবিধ চিত্র আর্ট পেপারে মুদ্রিত হইয়া গ্রাহকগণকে উপহার প্রদান করা হইত। রঙ্গালয় পত্রিকার ব্যয় যে পরিমাণে হইতেছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম ছিল। প্রতি খণ্ড দুই পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইত, অথচ তাহাতে প্রায় ছয় পয়সা খরচ হইত, কাজেই ছয় বৎসর পত্রিকা বাহির করিবার পর অমরেন্দ্রনাথ এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দিলেন। কেবল সাধারণের নাট্যানুরাগ বৃদ্ধি ও নাট্যশিল্পের উন্নতি বিধানের নিমিত্তই অমরেন্দ্রনাথ বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও প্রায় ছয় বৎসর ওই পত্রিকা চালাইলেন; কিন্তু যখন ক্ষতির পরিমাণ ষট্‌সহস্র মুদ্রায় উঠিল, তখন অমরেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া ঐ পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তবাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমাদের কালু—ছেলে বেলা হইতে যাহাকে দেখিয়াছি,—প্রথম যৌবনে যাহাকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি,—পরে যাহার অধীনে চাকরী লইয়া রঙ্গালয় সম্পাদন করিয়াছি,—সেই কেলো,—সেই অমর, চল্লিশ বছর হইতে না হইতেই চলিয়া গেল! বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া মনিবের উপর হুকুম চালাইবার অধিকার আমরা কেবল অমরেন্দ্রনাথের কাছেই পাইয়াছিলাম। তাহার অগ্রজের সখা বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঠিক অগ্রজের ন্যায় ভয় করিত, ভক্তি করিত। * * * * থিয়েটারের কার্য্যে অমরেন্দ্রনাথ অনেক নূতন পদ্ধতির প্রবর্তক। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের মুখপত্র স্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়াছিল, বাঙ্গালা থিয়েটারের জন্য একটা 'লিটারেচর' সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছিল। যে হিসাবে সোমপ্রকাশের ঁদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও হিন্দু পেটরিয়টের ঁকৃষ্ণদাস পাল আমাদের স্মরণযোগ্য, সেই হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণযোগ্য। * * * * অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি, অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। সাজ পোষাক দৃশ্যে, নূতন অভিনয় ভঙ্গীতে, অমরেন্দ্র অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অচিরেই দর্শকের চিত্ত বিনোদনের সুব্যবস্থা করিয়াছিল।"

পদস্থ রাজপুরুষগণকে দেশীয় নাট্যশালায় আনিবার অমরেন্দ্রনাথই প্রথম পথ প্রদর্শক। তিনিই প্রথম বঙ্গেশ্বরকে ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তাঁহার থিয়েটারে আমন্ত্রিত করেন। বঙ্গেশ্বর প্রথম আসিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু থিয়েটার বিদ্বেষী কয়েকজন লোকের আপত্তিতে তিনি থিয়েটারে আইসেন নাই। কিন্তু মাননীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসিয়াছিলেন। নাট্যশালা যে একটা ঘৃণার সামগ্রী নহে, কিন্তু সুকুমার ললিতকলাশিক্ষা মন্দির, অমরেন্দ্রনাথ নানাভাবে এইকথাই দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের থিয়েটার নানা কারণে বন্ধ হইয়া গেলে অমরেন্দ্রনাথ, ১০ই মে, মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে উক্ত রঙ্গালয় সত্ত্বাধিকারী প্রিয়নাথ দাসের নিকট হইতে ভাড়া লইলেন এবং এক সঙ্গে দুই থিয়েটার চালাইবার

জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি সর্বশুদ্ধ ৭৫০ টাকা ব্যয় করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার খুলিয়া দিলেন। ১৯০০খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথ পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে রঘুবীর নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হইল। রঘুবীর নাটকখানি শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ. মহাশয়ের রচিত। এই নাটকে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং রঘুবীরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুবীর অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ রীতিমত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় প্রত্যেক বাঙ্গালীই অমরেন্দ্রনাথের নামের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া অমরেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে ও শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ সরকার নামে দুইটী ভদ্র লোককে মিনার্ভা থিয়েটারের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসদের সহিত অধিক দিন অমরেন্দ্রনাথের সদ্ভাব রহিল না। কোন কারণ বশতঃ হঠাৎ একদিন অমরেন্দ্রনাথের সহিত দুর্গাদাসের প্রকাশ্য বিবাদ আরম্ভ হইল। খুলনার উকীল শ্রীযুক্ত বেণীভূষণ রায়ও মিনার্ভা থিয়েটারের তখন একজন মাতব্বর ছিলেন। তিনি দুর্গাদাস বাবুর পক্ষাবলম্বন করিতেন। অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবটা ছিল একরোখা। তিনি জীবনে কখন কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন চিরকাল তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। দুর্গাদাস বাবু ও বেণী বাবুর সহিত অমরেন্দ্রনাথের বিবাদ এমনই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, যে অমরেন্দ্রনাথ পুলিশের সাহায্যে মিনার্ভার 'পজেসন' লইয়া, থিয়েটারের সমস্ত জিনিষপত্র মায় পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত ক্লাসিক থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। এক সঙ্গে দুই থিয়েটার পরিচালনার ইচ্ছা এই এক ঘটনাতেই অমরেন্দ্রনাথের চিরকালের মত ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২০ শে জুলাই অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার লিজ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নামে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। মনোমোহন বাবু তাঁহার প্রিয় বন্ধু হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল অদ্ভুত নাট্যপ্রতিভাবান্ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্তবাবু চুণিলাল দেবকে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে বরণ করিলেন। চুণি বাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হইয়া টিকিট বিক্রয় বাড়াইবার এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। মহেন্দ্রবাবুর উপদেশে তিনি বসুমতী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া অভিনয়ের সহিত পুস্তক উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই প্রথম থিয়েটারে উপহার বিতরণের প্রারম্ভ। উপহার পুস্তক গ্রহণের জন্য মিনার্ভায় লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, কাজেকাজেই ক্লাসিকের বিক্রয় কম পড়িতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও তাঁহার থিয়েটারে উপহার বিতরণের বন্দোবস্ত করিলেন। যে উপহার বিতরণে মিনার্ভার ভাগ্য ফিরিল, সেই উপহার বিতরণেই ক্লাসিকের সর্বনাশ হইয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথ চিরকালই অপব্যয়ী ছিলেন, তাহার উপর উপহার

বিতরণ প্রভৃতি নানাকাণ্ডে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথকে এই সময় বাধ্য হইয়া দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতে হয়। ক্লাসিক থিয়েটার হইতে ন্যূন পক্ষে অমরেন্দ্রনাথ প্রায় দশলক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এমনই অপব্যয় যে তথাপি তাঁহার দেড়লক্ষ টাকা তখন ঋণ। মহমান্য হইকোর্টের বিচারে এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় ক্লাসিক থিয়েটারের রিসিভার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু স্বাধীন চেতা অমরেন্দ্রনাথ রিসিভারের বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার বড় সাধের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তবাবু মতীন্দ্রনাথ সরকার যাহা লিখিয়াছেন পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

দুটি প্রাণ গীতিনাট্যে সুন্দরের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

"মিনার্ভা থিয়েটার গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে স্বনামখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন। চুণিবাবু তখন মিনার্ভার অন্যতম অংশীরূপেও আহূত হইয়াছিলেন। তখনও প্রবল প্রতাপে ক্লাসিক চলিতেছিল। ক্লাসিকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সাধ্য বা সামর্থ্য তখন ক্ষুদ্র মিনার্ভার ছিল না। এখন থেস্‌পিয়ান টেম্পলের যে অবস্থা, মিনার্ভার অবস্থাও তখন সেই প্রকার ছিল। চুণিবাবু এই সময় মিনার্ভাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বসুমতীর' সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের সহিত পুস্তক উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। থিয়েটারে বসুমতীর পুস্তক উপহার বোধ হয় এই প্রথম। প্রথম উপহার মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী। এই ব্যবস্থার প্রথম দিন মিনার্ভায় লোকারণ্য হইল—যেখানে একশত দেড়শত টাকা বিক্রয় হইতেছিল, সেখানে দেড় সহস্র টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। স্থানাভাবে কাতারে কাতারে লোক ফিরিয়া গেল। বিডন স্ট্রীটে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

মিনার্ভায় নূতন নূতন বিক্রয়ের তোড়ে, ক্লাসিকের বিক্রয় যে কমিয়া গেল এ কথা বলাই বাহুল্য। অমরেন্দ্রনাথ অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনিও উপহার দিবার বিরাট্ আয়োজন করিলেন। তিন গুণ অধিক মূল্য দিয়া তিন দিনের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী ছাপাইয়া উপহার দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন কেবল উপহারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। এই উপহারই ক্লাসিকের কাল হইল—এই উপহারের জন্যই অপরাজেয় ক্লাসিকের পতন হইল। নির্বাণোন্মুখ মিনার্ভা উপহারের কল্যাণে যেমন শনৈঃ শনৈঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল, চলতি থিয়েটার ক্লাসিক পক্ষান্তরে উপহারের ধাক্কা সামলাইতে গিয়া তাহার অমূল্য ইজ্জত হারাইল,—ক্রমশঃ জনহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ফলতঃ উপহার ক্ষুদ্র মিনার্ভাকে উন্নত করিল এবং বিডন স্ট্রীট কেশরী ক্লাসিককে বাগুরায় আবদ্ধ করিল।"

অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিবার সংবাদ অচিরে ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহারই মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সহসা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দেওয়ায় সকলেই মনে মনে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এক অপূর্ব প্লাকার্ড সমস্ত কলিকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে পড়িয়া সমস্ত কলিকাতাবাসীকে মহা বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে জানিবার জন্য সকলেই যেন একটু উৎসুক হইয়া পড়িল। সেই প্লাকার্ডে লেখা ছিল,—

"গ্রাণ্ড থিয়েটার!

রহ প্রতীক্ষায়—কবে? কোথায়?

ইহার কিছুদিন পরেই বড় প্লাকার্ডে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের বিস্তৃত ব্যাপার বাহির হইল। কলিকাতাবাসীরাও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। লোকে দেখিল অমরেন্দ্রনাথ হ্যারিসন রোডের কর্জ্জন থিয়েটার ভাড়া করিয়া নব কলেবরে আবার নূতন থিয়েটার খুলিতেছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে বৈশাখে শ্রীযুক্তবাবু মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত পৃথ্বীরাজ নাটক লইয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের দরজা খুলিলেন। অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলিলেন তখন শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ব্যতীত আর কোন নাম করা অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহার থিয়েটারে ছিলেন না। "পৃথ্বীরাজ" নাটক ও "ঘুঘু" প্যাণ্টোমাইন মহাসমারোহে অভিনীত হইল। অভিনয়ও অতি উচ্চ অঙ্গের হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং পৃথ্বীরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মানুষের যখন সময় খারাপ পড়ে তখন কিছুতেই কিছু হয় না। এত সমারোহে এত বিজ্ঞাপন করিয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলিলেন বটে, কিন্তু প্রথম রাত্রে দর্শক তেমন হইল না। প্রথম রাত্রেই দর্শক ভাল না হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পৃথ্বীরাজ নাটকখানি মুদ্রিত করিয়া থিয়েটারের অভিনয়ের সহিত বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও দর্শক সংখ্যা বিশেষ বাড়িল না। তখন তিনি আবার "বসুমতী"র সহিত বন্দোবস্ত করিয়া গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে উপহারের ছড়াছড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই উপহার বিতরণের ঘটায় যখন সবে কেবল গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় ক্লাসিক থিয়েটারের রিসিভার শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র রায় ক্লাসিক থিয়েটার চালাইতে অক্ষম হইয়া অমরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথ তখনও ক্লাসিক থিয়েটারের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহার উপর আবার অতুল বাবুর জেদাজেদি; কাজেই তাহাকে আবার ক্লাসিক থিয়েটারে আসিতে হইল। তিনি মাসিক ৫০০ শত টাকা বেতনে ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ

করিলেন। এই তাঁহার থিয়েটারে প্রথম বেতন গ্রহণ। ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিয়া অমরেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "প্রণয়-পরিণাম" নামক উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিণত করিয়া "প্রণয়—না—বিষ" নামে অভিনীত করিলেন। উহাতে অমরেন্দ্রনাথ "রমা" পাগ্‌লার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটিতে অমরেন্দ্রনাথ এমন একটা বৈচিত্র্য দেখাইয়াছিলেন, যে সাধারণ অভিনেতার নিকট হইতে সেরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয় কখনও কোন দেশে আশা করা যায় না।

অমরেন্দ্রনাথ ম্যানেজার হইয়া আবার ক্লাসিকে আসিলেন বটে, কিন্তু ক্লাসিকের ভাগ্য আর পরিবর্ত্তিত হইল না। উহার প্রধান কারণ তখন শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম. এ. বি. এল. মহাশয়ের সাহায্যে, প্রকাশ্য নীলামে ষাট হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার খরিদ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর একটা বিরাট সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমাবেশ সম্বন্ধে মতীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন,—

"কিন্তু সেই সময় ভাগ্যবান্ মনোমোহন পাঁড়ে, বিচক্ষণ উকিল মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সহায়তায়, ষাট হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার ক্রয় করিয়া অষ্টবজ্র সম্মিলন করিয়াছেন—গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, দানী, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, সুশীলাবালা প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের সমাবেশ হইয়াছে।"

ক্লাসিক থিয়েটারে সুবিধা করিতে না পারিয়া অমরেন্দ্রনাথ আবার গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে যোগ দান করিলেন। কিন্তু তখন দিবারাত্র পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারেরও সঞ্চালন-শক্তি বিনষ্ট হইয়া পড়িল,—তাহার বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া গেল।

ক্লাসিক থিয়েটার খুলিবার পর অমরেন্দ্রনাথ তথায় নানা নাটকে নানা ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর তাঁহার হরিরাজ নাটকে "হরিরাজ", হারানিধি নাটকে "অঘোর", আলিবাবায় "হোসেন", প্রফুল্লে "ভজহরি", পাণ্ডব গৌরবে "ভীম", ও ভ্রমরে "গোবিন্দলালের" ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরি লিখিত ভূমিকাগুলির অনেকগুলিই তাঁহার পূর্বে ও পরে বহু অভিনেতা বহুবার অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ যেমনটি করিয়াছিলেন তেমনটি হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উপরি লিখিত ভূমিকাগুলিতে তিনি যে সকল বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন তাহা দেখান অন্য অভিনেতার সাধ্যের বাহিরে। অমরেন্দ্রনাথ যখন ভ্রমরে "গোবিন্দলালের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, তখন দর্শকগণের প্রাণের ভিতর যেন একটা নূতন হর্ষ জাগিয়া উঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত গোবিন্দলাল, মনে হইত, যেন সজীব হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক, এত মধুর অভিনয় যে হইতে পারে তাহা লোকের ধারণার অতীত। যে দৃশ্যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে

গুলি করে, সেই সময় গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথের যে মুখ চোখের ভঙ্গী হইত তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই জানেন কত স্বাভাবিক, কত সুন্দর। তাঁহার অভিনয় যিনি দেখিয়াছেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অমরেন্দ্রনাথ ভগবান্ প্রদত্ত একটা অসীম প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি অমরেন্দ্রনাথ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই রোগ এমন সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ করিল যে তাঁহার আর জীবনের আশা রহিল না। কেবল তাঁহার সাধ্বী পত্নীর প্রাণপণ শুশ্রূষায় তিনি আবার জীবন ফিরিয়া পাইলেন। সাধ্বী পতিপ্রাণা যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া পতিকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। অমরেন্দ্রনাথ রোগমুক্ত হইয়া পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিলেন। পশ্চিমে কয়েক মাস থাকিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি তাঁহার পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া সংসারী হইলেন। পত্নীর যত্নে ও শুশ্রূষায় তিনি যে প্রাণ পাইয়াছিলেন সে কথা অমরেন্দ্রনাথ একটী কবিতায় নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পাঠক পাঠিকা'র অবগতির জন্য সেই কবিতার কয়েকটি বিহ্বলতা পূর্ণ কলিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

(১)

"শান্ত ক্লান্ত, অবিশ্রান্ত ব্যাধির তাড়নে,—
শয্যা সনে দেহ যষ্টি লীন।
হয় মনে প্রতিক্ষণে—কাল হুতাশনে
হয় বুঝি হয় বা বিলীন!
মিটি মিটি গৃহ কোণে, জ্বলে দীপ সকরুণে,
প্রেতকায়া সম ছায়া—নেচে নেচে ওঠে।
সন্ধ্যার গাম্ভীর্য তাহে আর (ও) যেন ফোটে।।

(২)

হতভাগ্য যুবা ওই,—বিধির বিধানে—
ঐশ্বর্য্যের ছিল অধিকারী।
শত শত চাটুকার স্তুতিবাদ গানে—
জনে জনে দিত বলিহারী।।
ছিল বারনারী রত, মদ্যপান অবিরত,
দিবা নিশি আনন্দের উচ্চ কোলাহল,
মুখরিত রাখিত সে রম্য হর্ম্ম্যতল।।

(৩)

গিয়াছে সেদিন—মাত্র আছে কল্পনায়,
এবে যুবা কপর্দক-হীন!
জীর্ণ গৃহে শীর্ণ দেহে শয়িত শয্যায়,
সমাগত সমাধির দিন!!
পাত্র মিত্র আত্মজন, করিয়াছে পলায়ন,—
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস দিগন্তে প্রসারি,
কহে যুবা—'বড় তৃষা—এক বিন্দু বারি।।'

(৪)

আর্দ্রবস্ত্রে ত্রস্তপদে কে তুমি সুন্দরী,
সন্ধ্যার আঁধার লয়ে বুকে!
বারিপাত্র লয়ে করে—আহা মরি মরি,
পশ' গৃহে—ধীরে অধোমুখে!
কে গো তুমি কমলিনী, মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী,
দিব্য কান্তি জ্যোতিহীন মলিন-বসনা,
স্বভাবে অভাবে যেন বিরাগে মগনা।।

(৫)

চিনেছি চিনেছি তুমি পতিব্রতা সতী,
হিন্দুজাতি গৌরবের ধন!
সংসার সাগরে তুমি একমাত্র গতি,
ধ্রুবতারা অমূল্য রতন!
তোমারি করুণা বলে, পাষাণে অমৃত গলে,
তুমি আছ,—আছে তাই চন্দ্র সূর্য্য ভাতি,
গগনে এখনও জ্বলে তারকার বাতি।।

(৬)

তৃষা দূর করি যুবা ধীরে ছাড়ে শ্বাস,
দু-নয়নে বহে বারিধারা।।
মুগ্ধ প্রায় চেয়ে রয়—নাহি সরে ভাষ!
মত্ত চিত্ত সত্য আত্মহারা!!
শুষ্ককণ্ঠে—"মায়া"! দূর অতীতের ছায়া,
স্মৃতির বৃশ্চিক জ্বালা—করি সহচর!
বিষম দংশনে অঙ্গ—করে জ্বর জ্বর!!

(৭)

সম্পদের সাথী যত সবে পলায়িত!
এ জীবন মরুভূমি প্রায়!
গুপ্ত ছুরী স্বার্থ সনে সযত্নে রক্ষিত,
অসময়ে কেবা মুখ চায়?
কুহকিনী কুহুস্বরে,—সঁপি প্রাণ অকাতরে,
বারে বারে সুধাইত—ভালবাস তুমি?
তুমি যদি ভালবাস—স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি!!

(৮)

মনে আছে সেই দিন—দিনান্তে যখন,
কান্তপদ মাগিতে দর্শন।
ভ্রান্ত-মদে মুগ্ধ-মন—এই অভাজন,
হেলায় ঠেলিত আকিঞ্চন!!!
ভাবি নাই একবার, বিষময় এ সংসার,
মূর্তিমান ছলনার-রঙ্গ-রঙ্গালয়!
চলিতেছে শুধু সেথা পাপ-অভিনয়!!

(৯)

ছায়া-দেহী সম যত অভিনেতাগণ!
নানা সাজে করে আগমন!
বন্ধুবেশে হেসে হেসে আসে কত জন,
ওঠে শেষে কাতর ক্রন্দন!!
প্রণয়িনী রূপ ধরি, ছানিত মাধুরী হরি,
কেহ আসি ধীরি ধীরি মালা দেয় গলে।
কুসুমে নেহারি ছিছি—গরল উথলে!!

(১০)

ঘুচিয়াছে ঘুমঘোর—খুলেছে নয়ন,—
সমুদিত তরুণ তপন!
দারিদ্র্যের দুঃখময় নির্দ্দয় পীড়ন,—
দানিয়াছে নবীন জীবন!!
অর্থহীন অতি দীন—আশার আলোক লীন,
নিরাশা আঁধারে তুমি পূর্ণিমা-রূপিণী!
গুণবতী সাধ্বী সতী—প্রাণ প্রদায়িনী!!

(১১)

মৃতপ্রায় শুয়ে হায়! এ রোগ শয্যায়—
বুঝিয়াছি মরমে মরমে,
সুখ দুঃখে সমব্যথী, কে আছে ধরায়
তুমি—"মায়া"! মায়ার জনমে!!
পত্নী প্রেম যেই জন, নাহি করে আকিঞ্চন,
হাহাকার হয় সার তাহার জীবনে।
কোথা শান্তি? ভ্রান্তিময় সংসার-স্বপনে!!

(১২)

আবেশে কাঁপিল কায়া—কহে "মায়া" ধীরে,
ধারা বহে কমল নয়নে—
"বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে সাগরের নীরে,
ধেয়ে যাই তোমার বচনে!
তুমি প্রভু, আমি দাসী, শ্রীচরণ অভিলাষী,
ঠেল পায়—ক্ষতি তায়—নাহি কিছু লেশ।
ইহলোকে পতি তুমি—প্রাণান্তে প্রাণেশ।।"

(১৩)

দেহ প্রাণ করি পণ—শুশ্রূষার ফলে
ক্রমে যুবা নীরোগ হইল!
পতিব্রতা সাধ্বী সতী—নয়নের জলে
পুণ্যবলে সকলি ফিরিল!!
সম্পদ গৌরব যত, হয়েছিল অপহৃত,
বর্ষ না হইতে গত—আবার মিলিল।
ভগ্ন গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মী আবার হাসিল।।*

———

* অমরেন্দ্রনাথে বড় আদরের ক্লাসিক থিয়েটার যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন তাঁহার জীবনের এক ভীষণ দিন আসিয়াছিল। তখন তিনি চতুর্দিক হইতে বিপন্ন হইতেছিলেন। শেষে কঠোর রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সাধ্বী পতিপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রাণপণ শুশ্রূষায় ও তাঁহার পাতিব্রত্য প্রভাবে তিনি রোগমুক্ত হইলেন এবং বর্ষ যাইতে না যাইতে আবার ভাগ্যলক্ষ্মীর মুখদর্শন করিলেন। এই কবিতাটি ১৩১৮ সালের মাঘ মাসের নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হয়।

ষষ্ঠ উল্লাস

ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম. এ. বি. এল ও শ্রীযুক্তবাবু মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়দের স্বত্ত্বাধিকারিত্বে মিনার্ভা থিয়েটার তখন প্রবল প্রতাপে চলিতেছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত প্রতিযোগিতায় বহু পুরাতন ষ্টারও ঘাল হইয়া যাইতেছিল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ষ্টারের দরজা বন্ধ করিতে হয়। ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণ থিয়েটার বজায় রাখিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের থিয়েটারে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এত দিন পরে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিলেন এ কথা অতি শীঘ্রই সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ তাঁহার অভিনয় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া তাঁহার চিরপ্রিয় অভিনেত্রী কুসুমকুমারীকে ষ্টার থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। ষ্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিবার পর ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণ ষ্টারে চন্দ্রশেখরের অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকা লইয়া অমরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ষ্টার রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন। এই প্রতাপের ভূমিকা অমরেন্দ্রনাথের আর এক মহতী কীর্ত্তি। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকা পূর্বে এক সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হইত, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই ভূমিকার এমন একটা নূতন প্রাণ প্রদান করিলেন, যে দর্শকদের ঘন ঘন করতালির ধ্বনিতে সে দিন রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকাটি অমরেন্দ্রনাথ একেবারে জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ও তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড় বড় নামজাদা অভিনেতার দ্বারা এই ভূমিকাটি অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু কেহই এই ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

অমরেন্দ্রনাথের ষ্টার থিয়েটারে কয়েকমাস অভিনয় করিবার পরই কোহিনুর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। কোহিনুর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় দশ সহস্র মুদ্রা বোনাস দিয়া গিরিশ বাবুকে মিনার্ভা থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া নিজের থিয়েটারে আনয়ন করিলেন। গিরিশবাবু, সুরেন্দ্রনাথ ও তিনকড়িকে তাহার সহিত কোহিনুর থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম. এ. বি. এল. ও শ্রীযুক্ত মনমোহন পাঁড়ে এই সংবাদ পাইবামাত্র ছয় হাজার টাকা বোনাস দিয়া অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারীকে ষ্টার থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া তাহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে তখন গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি নাটকের মহালা চলিতেছিল। অমরেন্দ্রনাথ ছত্রপতি নাটকে শিবাজীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া অমরেন্দ্রনাথ 'দলিতা ফণিণী' নামে একখানি গীতি নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। এই গীতিনাট্যে অমরেন্দ্র নাথ নরেন্দ্রনাথের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই ভূমিকাটী তিনি এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহা আর অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা তেমনটি হইবার সম্ভব নয় দেখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সেই পুস্তকখানি আর অভিনয় করেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ "দলিতা ফণিণী" গীতি নাট্যে নরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যখন বলিতেন, "এ প্রেম না কৃতজ্ঞতা", তখন সমস্ত দর্শকের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

অমরেন্দ্রনাথ প্রায় আট নয় মাস মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজার রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তার পর কোন কারণে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত তাঁহার মতান্তর হওয়ায় তিনি কুসুমকুমারীকে লইয়া আবার আসিয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৩১৫ সালে ১২ বৈশাখ অমরেন্দ্রনাথ আবার চন্দ্রশেখরের প্রতাপের ভূমিকা লইয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। অমরেন্দ্রনাথের শক্তি যে কত দূর ছিল তাহা উপরি লিখিত ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কোহিনুর থিয়েটারের প্রবল আক্রমণ হইতে অমরেন্দ্রনাথ একাই মিনার্ভা থিয়েটারকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে আসিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারের কদর আবার বাড়িয়া উঠিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার জন্য নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ (ছবি) আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারের দর্শক সংখ্যাও দ্বিগুণ হইয়া গেল। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এইবার অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া প্রথম যে দিন আবার চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, সেই দিন মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিতে তখন লোকে এতই ব্যাকুল যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রথম অভিনয় সত্ত্বেও সে দিন ষ্টারে লোকের এত ভীড় হইয়াছিল, যে মিনার্ভায় ২৫০ শত টাকার অধিক বিক্রয় হয় নাই। ইহার কিছু দিন পরে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর,

কলিকাতা মিয়ুনিসিপালিটি একটী নূতন আইন পাশ করিলেন। এই আইনের দ্বারা তাঁহারা কলিকাতার সমস্ত থিয়েটারের স্বত্ত্বাধিকারীদিগকে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহারা কেহই রাত্রি একটার অধিক তাঁহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রে থিয়েটার ভাঙ্গিলে মফঃস্বলবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হয় দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ সে আইনে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি যেমন পূর্বেও তাঁহার থিয়েটারে সমস্ত রাত্রি ব্যাপী অভিনয় করিতেন এখন সেইরূপ থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এই আইন ভঙ্গ করিবার জন্য তিনি মিয়ুনিসিপালিটিকে যে কত টাকা জরিমানা দিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। যে দিন এই আইন প্রথম পাশ হয় সেই রাত্রে নটকুলচূড়ামণি আমাদের মত অবস্থা,—সকলেই আমাদের মত দ্বাররক্ষককে আসনের জন্য তাগাদা করিতেছেন। সে বেচারি একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে যে কি বলিবে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না। সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, চেয়ার ভাড়া করিতে গিয়াছে, এখনই আসিবে।"

আমরা সেই চেয়ারের আশায় আকুল হইয়া এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম কন্সার্ট বাজিয়া গেল, আমরা ঠিক দাঁড়াইয়াই আছি। দ্বিতীয় বার কন্সার্ট আরম্ভ হইতে যাইতেছে, ঠিক সেই সময় চেয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মত অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিলেন, কাজেই চেয়ার আসিবামাত্র রীতিমত কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়া গেল। আমরাও বহু কষ্টে কাড়াকাড়ি করিয়া একখানা চেয়ার পাইয়াছিলাম। নূতন থিয়েটার, প্রথম অভিনয় রজনী,—বন্দোবস্তের ত্রুটি অনেকই, তথাপি যখন অভিনয় আরম্ভ হইল তখন ঐ ভীড় একেবারেই নিস্তব্ধ। অভিনয়ও যাহা হইল,—তাহাও চরম। অমরেন্দ্রনাথ "জীবনে মরণে" পুস্তকে যে ভূমিকাটি লইয়াছিলেন,—সে ভূমিকার কিরূপ অভিনয় হইল তাহা লেখাই বাহুল্য। এমন সুন্দর অভিনয় সত্যই আমরা বহুকাল দেখি নাই। থিয়েটার যখন ভাঙ্গিল তখন সকলে আশাতীত প্রীত,—সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "না, বেশ নূতন বটে।"

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ প্রায় নয় মাস কাল অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর থিয়েটার চালাইবেন না। উপযুক্ত গ্রাহক পাইলে তাঁহারা তাহাদের থিয়েটার বাটীটি ভাড়া দিবেন। অমরেন্দ্রনাথের নিকটও এ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দর্শকগণের বসিবার স্থানটা বড়ই সঙ্কীর্ণ। প্রতি শনিবার রাত্রেই স্থানাভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বহু দর্শককেই ফিরিয়া যাইতে হইত। এই কারণে অমরেন্দ্রনাথ একটা বড় থিয়েটার গ্রহণের জন্য মনে মনে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের থিয়েটারটি ভাড়া দিবেন তখনই তিনি সেই থিয়েটারটি ভাড়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও অনেক দর

কসাকসির পর উপযুক্ত লেখাপড়া করিয়া অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার ভাড়া করিয়া নূতন করিয়া খুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথ সহসা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করায় অনাথবাবু বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার পুরাতন ক্ষুদ্রকায় বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেবল অমরেন্দ্রনাথের জন্যই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন থিয়েটার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর অমরেন্দ্রনাথ কিনা যেমন একটু সুবিধা পাইলেন আর অমনি ষ্টার থিয়েটারে চলিয়া গেলেন! অমরেন্দ্রনাথের শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিয়া এই ব্যাপার লইয়া অনাথবাবুকে নানাভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রমাগত উত্তেজনায় অনাথবাবুও রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথের নামে আদালতে মামলা রুজু করিবেন স্থির করিলেন। অনাথবাবু যে মামলা রুজু করিতে যাইতেছেন অমরেন্দ্রনাথের নিকট এ সংবাদ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার সবে গ্রহণ করিয়াছেন,—নূতন ভাবে, নূতন ছাঁদে তিনি ষ্টার থিয়েটার চালাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। কাজেই তিনি এ সময় অনাথবাবুর সহিত মামলা মোকর্দমা করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্রই অনাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন স্থির করিলেন।

এ্যটর্ণী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অনাথবাবুও মামলার কাগজপত্র এ্যটর্ণীকে বুঝাইয়া দিতেছেন, ঠিক সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অনাথবাবু নিজেকে একটু গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের এমনি একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল যে তাঁহার সম্মুখে শত্রু মিত্র যেই হউক কাহারও গম্ভীর হইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। অনাথবাবুও গম্ভীর থাকিতে পারিলেন না, অমরেন্দ্রনাথ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে বলিলেন, "এস ভায়া এস,—বোস।"

অমরেন্দ্রনাথ বসিতে বসিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুনিলাম নাকি আপনি আমার নামে নালিশ করিতেছেন?"

অনাথবাবুর প্রাণ বলিতে কহিল, 'হাঁ! সেটা কি বিশেষ অন্যায় করিতেছি?' কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে সে কথা বাহির হইল না,—তিনি বার দুই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "না না,—ও,—মিথ্যা,—আমি কি তোমার নামে নালিশ করিতে পারি! তবে কথা হইতেছে কি জান ভায়া,—কাজটা কি তোমার ভাল হইয়াছে?"

অমরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি আপনার ছেলের সমান; ছেলের অপরাধ পদে পদেই হইতে পারে। আপনার তো কিছু অজানা নাই? এখানে থিয়েটার খুলিয়া পর্যন্ত আমি কেবল লোকসান দিয়াই আসিতেছি। এমন একদিনও দেখিলাম না যে সবাইকে স্থান দিতে পারিলাম। আপনার থিয়েটারে লোক বসিবার যত স্থান আছে তাহাতে আমার থিয়েটার কিছুতেই চলিতে পারে না। ক্রমাগতই আমায় লোকসান খাইতে হয়। এ অবস্থায় আপনি যদি বলেন,—লোকসান হইলেও তোমাকে এই থিয়েটারে থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমি নাচার। আমাকে থাকিতেই হইবে।

বলুন আমার কি করা উচিত? আর—তা ছাড়া আপনার দশ বিশ হাজার টাকা এখন গেলেই বা কি থাক্‌লেই বা কি? কিন্তু আমাকে একেবারে মারা যাইতে হয়।"

অমরেন্দ্রনাথের এই লম্বা বক্তৃতার সম্মুখে অনাথ বাবুকে পরাস্ত হইতে হইল। তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হইল, "না—না, আমি এমন কথা তোমায় বলিতে পারি না,—যে তুমি এইখানে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হও। আমার বাড়ী পড়িয়া থাকিবে না। তোমার যাহাতে সুবি।া হয় তুমি তাই কর। তবে এটা তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যাও যে আমি তোমার নামে নালিশ করিব না।"

এরূপ ঘটনা অমরেন্দ্রনাথের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে, তাঁহার বচনে, এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে শত্রু মিত্র যিনিই হউন্—একবার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে মাথা হেট করিতেই হইত।

যে ষ্টার থিয়েটার দর্শক অভাবে বন্ধ হইয়াছিল, অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আবার দর্শকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ প্রাণপণ পরিশ্রমে ষ্টারের আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে আসিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে নাটক অভিনয় করিবার জন্য গ্রহণ করিলেন ও মহোৎসাহে তাহার মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত এক সময়ে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মতভেদ হওয়ায় তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার কোন নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য প্রদান করিবেন না। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার গ্রহণ করিয়াই, তাঁহার সে মতের পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম সামাজিক নাটক পরপারে অভিনয় করিলেন। একে অমরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ষ্টার থিয়েটার চলিতেছে,—তাহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম সামাজিক নাটকের অভিনয়, ঠিক যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল।

যে রাত্রে ষ্টার থিয়েটারে পরপারে নাটকের অভিনয় হয় সে রাত্রে দর্শকের ভীড় এরূপ গুরুতর হইয়াছিল, যে অভিনয় হইবার বহু পূর্ব্বেই টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল। কত লোক যে টিকিট না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহার আর সংখ্যা হয় না। অমরেন্দ্রনাথ পরপারে নাটকে বিশ্বনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটি তিনি এত সুন্দর অভিনয় করিতেন যে তাহা যে দেখে নাই তাহাকে বোঝান অসম্ভব। এই বিশ্বনাথের ভূমিকাটি অমরেন্দ্রনাথের একটী বিশেষ অভিনয়। এই বিশ্বনাথের ভূমিকাটি অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা তাঁহার মত হওয়া সম্ভব কি না সে বিষয়ে বিশেস সন্দেহ আছে।

অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার লইয়া বহু নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর "বাজীরাও" নাটকে বাজীরাওয়ের ভূমিকা, অহল্যাবাঈ নাটকে "মলোহর রাও" এর ভূমিকা, সাজাহানে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা, সাইন অব্ দি ক্রসে "মার্কাসের" ভূমিকা, জয়দেব নাটকে "জয়দেবের" ভূমিকা এবং সওদাগর নাটকে "কুলীরকের" ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরিলিখিত ভূমিকাগুলির তিনি যেরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক

অভিনয় করিয়া গিয়াছেন সেরূপ স্বাভাবিক অভিনয় অদ্যাবধি অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবারও বড় একটা আশা আমরা করিতে পারি না। আমরা তাঁহার উপরিলিখিত নাটকগুলির সব কয়টি ভূমিকারই অভিনয় দেখিয়াছি এবং শত মুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। সওদাগর নাটকে কুলীরকের ভূমিকা, কালি যেন অভিনয় দেখিয়াছি ঠিক এইভাবে আমাদের চক্ষের উপর আজিও ভাসিতেছে।

অমরেন্দ্রনাথ কেবল যে অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার ন্যায় অধ্যক্ষও বিরল। নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতে তিনি একেবারে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার আর একটী অদ্ভুত শক্তি ছিল,—তিনি রাস্তার কুলি হইতে ধরাপতি রাজা, সকল ভূমিকাই সমান অভিনয় করিতেন। তিনি দর্শকগণকে যেমন কাঁদাইতে পারিতেন, তেমনি হাসাইতে পারিতেন। তিনি যখন পরপারে নাটকে বিশ্বানাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন তখন কোন দর্শকই চোখের জল সংবরণ করিতে পারিতেন না। আবার যখন হারানিধি নাটকে অঘোরের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তখন আবার দর্শকগণের হাসি বন্ধ করা দায় হইত। আমরা দেখিয়াছি থিয়েটার আরম্ভ হইতে যাইতেছে,—এমন সময় অমরেন্দ্রনাথের নিকট সংবাদ আসিল অমুক অভিনেতা আইসেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ তখনই সেই অভিনেতার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ভূমিকা তিনি একদিন পর্য্যন্তও দেখেন নাই এমন সব ভূমিকায়ও অপ্রস্তুত অবস্থায়ই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সুখ্যাতির সহিত তাহা অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন। এ একটা কম ক্ষমতার কথা নহে। এ ক্ষমতা অতি অল্প অভিনেতা ও অভিনেত্রীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া অমরেন্দ্রনাথ আর একখানি নাটক অভিনয় করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এখানি নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "খাস দখল"। এই খাস দখল নাটকে অমরেন্দ্রনাথ মোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী অনেকেই অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের সেই,—

"লুকায়ে চোরের প্রায়—নিশিতে ঝরিয়া হায়
নলিনী মলিনী কেন করিয়া শিশির,
ভূমিগত পদ্মলতা তার প্রাণে দিলি ব্যথা
কি লাভ ইহাতে—তোমার পিসির?"

এই আবৃত্তিটুকু আজিও আমাদের প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার দিতেছে। খাসদখল নাটকের মোহিতের ভূমিকাটী অমরেন্দ্রনাথ এমন সুন্দর সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন যে উহা প্রত্যেক দর্শকের প্রাণের ভিতর একটা নূতন ছবি চিরদিনের মত অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথ বহু দিন দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই সুমিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আজিও আমাদের কাণে বাজিতেছে।

সপ্তম উল্লাস

দাম্পত্য ধর্ম

অমরেন্দ্রনাথ যে ভাগ্যবান্ ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শৈশবে তিনি পিতামাতার আদরের দুলাল ছিলেন। তাঁহাদের অনুপম স্নেহ ও আদরে তিনি শৈশবে ও কৈশোরে পালিত হইয়াছিলেন,—তাঁহার দুঃখ বলিয়া কিছুই ছিল না। যৌবনে তিনি ইচ্ছাকৃত অমিতচারিতার জন্য বহু বিপদে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার ভাগ্যের দোষ দেওয়া যায় না। তিনি যে পত্নী পাইয়াছিলেন, তেমন পত্নীলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। পূর্বজন্মকৃত বহু পুণ্য না থাকিলে মানুষের এমন পত্নীলাভ ঘটে না। অমরেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনী সত্যই একজন আদর্শ হিন্দুমহিলা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দিন রাত যে পতিভক্তির লহর বহিত, তাহা সত্যই প্রত্যেক হিন্দু নারীর অনুকরণের সামগ্রী। বিবাহের পর অমরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে পত্নীকে নিতান্ত আদরে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের জন্মগ্রহণের পর হইতেই পত্নীর সহিত তাঁহার ছাড়াছাড়ি হয়। ঐ সময় হইতে তিনি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। তখন আর তিনি একদিনের জন্য পত্নীর কথা ভাবেনও নাই। কিন্তু তাঁহার সাধ্বী পত্নীর হৃদয়ে একদিনের জন্যও পতিভক্তির অভাব হয় নাই। তিনি জানিতেন স্বামী তাঁহার নরদেবতা, মূর্তিমান নারায়ণ। তিনি সেই দেবতার মূর্তি হৃদয়ে গড়িয়া তাঁহারই কৃপায় সদানন্দে দিন কাটাইতেন। আমরা শুনিয়াছি তাহার মুখে হাসি ভিন্ন কেহ কোনদিন বিষাদের চিহ্ন পর্যন্ত দেখে নাই।

ষ্টার থিয়েটার শেষবার যখন অমরেন্দ্রনাথের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছিল অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ যখন ষ্টার থিয়েটার 'লিজ' লইয়া উহার ম্যানেজার হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভাগ্যাকাশ বেশ সুপ্রসন্ন ও নির্মেঘ হইয়া আবার বিমল শারদ-চন্দ্রিকায় জগৎ বিমোহিত করিতেছিল, সেই শুভ কনক প্রভাতে অমরেন্দ্রনাথের সাধ্বী পত্নী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোকের মায়া পরিত্যাগপূর্বক অমরধামে চলিয়া যান। আমরা অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনের মুখে শুনিয়াছি যখন সাধ্বী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তখন তাঁহার মুখে

একটুও বিষাদের ছায়া পড়ে নাই। মৃত্যুর পরেও তাঁহার মুখের উপর একটা মহা শান্তির হাসি ফুটিয়াছিল। যাঁহার এমন সাধ্বী পত্নী তাহার কি বিপদ হইতে পারে! সাধ্বীর পতিভক্তির পুণ্যবলে তাঁহার স্বামী যে বিপদেই পড়ুন,—যে বিপথেই গমন করুন,—কোন বিপদেই তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে না। অমরেন্দ্রনাথ নানা বিপদে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বিপদেই তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিতে পারে নাই। চারিদিক হইতে অনন্ত বিষাদ আসিয়া অমরেন্দ্রনাথকে ঘিরিয়াছে,—কোথাও একটু আশার আলো না দেখিয়া তিনি যখন আত্মবিনাশে সকল জ্বালার অবসান করিবেন স্থির করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় কোথা হইতে এক পুণ্যের জ্যোতি আসিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আবার তাঁহাকে বিশ্বের বুকের উপর অখণ্ড গৌরবে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। কাহার পুণ্যবলে তিনি এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন তখন তিনি যৌবনের উষ্ণ শোণিত-প্রবাহে তাহা বুঝিতে না পারিলেও শেষে তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন,—তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহাকে দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে। "অভিনেত্রীর রূপ" নামক পুস্তক ও অনুতাপ-শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলে অমরেন্দ্রনাথের প্রাণের অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। অভিনেত্রীর রূপে অমরেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমাদের পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দুর্গা আপনা ঘরে বসিয়া মহাভারতের বন পর্ব পাঠ করিতেছিল, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সংবাদ দিল "জামাই বাবু আসিয়াছেন।" দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল, অসংযত কেশরাশি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল, বক্ষের শোণিত অপেক্ষা প্রিয় নিদ্রিত সন্তানটীকে শয্যার উপর শোয়াইল। যুক্তকরে মধুসূদনকে ডাকিয়া বলিল, "আজি যদি কোন বিপদে পড়িয়া তিনি আমার কাছে আসিয়া থাকেন,—তাঁহার পায়ে যেন একটী কাঁটাও না বিঁধে!

"মহা অপরাধীর ন্যায় নলিনী গৃহে প্রবেশ করিল। বহু কালের সাধনার পর অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া ভক্তের প্রাণে যেরূপ অনির্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, অনেক দিনের পর নলিনীকে দেখিয়া দুর্গার সন্তপ্ত চিত্ত সেইরূপ উল্লাসে ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কেমন কিসের একটা অজানিত আতঙ্কের ছায়া তাহার সম্পূর্ণ সুখ ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি উপভোগের পক্ষে বিষম কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল।"

"নলিনী অনন্যোপায় হইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, তাহার বিপদের কথা দুর্গাকে জানাইল। দুর্গা কোন কথা না কহিয়া, কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, নলিনীর নির্দয় ব্যবহারের কথা কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তাহার গহনার বাক্সটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "এই আমার সর্বস্ব। তোমারই সামগ্রী তোমারই কার্যে উৎসর্গ করিলাম! আমার একটী মাত্র অনুরোধ ভ্রাতৃ-বিরোধ করিও না, তিনি হাতে তুলিয়া

যাহা দেন তাহাই লইয়া সুখী হও। যাও—আর বিলম্ব করিও না,—আজ রাত্রের মধ্যেই এই সকল গহনা বন্ধক দিয়া টাকার যোগাড় কর। কাল বেলা বারটার মধ্যে টাকা জমা না দিলে, বিপদের অবধি থাকিবে না। আমার দুর্ভাগ্য এতদিন পরে তোমাকে পাইলাম, প্রাণ ভরিয়া দুটো কথা কহিতে পারিলাম না,—তোমার একটু সেবা করিয়া পরকালের কাজও করিতে পারিলাম না। যাক্ সে দুঃখ করিবার সময় আজ নয়। জগদীশ্বর যদি দিন দেন,—অনেক কথা কহিব, সে কথা আর ফুরাইবে না”—এই বলিয়া নলিনীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া দুর্গা ভক্তিভরে প্রণাম করিল।”

অমরেন্দ্রনাথ “অভিনেত্রীর রূপের” আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, “দুর্গা এখন আর তাহার বাপের বাড়ীতে নাই। নলিনীর মাতা তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। * * * * দুর্গা মাটীর মানুষ, শ্বাশুড়ি-অন্ত প্রাণ—শ্বাশুড়ি সেবা করিতে পাইলে সে যেন স্বর্গ হাতে পায়, মুখে সর্বদা হাসিটী লাগিয়াই আছে, তাই নলিনীর মাতা দুর্গাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন, তাহার অদৃষ্টের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া গোপনে অশ্রুবর্ষণ করেন। তাহার সব আছে অথচ কিছুই নাই—এই ভাবিয়া সময় সময় তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যায়। এক এক দিন গভীর রাত্রে দুর্গার ঘরে গিয়া দেখেন—সে তখন, ঘুমায় নাই, শাপভ্রষ্টা দেববালার ন্যায় আলুলায়িত কেশে দীনা হীনা মলিনার বেশে ভগবান্ রামকৃষ্ণের পটখানি সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছে। শয্যার উপর সুন্দর সুকুমার শিশুটি অকাতরে ঘুমাইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া, চাহিয়া চাহিয়া, নলিনীর মাতা আত্মবিস্মৃতা হইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিলেন, “প্রভু! সত্যই কি কলিতে তোমার মহিমা লোপ পাইয়াছে?”

“নিরুপমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষিতীশ ও চন্দ্রাকে বাগান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে অনাহারে অসুস্থ অবস্থায় নলিনী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনীর মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নলিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই এক গ্রাস মাত্র খাইল। তারপর দুর্গার সহিত সাক্ষাৎ হইল।”

“নলিনী আজ প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এ কি—মুখ ফোটে ফোটে না, মন ছোটে ছোটে—ছোটে না!”

“দুর্গা হাসি হাসি মুখে শিশু সন্তানটিকে বুকে লইয়া নলিনীর কোলে তুলিয়া দিল। মধুর অধরে হাসির লহর তুলিয়া, প্রাণের পুত্র নলিনীর কোলের উপর খেলিতে খেলিতে কোমল কিসলয়তুল্য করপল্লব নলিনীর পায়ের উপর রাখিয়া, বুকভরা ব্যথা লইয়া, কঠোর চিত্ত পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যদিও সে তখনও ভাল করিয়া কথা কহিতে শেখে নাই, তথাপি নলিনী যেন স্পষ্ট শুনিল,—সেই সংসার অনভিজ্ঞ বালক বলিতেছিল, “ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর। আমার মাকে কাঁদাইতেছ, আমাকে কাঁদাইতেছ, তোমার কি ভাল হইবে?”

"নলিনীর মনে হইল, যদি এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা সুখী কে?"

সাগর তরঙ্গ কোনরূপে প্রতিরোধ করিয়া নলিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দুর্গা! সব শেষ হইয়াছে। আমার সাধের স্বপ্ন ফুরাইয়াছে। যে ভুল লইয়া মজিয়াছিলাম, যাহার কুহকে আত্মহারা হইয়া পাপ পুণ্য বিচার করি নাই, এই স্বার্থপূর্ণ সংসারে যাহাকে সর্ব‍স্ব ভাবিয়াছিলাম, যাহার ভালবাসা জীবনে নিত্য উপভোগ্য সামগ্রী ভাবিয়া তোমার মুখ চাহি নাই,—সন্তানের মুখ চাহি নাই, সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার সহিত যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, চির জীবন ধরিয়া তোমাকে মর্মান্তিক কষ্ট দিয়াছি, নিজের সুখের ও স্বার্থের জন্য পিশাচের অধম হইয়া তোমাকে যেরূপ অনাদর, উপেক্ষা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশও তাহার সহিত কখনও করি নাই। তবুও বিনা দোষে,—বিনা কারণে—বৃথা সন্দেহে—সে আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! সব জানিয়াও, সমস্ত বুঝিয়াও এ দুর্বল চিত্তকে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছি না। প্রাণ কাঁদিতেছে,—বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে, ছুটিয়া গিয়া তাহার পায় ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মন আকুল হইতেছে। ছি! ছি! পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন? হৃদয়ের উপর যাহার এটুকুও আধিপত্য নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। দুর্গা! মনের পাপ মুক্ত প্রাণে তোমার নিকটে ব্যক্ত করিলাম, হতভাগ্যের অপরাধ মার্জনা করিও।"

"নলিনী আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্গার—মুখ—বুক—রমণীজীবনের সুখ—সমস্ত ভাসাইয়া দিল।"

"যে রাক্ষসী মন্ত্র প্রভাহে মোহ জাল বিস্তার করিয়া, তাহার সাধের স্বামীকে পর করিয়াছিল, অজানিত অপরিচিত অপ্রত্যাশিত সুদুর প্রদেশ হইতে আসিয়া যে পিশাচী তাহার অভীষ্ট দেবতার স্বর্গীয় স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল, পতিপ্রাণা পতিব্রতা রমণীর হৃদয় রাজ্য হইতে তাহার রাজাধিরাজকে কাড়িয়া লইয়া যে শয়তানী আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, সে পাপ স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়াছে, এ সংবাদে দুর্গা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিল। কাহার না হয়? দুর্গা রক্ত মাংস গঠিত মানবী তো বটে! কিন্তু নলিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ভগবান রামকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে শত শত প্রণাম করিয়া সে মন বাঁধিল নশ্বর জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত সাধ, সমস্ত আহ্লাদ বিলাইয়া দিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সে নলিনীকে বলিল, "সে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তুমি ডাকিলেই আবার আসিবে। আমি বেশ জানি সে তোমায় ভালবাসে। তা না হইলে মাকে পর করিয়া, থিয়েটার ছাড়িয়া, সে তোমার আশ্রয়ে আসিত না। তুমি একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া, প্রাণের ব্যথা জানাইয়া, দুটো মিষ্ট কথা বলিলেই সে আর স্থির থাকিতে পারিবে না। তুমি যাও তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার সুখী হও! আমার জন্য ভাবিও না—তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার আনন্দই আমার আনন্দ, তোমার তৃপ্তিতেই আমার

তৃপ্তি। তোমায় কেহ পর করিতে পারিবে না। আমি তোমার পদ সেবার দাসী, চিরদিন দাসীই থাকিব। ভগবান রামকৃষ্ণের পট তুমিই আমায় আনিয়া দিয়াছিলে, তুমিই আমায় পূজা করিতে শিখাইয়াছিলে। দুর্গা কালী, জগদ্ধাত্রী, সকলের পূজা ছাড়িয়া এখন আমি রামকৃষ্ণের পূজা সার করিয়াছি। তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর; আমার কোনও দুঃখ নাই।"

অভিনেত্রীর রূপ হইতে আমরা যে দুই স্থান তুলিয়া দিলাম, তাহা হইতেই আমাদের পাঠক পাঠিকাগণও অমরেন্দ্রনাথের পত্নীর চরিত্রের কতকটা আভাস পাইবেন। এমন যাঁহার পত্নী তিনি কি জীবনে কখনও অসুখী হইতে পারেন। তাহা হইলেই বলিতে হয় যে নানা গুরুতর বিপদে পড়িলেও অমরেন্দ্রনাথ কখনও অসুখী ছিলেন না,—নিজে আনন্দ করিয়া, সহচরদিগকে আনন্দ দিয়া মহাসুখেই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নটনাথের আশীর্বাদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার নটনাথের আশীর্বাদ লইয়াই চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সহস্র দোষ সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল। তাঁহার মাতাও অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিকতর স্নেহ করিতেন। তাঁহার যদি কখনও কিছু প্রয়োজন হইত তিনি তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে না জানাইয়া অমরেন্দ্রনাথকেই জানাইতেন। অমরেন্দ্রনাথও জননীর প্রয়োজন সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

অমরেন্দ্রনাথ কেবল যে একজন প্রতিভাবান্ অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে, তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি সাহিত্য হিসাবে বিশেষ স্থান লাভ করিতে না পারিলেও, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ তাঁহার যখনই যে কোন গ্রন্থ যে কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত তখনই তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন, কেন না তাহারা সুমার্জিত সৎ-সাহিত্য না হইলেও ব্যক্তিগত জীবনের অবিকল জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত করিত। যখনই অমরেন্দ্রনথের নূতন একখানি গীতিনাটিকা বা প্রহসন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত তখনই দর্শকের ভীড়ে রঙ্গালয়ে আর তিল ধরিবার স্থান থাকিত না। অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন—(১) শ্রীরাধা, (২) শ্রীকৃষ্ণ, (৩) হরিরাজ, (৪) থিয়েটার, (৫) এস যুবরাজ, (৬) দোললীলা, (৭) শিবরাত্রি, (৮) কাজের খতম, (৯) মজা, (১০) ফটিক জল, (১১) চাবুক, (১২) নির্মলা, (১৩) দুটি প্রাণ, (১৪) ভক্তবিটেল।

উপরিলিখিত সমস্ত পুস্তক গুলিই ক্লাসিক থিয়েটারে মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত তিনি ক্লাসিকে থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম, ইন্দিরা, ভ্রমর, যুগলাঙ্গুরীয়, দেবী চৌধুরাণী, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের বঙ্গের শেষবীর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণয় পরিণাম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি প্রভৃতি

পুস্তকাবলি নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া উক্ত থিয়েটারে অভিনীত করাইয়াছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি গ্রাণ্ড থিয়েটার খোলেন তখন (১৫) "ঘুঘু" নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন, এবং ঐ প্রহসন খানি গ্রাণ্ড থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের যখন অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তখন (১৬) "দলিতা ফনিণী" নামক একখানি গীতি নাট্য রচনা করেন। এই গীতি নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। তিনি যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলেন তখন (১৭) জীবনে মরণে" ও (১৮) "আহামরি" নামক একখানি গীতিনাটিকা ও একখানি প্রহসন রচনা করেন। এই দুইখানি পুস্তক লইয়াই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। তিনি ষ্টারের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেন, (১৮) রোক শোধ, (১৯) প্রেমের জেপ্‌লিন' (২০) কিশমিস। ইহা ব্যতীত কামিনী কাঞ্চন ও রাণী ভবানী, জীবনসন্ধ্যা কমলাকান্ত, প্রেমের বাঁধন নামক পুস্তকগুলি নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অভিনীত করেন।

অমরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ নাটক, গীতি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি দুইখানি উপন্যাস এবং একখানি গীতি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উপন্যাস দুইখানির নাম (২১) আদর ও (২২) অভিনেত্রীর রূপ। গীতি কাব্যখানির নাম (২৩) নির্ম্মলা। তিনি তিনখানি সাময়িকপত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে অমরেন্দ্রনাথ একখানি মসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন; তাহার নাম দিয়াছিলেন "সৌরভ।" "সৌরভ" অতি অল্পদিন মাত্র সাহিত্য-উদ্যানে "সৌরভ" বিতরণ করিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর যৌবনে রঙ্গালয় নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি নাট্য মন্দির নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি একখানি নাটক লিখিয়া শেষ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ানের জীবন-কাহিনী লইয়া তিনি এই নাটকখানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। কাজেই ইহা কোন রঙ্গালয়ে অভিনীতও হয় নাই, ছাপার অক্ষরে মুদ্রিতও হয় নাই। তিনি শৈশবে দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, উষা ও মানকুঞ্জ।

অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রতিভা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি নট ছিলেন বটে,—বারবালা সংস্রবে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ চিরদিনই সজীব ছিল। পরের দুঃখে সতত তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। দীন দুঃখীকে তিনি যে কত প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শীতকালে শেষ রাত্রে ক্লাসিক থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর অমরেন্দ্রনাথ এক দিন বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সেই সময় দেখিলেন পথের পার্শ্বে ফুটপাথের উপর বসিয়া একটী স্ত্রীলোক ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। স্ত্রীলোকটির গাত্রে কিছুই নাই, পরিধানে যে বস্ত্রখানি আছে সেখানেও শত-গ্রন্থি,—তাহার দ্বারা গাত্র ঢাকিবার উপায় নাই। এই

দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার সম্মুখে গাড়ীতে যে বসিয়াছিল তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্ত্রীলোকটি কে? কেন এই দারুণ শীতে বিনা গায়ের কাপড়ে কাঁপিতেছে?"

সেই লোকটা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবু ও একটা পাগ্‌লী।"

অমরেন্দ্রনাথ কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। তিনি একটী কথাও না বলিয়া গায়ের শালখানি খুলিয়' সেই স্ত্রীলোকটির গায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটি শালখানি পাইয়া একবার অমরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল,—বলিল, "বাবা বেঁচে থাক।" তাহার পর গায়ের কাপড়খানি সর্বাঙ্গে জড়াইল। অমরেন্দ্রনাথ আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

এরূপ ঘটনা অমরেন্দ্রনাথের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। তিনি যে দয়ার সাগর ছিলেন এ কথা তাঁহার শত্রু মিত্র সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে যে যাহাই চাহিয়াছে তিনি তখনই তাহাই তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় উচ্চ প্রাণ প্রশস্ত হৃদয় সত্যই বাঙ্গালা দেশে বিরল।

অষ্টম উল্লাস

অকালে দীপ নির্বাণ

পত্নী বিয়োগের পর হইতেই অমরেন্দ্রনাথের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। মোহের জাল ছিঁড়িয়া যেমনই তিনি বাহিরে আসিলেন, যেমনই ভাবিলেন এইবার পত্নীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিবেন,—শান্তির সংসার পাতিবেন, অমনি তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ মনে যে আকাশকুসুম রচনা করিয়াছিলেন, কালের একটী আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে শত খণ্ড হইয়া গেল। পত্নী-বিয়োগে অমরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছিলেন সেরূপ আঘাত তিনি পূর্ব্বে আর কখনও পান নাই। অমরেন্দ্রনাথের সে তেজ, সে উদ্যম, সে উৎসাহ কিছুই আর রহিল না। তিনি যেন কেমন জড়পিণ্ডের মত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ব্যাধি আসিয়া পুনরায় তাঁহার দেহ আশ্রয় করিল।

পত্নী বিয়োগের প্রথম আঘাতটা একটু সহ্য হইয়া আসিবার পর অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য ঔষধ সেবন করিলেন, কিন্তু ঔষধে বিশেষ কোন ফললাভ হইল না। পত্নীবিয়োগের পর সেই আঘাতটা সামলাইবার জন্য তিনি সুরার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে যদিও ডাক্তারের পরামর্শে সুরার মাত্রাটা একটু কমাইতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না। কাজেই ব্যাধির হস্ত হইতেও তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। মারাত্মক উদরী রোগে দিন দিন তাঁহাকে ক্ষয় করিতে লাগিল। ডাক্তারি চিকিৎসায় মাঝে মাঝে তিনি একটু সুস্থ বোধ করিতেন বটে, কিন্তু আবার রোগ প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দিত। এইভাবে তখন তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছিল। তথাপি তিনি থিয়েটার ছাড়িলেন না। অত বড় একটা রোগ দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহেই অভিনয় করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই রাত্রি জাগরণ এক দিনের জন্যও বন্ধ হইল না। এত অত্যাচার ভগ্ন দেহ সহ্য করিতে পারিবে কেন? শরীর যখন একেবারে অপটু হইয়া পড়িল তখন তিনি কাশীধামে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিলেন। কাশীধামে যাইয়া কবিরাজি চিকিৎসায় তাঁহার ব্যাধির প্রকোপটা

কিছু কমিল। যে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি অমরেন্দ্রনাথকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অন্ততঃ দুই মাস কালও তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। অমরেন্দ্রনাথ দুই মাসও তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ চুণিবাবুকে লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া কাশী পরিত্যাগ করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ চুণি বাবুর উপর থিয়েটারের ভার অর্পণ করিয়া কাশী গিয়াছিলেন। সহসা তিনি চুণিবাবুর এক পত্রে সংবাদ পাইলেন যে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে তাঁহাকে অধিক বেতন দিয়া তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিতে চান। এ বিষয়ে তাঁহার মতামত কি? অমরেন্দ্রনাথ এই পত্র পাইয়া চুণি বাবু সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না,—বা তাঁহার বিষয় একটু বিবেচনাও করিলেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া চুণি বাবুকে ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে হইল। অমরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে সংবাদ পাইলেন যে চুণি বাবু ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন। এ সংবাদ পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ আর কাশীতে এক দণ্ডও থাকিতে পারিলেন না, তখনই কলিকাতা রওনা হইলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। মণিবাবু লিখিয়াছেন—

"বৎসরাবধি অমরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কখনও বা সুস্থ থাকিতেন। এবার পূজার পর হইতেই তাঁহার রোগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূজার পর তিনি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন। বসুমতীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বনামখ্যাত বহুদর্শী কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্ন মহাশয় অমরেন্দ্রনাথের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় অমরেন্দ্র নাথকে বলিয়াছিলেন,—"যদি আপনি অন্ততঃ দুই মাস কাল আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন, আমি আপনাকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইব।" এই সময় কাশীধামে প্রচারিত হইয়াছিল, অমরেন্দ্রনাথের ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় কাশীধামে অভিনয় করিতে আসিতেছে। কাশীবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সম্প্রদায় আনিয়া কাশীধামে অভিনয় করিবার বাসনা অমরেন্দ্রনাথেরও প্রবল ছিল। কিন্তু রোগের প্রভাবে তাঁহার বাসনা কার্যে পরিণত নাই। এই সময় অমরেন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—কবিরাজ মহাশয়, আপনি আমাকে রোগমুক্ত করিয়া দিন, আরোগ্য হইলে আমি আমার নাট্য সম্প্রদায় কাশীধামে আনিয়া সমগ্র কাশীবাসীকে বিনা টিকিটে থিয়েটার দেখাইব। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার রোগ চিকিৎসার অতীত নয়। ইহা অপেক্ষাও কঠিন রোগ আমি আরোগ্য করিয়াছি। আপনি কেবল কলিকাতার ভাবনা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন আমার চিকিৎসাধীনে থাকুন। অমরেন্দ্রনাথ সম্মত হইয়া বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।"

এই সময়ে আমরাও বারাণসীধামে ছিলাম। অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই আমাদের বাসায় আসিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে দুই তিন দিন থাকিবার পরই যেন একটু উপকার দেখা দিল। অমরেন্দ্রনাথ আমাদের বলিতেন,—আমার মন বলিতেছে,—আমি এই বিচক্ষণ কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিব। আজ কয়দিন যেন বেশ একটু স্ফূর্ত্তি পাইতেছি। কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সদা সর্বদা অমরেন্দ্রনাথের তত্ত্ব লইতেন। তিনি বলিতেন,—আপনি বিখ্যাত নাট্যরথী,—সুদুর কাশীধামে থাকিয়াও আমরা আপনার নাম শুনিয়া থাকি; আপনাকে আরোগ্য করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করি; সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।

অমরেন্দ্রনাথ বারাণসী ধামে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। তাঁহার অবর্তমানে চুণিলাল দেব বিশেষ দক্ষতার সহিত ষ্টার থিয়েটার চালনা করিতেছিলেন। এই সময় মনোমোহন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ চুণিবাবুকে আহ্বান করিলেন—তাঁহাকে উক্ত রঙ্গালয়ের অন্যতম অংশীরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি চুণি বাবু এ সম্বন্ধে অমর বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ যদি এ সময় চুণি বাবুর সম্বন্ধে কিছু একটু বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে চুণিবাবু কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিতেন না। আমরা জানি, প্রথমে অমরেন্দ্রনাথ চুণি বাবুর সহিত একটা নূতন বন্দোবস্ত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের কতকগুলি 'হিতৈষী' (?) সে বাসনার বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর 'হিতৈষীর' সংখ্যা বড় কম ছিল না। অমরেন্দ্রনাথ মনে মনে যে সঙ্কল্প করিতেন, এই হিতৈষীর দল যদি দেখিতেন, সে সঙ্কল্প তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল নহে, তাঁহারা তখনই অমনি দল পাকাইয়া, রীতিমত রিহারসেল দিয়া সেই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি-তর্ক তুলিয়া তাহা পণ্ড করিয়া দিতেন। শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব ষ্টার থিয়েটারের পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল হিতৈষীর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিও খর্ব হইয়া পড়ে. তাঁহারা মনে মনে প্রমাদ গুণিতে থাকেন। কর্তব্যনিষ্ঠ চুণি বাবু তাঁহাদিগের অনেককেই মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বারাণসী ধামে অমরেন্দ্রনাথকে স্বতন্ত্রভাবে পত্রযোগে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন,—নানাবিধ অলীক প্রসঙ্গ তুলিয়া অমরেন্দ্রনাথের মন ভারাক্রান্ত করিলেন, বিশেষরূপে অমরেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সমগ্র নাট্য-জগতের ভাগ্যবিধাতা। থিয়েটারের অজস্র টিকিট বিক্রয় ও অশেষ প্রতিপত্তি সকলই একমাত্র তাঁহারই ভাগ্য ও নামের নিমিত্ত। সুতরাং তিনি যদি এখন চুণি বাবুর সহিত নূতন কিছু বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আর থিয়েটার না করাই কর্তব্য। অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অধৈর্য পুরুষ ছিলেন. কোন বিষয়েই কোন দিন তাঁহার ধৈর্য ছিল

না। তিনি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বিশেষভাবে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—কলিকাতায় গিয়া অতি সত্বর থিয়েটার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। কবিরাজ মহাশয় এক সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী ঔষধও দিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাহা আর ব্যবহৃত হয় নাই।

যাইবার দিন অমরেন্দ্রনাথ আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। সে দিন আমাদের বাসায় তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। আমাদের বাসার অনতিদূরেই শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বাসা। নাট্যাচার্য্য মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন বহুদিন যাবৎ বারাণসী ধামে অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা দশটার সময় স্নানাদি করিয়া অমরেন্দ্রনাথ অমৃতবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"অমৃতবাবু বাসাতে ডাকিয়াছেন,—চুণি বাবুও যাইতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব।" দুই ঘণ্টা পরে অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার মুখ বেশ প্রফুল্ল, ভাবিলাম, অমৃতবাবুর নিকট নিশ্চয়ই সুপরামর্শ পাইয়াছেন। তাই এই আনন্দ। আমাকে বলিলেন, "অমৃতবাবুকে বলিলাম যে, চুণি বাবু চলিয়া যাইতেছেন, আমার শরীরেরও এই অবস্থা, এখন আপনার সাহায্য ভিন্ন থিয়েটারটিকে রক্ষা করিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। এখন যদি আপনি আমাকে সাহস দেন—আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় গিয়া থিয়েটারের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমাকে বাধ্য হইয়া থিয়েটারের সকলকেই ছাড়িয়া দিতে হয়,—কারণ আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তিনি কি বলিলেন?" অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—আমি যাহা প্রত্যাশা করি নাই, তিনি তাহা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"আমি যদিও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই, যদিও কাশীধাম হইতে এখন কিছুদিন কলিকাতায় ফিরিবার বাসনা আমার ছিল না, কিন্তু তুমি যখন বিপন্ন এবং তোমার শরীর যখন ভগ্ন, তোমার জন্য, তুমি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সকল প্রকারেই তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।" তাহার পর অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বলিয়া আসিয়াছি, কলিকাতায় গিয়াই তাঁহাকে পত্র লিখিব, আমার পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতায় যাইবেন বলিয়াছেন।"

সেই দিনই অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কারণ চুণিবাবুর প্রভাবে অমরেন্দ্রনাথের যে সকল "হিতৈষীর" স্বার্থহানি হইতেছিল, তাঁহারা প্রত্যেকেই থিয়েটারের এক একটী "ভূষণ্ডী"। কোন অধ্যক্ষের কি প্রকৃতি—কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা—কোন দেবতা কি প্রকার তোষামোদে প্রসন্ন হন—তাঁহারা তাহা বিশেষই জানিতেন। প্রাচীন নাট্যাচার্য

স্থির গম্ভীর অমৃতলালের কঠোর শাসনাধীনে স্বার্থসাধনের আশা নাই,—ইহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাই রোগগ্রস্ত অমরেন্দ্রনাথকে প্রলুব্ধ করিয়া আর কাহাকেও আনাইবার অবকাশ না দিয়া তাহাকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।"

কাশী হইতে অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া আবার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কাশী হইতে আসিবার সময় ভাবিয়াছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিবেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার সে মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। সেই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি আবার থিয়েটারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। সওদাগর নামক একখানি নাটক বহুদিন হইতে রিহার্সালে পড়ি পড়ি করিয়াও নানা কারণে পড়ে নাই। অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াই তাহার রিহার্সাল আরম্ভ করিয়া দিলেন। নাটকখানি যাহাতে দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহার জন্য অমরেন্দ্রনাথ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। রিহার্সাল সম্পূর্ণ হইবার পর "সওদাগর" নাটক মহাসমারোহে ষ্টারে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। এই নাটকে তিনি কুলীরকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূমিকাটি যতদূর সুন্দর অভিনয় হওয়া সম্ভব তাহা তিনি করিয়াছিলেন। সওদাগর নাটক অভিনয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বড় দিনের জন্য "গোঁসাইজীর" মহালা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি রিহার্সল দিতেও তাঁহারও কম পরিশ্রম হয় নাই।

এদিকে যতই অত্যাচার বাড়িতেছিল রোগও ততই তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছিল। ২৫শে অগ্রহায়ণ শনিবার—সেই দিনই অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। ইহার পর আর তাঁহাকে অভিনয় করিতে হয় নাই। শনি রবিবারের বিজ্ঞাপন পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছিল কাজেই অমরেন্দ্রনাথকে রোগসত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় নামিতে হইয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। সুতরাং আর তিনি অভিনয় করিতে পারিলেন না। শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় সোমবার ষ্টীমারযোগে সুন্দর বন হইয়া তিনি গোয়ালন্দ যাত্রা করিলেন। তিনি যে দিন গোয়ালন্দ উপস্থিত হন, সেই দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পীড়িত অবস্থায় অমরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃবিয়োগের এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটাও প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পর ৩ রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ এক ভাবেই ছিলেন। কেহ একদিনের জন্যও ভাবে নাই যে অমরেন্দ্রনাথ আর শয্যা ত্যাগ করিবেন না। ৪ঠা জানুয়ারী হইতে রোগের ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হইল। ডাক্তাররা মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইবে? দশ দিন জীবন ও মৃত্যুর অবিরাম তুমুল সংগ্রামের পর অমরেন্দ্রনাথ মহামুক্তিলাভ করিলেন,—তাঁহার বন্ধুবর্গ, আত্মীয় স্বজন ও গুণমুগ্ধ দর্শকগণকে কাঁদাইয়া দিব্য জ্যোতির্ময় অমরধামে চলিয়া গেলেন। ১৩২২

সালের ২১শে পৌষ বৃহস্পতিবার শেষরাত্রে চারিটা দশ মিনিটের সময় ব্রাহ্মমুহূর্তে বঙ্গরঙ্গভূমির অন্যতম গৌরব অমরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করিলেন। শুক্রবার প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ নাই এ কথা সমস্ত সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক অমরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বেলা নয়টা না বাজিতে বাজিতে অমরেন্দ্রনাথের হাতীবাগানের বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বেলা ১১টার সময় অমরেন্দ্রনাথের শবদেহ রাজবেশে সজ্জিত হইয়া হাতীবাগানের বাটী হইতে বাহির হইল। অমরেন্দ্রনাথের শবদেহ প্রথমে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে, তাহার পর ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে নামান হইল। বেলা প্রায় ১২টার সময় অমরেন্দ্রনাথের শবদেহ নিমতলা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমতলা ঘাট লোকে লোকারণ্য,—অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্রোন্দনরোলে সমস্ত শ্মশানভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ শেষ কার্য সম্পূর্ণ করিলেন। অগ্নি ধুক্‌ধুক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।

অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্থিব লীলা শেষ করিয়া চিরতরে চলিয়া গেলেন বটে; কিন্তু তিনি যে কীর্তি রখিয়া গেলেন তাহা চিরদিন ধরার পৃষ্ঠে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালাদেশে থিয়েটার থাকিবে ততদিন আর কাহাকেও বলিতে হইবে না অমরেন্দ্রনাথ কে ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন,—আর দ্বিতীয় অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গ রঙ্গালয়ে আসিবে কি না সে কথার মীমাংসা করিতে পারেন শুদ্ধ অন্তর্যামী।

সমাপিকা

অমরেন্দ্র-প্রতিভা

প্রাচ্য ভূখণ্ডে নটব্যবসায় অতি হেয়, সামান্য আফিসের চাকুরী হইতেও নিন্দনীয়। সেই জন্য উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় অভিজাতবৃন্দ অভিনয় কার্যে যোগদানে বিরত। কিন্তু প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অভিনয়-ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় আদরণীয়, অভিজাতগণও নটব্যবসায়ে উদাসীন নহেন। বস্তুতঃ নাট্যানুশীলন ও অভিনয় চর্চা চতুঃষষ্টি ললিত কলার প্রধানতম অঙ্গ। দেবতার ও আর্যদের ভারতে ইহাদের সমধিক আদর ও অনুশীলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কীরূপে এই সৎ সাহিত্যানুশীলনীর এতদূর হেয়তা ও নিন্দাস্পদতা লাভ হইয়াছিল তাহা সহৃদয় সুধীমাত্রেরই সবিশেষ অনুধাবনার যোগ্য। দেবর্ষি ভরত পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবদেব সদাশিবের নিকট যে পবিত্র কলাবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতির দ্বারা যাহার পূর্ণ অনুশীলন করাইয়াছিলেন, যাহাকে আর্যঋষিগণ পঞ্চম বেদ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, সেই নাট্যানুশীলন কি কখনও নিন্দিত বা ঘৃণ্য হইতে পারে? তবে যেমন অসৎ কাব্যের ক্রমশঃ প্রসারে সুধীগণ নিতান্ত ভীত ও বিরক্ত হইয়া "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ" এই ঘোষণা প্রচারে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমাদের মনে হয়, কালে এইরূপ অসৎ নাট্যাদির প্রচারে এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চরিত্রাভাব প্রদর্শনে সহৃদয় সুধীসমাজে নটকুলের নিন্দা এবং নাট্যচর্চার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ আর্য্য নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক অসৎ নাট্যগ্রন্থ কিংবা অসাধু অভিনেতার জন্য পবিত্র নাট্যশাস্ত্র ও প্রতিভার প্রধান বিকাশক্ষেত্র অভিনয়-কলা কখনও নিন্দিত কিংবা বিদ্যোৎসাহীর অনাদরের বিষয় হইতে পারে না। সাধু ও অসাধু সর্বত্রই বিদ্যমান। এমন যে পবিত্রতার পূর্ণমূর্ত্তি সন্ন্যাসব্রত—তাহাতেও তো সর্বত্র ভেল দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য কি সন্ন্যাসব্রত কখনও কাহারও নিন্দার্হ?

শিক্ষা তিন প্রকার ঃ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ শিক্ষাই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার প্রধানতম অঙ্গ ললিত

নাট্যানুশীলন মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান। জগতের মধ্যে যে জাতিই মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রভাবে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছিলেন বা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন, জাতীয় নাট্য-সাহিত্যই তাঁহাদের সভ্যতার চরম নিদর্শন। অতি পুরাতন কাল হইতেই নাট্যসাহিত্যের পরম সমাদর না থাকিলে কবিচূড়ামণি এসকাইলাস, সফোক্লিস, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, বেন জনসন, মোলিয়র, রেসিনি, গেটে প্রভৃতির সকল শিল্প ও বিজ্ঞান সমুদিত বিশ্বপূজ্য জাতিদিগের মধ্যে এত আদর ও গৌরব দেখা যাইত না; এবং দেবর্ষি ভরত, কোহল ও শাণ্ডিল্য হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যারিক, মিসেস সিডনস্, সেরিডন ও স্যার হেন্‌রি আইয়ারভিঙ্গ পর্যন্ত অভিনেতৃকুলের এত সম্মান ও বরণীয়তা হইত না। আমাদের বর্ত্তমান নাট্যচর্চা ও রঙ্গালয়ের অভিনয় ইয়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে, সুতরাং আমাদের দেশের নাট্যগৌরব ও অভিনেতৃ-সম্মান ইয়োরোপীয় রীতি অনুসারেই পরিবর্দ্ধিত হইবে। কিঞ্চিদূন শতাব্দী পূর্বে যে ডাক্তারী ও পূর্ত্তবিদ্যাকে লোকে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিত, এখন তাহা অভিজাত-চূড়ামণিরও পরম আদরের সামগ্রী হইয়াছে। তবে প্রতি কার্য্যই এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়ে গোড়া অভিজাতগণের নিকটে অশেষ নিন্দা ও ঘৃণা আবাহন করে। পূজ্যপাদ রায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরাজীর অনুকরণে নূতন উপন্যাস প্রণয়নে, পূজনীয় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ও রায় দীনবন্ধু মিত্রকে অভিনব নাট্যপ্রণয়নে এবং সম্মানার্হ গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালকে নটজীবন-গ্রহণে প্রথমে গোঁড়া বৃদ্ধদের নিকটে অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভুগিতে হইয়াছে। কত শত বঙ্কিমের উপন্যাস গোলদীঘির জলে নিমজ্জিত হইয়াছে উহার সংখ্যা করা যায় না, কত সহস্র মুখে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালের নিন্দা ও দুর্নাম সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছে উহার পরিমাণ নাই। কিন্তু কাল-স্রোতে আবার গুণের আদর বাড়িয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র নব্যসম্প্রদায়ের শিরোমণি হইলেন। জগৎ-বরেণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কি বহুবিবাহ সমাজ হইতে রহিত করিতে গিয়া অশেষ লোকের প্রকাশ্য গালি ও নিভৃত প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয় নাই?

অমরেন্দ্রনাথের জীবনী সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে নাট্যাভিনয়ে জীবন-উৎসর্গই জন্মাবচ্ছিন্ন তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিকী বাসনা। সেইজন্য তিনি লেখাপড়ায় পর্য্যন্ত আবাল্য নিতান্ত উদাসীন ছিলেন, কেবল নাট্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়াই নিরত থাকিতে ভালবাসিতেন। এইজন তাঁহাকে কত গুরুতর লাঞ্ছনা ও তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছে, কেননা অভিনয়-অনুশীলন বঙ্গবাসীর চক্ষে অতি হেয়, বিশেষতঃ তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত বংশের তরুণের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর ও অবমাননাজনক। যদি আমাদের দেশে ইয়োরোপ ইত্যাদির ন্যায় স্কুল অব্ এলোকোয়েন্‌স্ (School of Eloquence) থাকিত, তাহা হইলে তথায় শিক্ষালাভ করিয়া হয়ত অমরেন্দ্রনাথ, পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ নাট্যাভিনয়ে যেরূপ স্বাভাবিক প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন,

তাহাপেক্ষা সহস্রগুণ পাণ্ডিত্য লাভে বঙ্গে অভিনয়কলা সম্বন্ধে এক অপূর্ব আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। অভিনয়ের প্রতি তাঁহার এতদূর ঐকান্তিকী আসক্তি ছিল যে তাঁহার বন্ধুদিগের পরামর্শ মত কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই নিজের সাধের বিবাহের যৌতুক চেন ও আংটী বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া, অভিনেতার সঙ্গে পরিচয় অসম্ভব বলিয়া, অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের মানসে যাত্রা করিয়াছিলেন। গৃহে আদর্শ পতিরতা পত্নী, ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিত অনুকরণীয়-চরিত্র ভ্রাতা, স্নেহময় জনক-জননী, সমুদয় ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ প্রাণের অভিনয়-পিপাসা মিটাইবার জন্যই কুসঙ্গীদের কুপরামর্শে তাঁহাকে কত শত হেয়, নিন্দনীয় কার্যে নিরত থাকিতে হইয়াছে। প্রকৃত চালক থাকিলে ইহার কিছুরই আবশ্যক হইত না। তিনি যে ব্রত উদ্যাপনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়া, সেই অভিনয়-কলার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। এইরূপে আমাদের দেশে বিবিধ বিদ্যার উন্মেষ ও পরিপূর্ত্তির উপায়ের অভাবে কত কোটি কোটি প্রতিভা যে অকালে করাল কালের কঠোর গ্রাসে নিপতিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। আমাদের দেশে বিদ্যার্জ্জন শব্দে শুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই বুঝা যায় না। চিত্রণ, বয়ন, ভাস্করকার্য, অভিনয়, সঙ্গীত, নর্ত্তন, সূচীকার্য্য, সূত্রধারের কার্য্য, কৃষি চালনা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার অঙ্গ বলিয়াই গণ্য নহে। সুতরাং কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঘটনাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেই, সর্বসমক্ষে সেই ব্যক্তি অকর্ম্মা, ব্যর্থজীবন হইয়া রহিল। সে যেন জগতের সমস্ত কার্য্যেরই বাহিরে। এই জন্যই জগতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গভূমি, উর্দ্ধে আরোহণে অদ্যাপি সম্পূর্ণ অক্ষম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণও কেবল ওকালতী, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারীং, মাষ্টারী, ও আফিসের কেরাণীগিরি ব্যতীত কার্য্যান্তরে প্রবেশে অক্ষম হইয়া দারিদ্র্যের করাল কবলে অকালে বিষাদময় জীবনের অবসান করিতেছেন। বিদ্যা যে অনন্ত, তাহার বিষয় যে অপরিসীম, ইহা কাহারও সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে স্থানলাভে অসমর্থ। আবার সংস্কারবশতঃ কেহ যদি সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে তাঁহার কর্ম্মকাণ্ড প্রসার করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতিকূল চীৎকারে দেশময় মুখরিত হইবে। ফলে সেই নবীন কর্ম্মোদ্যোগী ব্যক্তির কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়, আর তাঁহার জীবন নিষ্ফল বিষময় হইয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপ হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস প্রথম হইতে অমরেন্দ্রনাথ যদি স্বীয় নিসর্গ-প্রণোদনার অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত চালকের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনিও কালে স্বীয় অবিনশ্বর কীর্ত্তিকলাপে বিশ্ব পূর্ণ করিয়া স্বয়ং অক্ষয় অমর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিতেন। তাঁহার নাম উচ্চারণে সকলের নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুপ্রবাহ নির্গত না হইয়া সুধীজন হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত ও বক্ষ গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিত।

যাহা হউক অমরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া, অতি কৈশোরে কুসঙ্গীর কুপরামর্শে স্বস্থানচ্যুত হইয়া নানারূপ অপথে চলিয়া, এমন কি তাহার ফলে

অকালে অমূল্য জীবনরত্ন হারাইয়াও, যাহা উপহার স্বরূপ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহাতেই বঙ্গবাসী তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই অমরেন্দ্রনাথ ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ২৯ খানি নাটক ও গীতিনাট্য এবং অনেকগুলি গীতিকবিতা ও একাধিক জীবন্ত চিত্রপূর্ণ উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গবাসীর করকমলে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৮।১০ খানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ও তদুচিত সঙ্গীত রচনা দ্বারা সেইগুলি প্রশংসার সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়পূর্বক নিজের প্রবীণ স্বাভাবিক নাট্যকলাসুখলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সর্ব্ববিধ অভিনয়-কলা ও থিয়েটার পরিচালনায় অসাধারণ শক্তিমত্তা প্রদর্শনেও নাট্যামোদিমাত্রেরই হৃদয়-কন্দরে পূর্ণ আনন্দ বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবলি দর্শনে কে বলিবে যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন না?

তৎকৃত গ্রন্থাবলী ও তৎসঙ্গে কোন থিয়েটারে উহারা প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা পাঠকবৃন্দের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে আমরা প্রদান করিতেছি। *

ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত

১।	হরিরাজ	....	....	নাটক।
২।	শিবরাত্র	....	....	গীতিনাট্য*
৩।	কাজের খতম	....	....	পঞ্চরং।
৪।	নির্ম্মলা	....	....	গীতিনাট্য।†
৫।	মজা	....	....	নক্সা।
৬।	দুটিপ্রাণ	....	....	গীতিনাট্য।
৭।	ফটিক জল	....	....	নাটিকা।
৮।	থিয়েটার	....	....	পঞ্চরং।
৯।	শ্রীকৃষ্ণ	....	....	গীতিনাট্য।
১০।	শ্রীরাধা	....	....	ঐ।
১১।	ভক্তচিটেল	....	....	পঞ্চরং।
১২।	মানকুঞ্জ	....	....	গীতিনাট্য।
১৩।	এস যুবরাজ	....	....	রূপক।

† বাল্যকালে শ্রুত মধুসূদন দাদার ও গুরুমহাশয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে নির্ম্মলা বিরচিত। ইহাতে নাট্য সম্পত্ বিশেষ কিছু না থাকিলেও, নগ্ন নিসর্গ ভাবের বর্ণনা বেশ আছে। কবির প্রথম জীবনের কাহিনীও কিছু কিছু আছে।

১৪। চাবুক .... পঞ্চরং।
১৫। দোললীলা .... গীতিনাট্য।
গ্রাণ্ড থিয়েটারে অভিনীত।
১৬। ঘুঘু .... পঞ্চরং।
১৭। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ.... .... রূপক।
(দ্বিতীয়বার আগমনের পর ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত)।
১৮। প্রণয় না বিষ? .... নাটক।
মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।
১৯। দলিতা ফণিনী .... নাটিকা।
ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।
২০। কেয়া মজাদার .... রঙ্গনাট্য।
২১। আশা কুহকিনী .... নাটিকা।
গ্রেট ন্যাসেনালে অভিনীত।
২২। জীবনে মরণে .... নাটিকা। *
২৩। আহামরি .... পঞ্চরং।
দ্বিতীয়বার ষ্টার থিয়েটারে গমনের পর অভিনীত।
২৪। কিস্‌মিস্‌ .... রঙ্গনাট্য।
২৫। রোকশোধ .... রঙ্গনাট্য।
২৬। বড় ভালবাসি .... গীতিনাট্য।
২৭। প্রেমের জেপলিন .... রঙ্গনাট্য।
বালরচনা (কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই)।
২৮। উষা .... গীতিনাট্য।
শেষ রচনা (অদ্যাপি কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই)
২৯। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট.... .... নাটিকা।
উপন্যাস।
১। আদর। ২। অভিনেত্রীর রূপ।

উপরিপ্রদত্ত অমরেন্দ্রনাথের বিরচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা দৃষ্টে আমরা দেখিতে পাই, তিনি নাট্যসাহিত্যের সর্বাঙ্গেই হস্তামর্শন করিয়াছিলেন। হরিরাজের ন্যায় গুরুভাবাপন্ন নাটক হইতে চাবুকের ন্যায় সমাজ শিক্ষার জ্বলন্ত পঞ্চরং পর্য্যন্ত রচনায় সর্বত্র তাঁহার

* কবিকুলরবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'দলিয়া' নামক গল্প অবলম্বনে বিরচিত।

* এই তালিকাটি আমরা অমরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হবীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক পাঠক সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি।

* ক্লাসিক থিয়েটার খুলিবার পরই যে শিবরাত্রি অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শিবরাত্রিতে প্রথম অভিনীত।

অপ্রতিহত শক্তি প্রকটিত। ইহাদিগের মধ্যে কাজের খতমের মতিলাল চরিত্রে, চাবুকের প্রিয়লাল চরিত্রে, মজার হরিহর চরিত্রে, সর্ব্বোপরি অভিনেত্রীর রূপে নলিনী চরিত্রে, কবি তাঁহার স্বীয় জীবন প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঘুঘুতে, যাহাদের চক্রান্তে তাঁহার বক্ষঃ-শোণিতের তুল্য আদরের ক্লাসিক থিয়েটার উঠিয়া গিয়াছিল, তাহাদের অবিকল জীবন্ত চিত্র প্রকটিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রণীত কোন পঞ্চরংই কল্পিত চরিত্র অবলম্বনে প্রণীত নহে। তৎ-প্রণীত শুদ্ধ এই চরিত্রগুলির পাঠেই বেশ পরিস্ফুট হইবে, যে কবির জীবনের লক্ষ্য কি মহৎ ছিল, কিন্তু কিরূপে নিজের বয়স্তারুণ্যে ও অনভিজ্ঞতায় কুসঙ্গীর কুপরামর্শে পরিচালিত হইয়া সত্য মনে করিয়া অসত্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবন বিপথগামী হইয়াছিল, কিরূপ আমরণ তাঁহাকে তজ্জন্য সন্তপ্ত থাকিতে হইয়াছে। জীবনের এরূপ জ্বলন্ত ছবি অন্য কোনও কবির লেখনী মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কবিবর তদ্‌বিরচিত আদর উপন্যাসেও শ্যামাচরণের চরিত্রে নিজের জীবনের দুর্বলতাগুলি বেশ ফুটাইয়া চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই কবি ছিলেন, তাই প্রকৃত কবির ন্যায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে নিজ জীবনের গুণ দোষ সকলই অকপটে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা হৃদয়ের সুমহতী প্রসারতা ব্যতীত কখনও সম্ভবপর নহে।

অমরেন্দ্রনাথ মাত্র একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক বিরচিত করিয়াছিলেন। নাটকখানির নাম হরিরাজ। নাটকীয় চরিত্রগুলি সেক্‌সপীয়র হইতে পরিগৃহীত হইলেও বাঙ্গালায় তাহারা সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনয়ে সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী। ইহা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। উহাতে ভাষাবিচার ও চরিত্রানুরূপ বাক্যপ্রয়োগে কোথাও অকুশলতা পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্গীত প্রণয়নেও কিশোর নাট্যকারের বিশেষ প্রবীণতা পদে পদে বিদ্যমান। সেক্‌স্‌পীয়রের দুইখানি নাটক হইতে গল্পাংশ গৃহীত হইলেও আখ্যান বস্তুর সমাবেশ বেশ সুসঙ্গত ও প্রশংসার্হ। দৃশ্য সংযোজনায়ও কোনও ত্রুটি হয় না। তবে স্থানে স্থানে যাহা কিছু অঙ্গাভাব আছে তাহা গ্রহণীয় নহে। আমরা নাটকখানি পাঠ করিয়া ও উহার অভিনয়ের কথা স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া নবীন নাট্যকাবকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। বিশেষতঃ তরুণ অমরেন্দ্রনাথের হরিরাজের ভূমিকায় বিচিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ভূমিকায় ও ভ্রমরে গোবিন্দলালের ভূমিকায় যুবক অমরেন্দ্রনাথেব অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া কবি চূড়ামণি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় যে প্রথম হইতেই, স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব্ব অভিনয় কুশলতায় পরিপূর্ণ ছিল তাহার জাজ্বল্যমান পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

ভাই অমর, পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তিত করিয়া গত শনিবার 'ভ্রমর' নাম দিয়া যে অভিনয় করিয়াছ তাহা দেখিয়া যারপর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

মনে পড়ে কি সেইদিন—যেদিন প্রথম তোমাকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সিরাজের অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখি? সেইদিন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে নাট্যজগতে একদিন তোমার বহু উচ্চে স্থান হইবে, তুমি বঙ্গবাসীর পরম আদরের সামগ্রী হইবে। তখন আমার কথা শুনিয়া তুমি হাসিয়াছিলে, কিন্তু এখন আমার সে সময়ের গণনা সত্য হইয়াছে কি না?

A nation is known by its Theatre—কথাটি বড়ই ঠিক। আমাদের যেমন দেশ, থিয়েটারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাও তদ্রূপ। তোমার অবিদিত নাই অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁহারা বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান রাখেন, তাঁহারা থিয়েটারের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি তাঁহারা যত বড় লোক হউন না কেন, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি সুখী হও, তুমি যশস্বী হও, রঙ্গভূমির প্রতি তোমার ভালবাসা অক্ষয় অমর হউক।"

বস্তুতঃ কবি প্রফেটের ন্যায় সর্বজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্-বেত্তা। কবিবর নবীনচন্দ্রের কথাগুলি তৎকালে তাদৃশ শ্রদ্ধার্হ না হইলেও এখন সকলেই উহার তত্ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছেন।

সংস্কারক বহু আয়াসেও যে সব সামাজিক বা নৈতিক সংস্কার লোকহৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারেন না, কাব্যকার ও উপন্যাসকার অনায়াসে তাহা করিয়া থাকেন, আবার শ্রব্যকাব্যকার ও উপন্যাসকার স্ব স্ব গ্রন্থ-প্রচারে বহু বৎসরান্তেও যে সব কুসংস্কার দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না, দৃশ্যকাব্যকার এক দিনের অভিনয়ে তাহা বিদূরিত করিতে সমর্থ। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বহুবিবাহ-প্রথা এ দেশ হইতে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র অনায়াসে সেই পাপ সংস্কার দেশ হইতে একরূপ উঠাইয়া দিয়াছেন। আবার বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র বহু আয়াসেও যে স্বদেশানুরাগ নিদ্রিত বঙ্গে জাগাইতে পারেন নাই, বঙ্কিমের আনন্দমঠের অভিনয়ে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ও গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ে সেই অনুরাগ দেশময় দাবানলের ন্যায় উৎসরিত ও প্রকটিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রই নাট্যাভিনয়ে নিরীশ্বর বঙ্গকে ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসাইয়াছিলেন। আবার অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চরং ও নাট্যরঙ্গ গুলিতে লোকের চোখের ঠুলি খুলিয়া মানবচরিত্রের নারকীয় লীলাগুলি সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক সহৃদয় সাহিত্যসেবীগণ তাঁহার অভিনয়ের তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ে লোকে ঠিক নিজের ভিতরের পুণ্য ও পাপগুলি চাক্ষুষ দেখিতে পাইত বলিয়াই তাঁহার সময় হইতে থিয়েটারে অভিনয় দর্শকের সংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ অন্যান্য নাট্যকার ও অভিনেতৃগণ অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে সমাজচিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন তাহা কি স্বীয় গ্রন্থে, কি স্বীয় অভিনয়ে কখনও অবিকল বিশ্লেষণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাই তাঁহার রঙ্গনাট্য ও পঞ্চরং এবং

উপন্যাসগুলি ভাষা-সম্পদে, চরিত্র-বৈচিত্র্যে, গ্রথন-পারিপাট্যে অতি উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, অকপট সত্য বিবৃতিতে, দোষগুণের অবিকল-চিত্র-সংগঠনে ও ভাববিকাশে তাহাকে সর্ব্বাগ্রণী করিয়া রাখিয়াছে। অপর নাট্যকারের চরিত্রাভিনয়েও অমরেন্দ্রনাথ এমন একটী বাস্তব জীবন্ত ছবি ফুটাইয়া তুলিতেন যে তাহা একরূপ অদ্ভুত, অনন্যসাধারণ, অননুকরণীয়,—তাঁহারই নিজস্ব। উহাই তাঁহাকে নাট্যামোদিমাত্রের নিকটে চির আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার অভিনয়ে অভিনেতার শিক্ষিত পাটব ছিল না, স্বভাবের নগ্ন অকৃত্রিম শোভা সর্ব্বত্র বিরাজিত। যেমন আকৃতি, তেমনই কণ্ঠস্বর—তেমনই সাত্ত্বিকতা—অভিনেতৃরূপেই বিধাতা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপরাপর অভিনেতার চরিত্রানুরূপ সাজ, পোষাক, মেক-আপ প্রভৃতি বিস্তর সাজসরঞ্জামের আবশ্যক হইত অমরেন্দ্রনাথের নিসর্গদত্ত রমণীয় আকৃতি ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের গুণে তাঁহার আহার্য শোভার কিছুই দরকার হইত না। তাই তিনি যে ভাবে যে চরিত্রে যখনই আভির্ভূত হইতেন, তখনই তাঁহাকে তাহাতে বেশ মানাইত। এমন কি ভূপেন্দ্র বাবুর 'Sign of the Cross' নাটকে বিদেশীয় নাট্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অমরেন্দ্রনাথের মার্কাসের ভূমিকায় অবতরণে তাঁহার চেহারা ও অভিনয় দেখিয়া বিদেশীয় সুসম্ভ্রান্ত সাহেবরা পর্য্যন্ত আনন্দে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"Mr. Dutt, You are Garic of all nations."*

নাট্যকার, রঙ্গনাট্যকার, ও গীতিনাট্যকার এদেশে অমরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে অনেক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটক, গীতিনাট্য ও রঙ্গনাট্যগুলি এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর। পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থের সহিত অমরেন্দ্রনাথের গ্রন্থের কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে না। ইহাই ইহাদের বিশেষত্ব। অমরেন্দ্রনাথ উচ্চ সাহিত্য লক্ষ্য করিয়া কিছুই রচনা করেন নাই, তাঁহার গ্রন্থগুলি তাৎকালীক দর্শক ও তাঁহার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যের লোকগুলির চরিত্রের অবিকল অনুকরণেই বিরচিত। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের স্বীয় জীবনের সুখ ও দুঃখ, লাভ ও লোকসান, বন্ধুত্ব ও নিমকহারামী এবং তাঁহার প্রিয় দর্শকবৃন্দের চিত্তসুখপ্রদ বিষয় তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য এবং সেগুলি তিনি অকপটে বক্ষঃশোণিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তখন উহারা সকলের অত্যন্ত হৃদয় ও আদরের হইয়াছিল। অমরেন্দ্র-নাট্যে তাঁহার নিজের পরিবেশের অন্তর্গত এক একটী লোকের জীবন্ত চিত্রের অভিনয় দেখিতে দেখিতে সকলেই মূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, কেন না অমরেন্দ্রনাথের নিজের জীবনীও যে সম্পূর্ণ নাট্যলীলাময়।

---

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু তাঁহার 'Sign of the Cross' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বয়ং মার্কাসের ভূমিকা অভিনয় করিয়া এরূপ একটী নূতন ছবি দেখাইলেন যে বঙ্গদেশে কোনও অভিনেতা অথবা কোনও দর্শক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ দর্শক মহোদয় সেদিন মার্কাসের অভিনয় দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া বলেন—Mr. Dutt you are Garic of all nations'.

অমরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য অভিনয়। উহা তাঁহার বাল্যের আদর্শ; কৈশোরের স্বপ্ন এবং প্রথম যৌবনের জাগরণ। এই স্বপ্নে বিভোর হইয়া কৈশোর ও যৌবন সন্ধিতে তাঁহাকে পতঙ্গ-বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য অতি মহত্ বলিয়া পতঙ্গের পরিণাম তাঁহাকে একেবারে প্রাপ্ত হইতে হয় নাই,—উত্তালতরঙ্গ সঙ্কুল সাগরগর্ভে বাতবিক্ষুব্ধ কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় পদে পদে জীবনমরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলেও, একেবারে মধ্য দরিয়ায় ডুবিতে হয় নাই। সাধনাবলে কাণ্ডারীহীন হইয়াও তরণী অবশেষে চির আকাঙ্ক্ষিত সুবর্ণ-সফলতার তীরে উপনীত হইতে পারিয়াছিল। পিতৃগৃহ প্রাপ্ত বিপুল ধনরাশি থিয়েটারে তিনি ব্যয়িত করেন নাই, উহা থিয়েটারে প্রবেশের পূর্ব্বেই কুসঙ্গীর কুচক্রে মাঝ দরিয়ায় বিসর্জিত হইয়াছিল। তিনি বিনা কপর্দ্দকে থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল স্বীয় প্রতিভাবলে ও সাধনাপ্রাবল্যে অশেষ সুখ্যাতির সহিত বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, আবার অর্থনীতির জ্ঞানাভাবে সমুদায়ই খুয়াইয়াছিলেন। অর্থনাশে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যনাশেই সর্বনাশ হইল। শেষে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যখন চারিদিকে দৃষ্টি পড়িল তখন প্রতিভার নিকটে কিছুই অবিদিত রহিল না। বঞ্চকের বঞ্চকতা, চাটুকারের মিশ্রির ছুরিকা, সকলই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না, দেহ অবসন্ন—মন পীড়িত। পরিশেষে পতিব্রতা সতীর শুশ্রূষায় ও স্বর্গীয় প্রেমমাহাত্ম্যে মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আবার সোনার সংসার পাতাইলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার সহিল না, কেননা সাধ্বী যে স্বীয় জীবন বিনিময়ে পতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই তিনি আরাধ্য দেবতাকে স্বমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বংশপ্রতিষ্ঠা সত্যেন্দ্রনাথকে সাদরে অর্পণ করিয়া পতিপদে চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চিরেপ্সিত পতিব্রতালোকে গমন করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের প্রতীক্ষায় তথায় ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। হেথায় লক্ষ্মীশূন্য নারায়ণ আর কতদিন থাকিতে পারেন! তিন বৎসর যাইতে না যাইতে অভিনেতৃরত্ন সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পতিব্রতাপার্শ্বে দিব্যলোকে গমন করিলেন।*

অমরেন্দ্রনাথ স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে কেহ দুঃখিত নহে, কেননা সকলকেই তথায় যাইতে হয়। কিন্তু চিরপ্রার্থিত বাসন্তী পূর্ণিমার রজনী হইতে না হইতে প্রভাত উপস্থিত হইলে কাহার না প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? প্রতিভার বিকাশ হইতে না হইতেই যদি লুপ্ত হইয়া যায় তাহাতে কাহার প্রাণ না হাহাকার করে? যে বয়সে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার বিকাশ সবে উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই বয়সে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই অমরেন্দ্রনাথের ভবলীলা শেষ হইল! ইহা কি বঙ্গবাসীর কম আক্ষেপের বিষয়, কম ক্ষোভের কারণ! বাঙ্গালার এই

---

* শ্রীমতী হেমশশিনী ১৯২০ সালের ৩০শে বৈশাখ পরলোক গমন করেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২২ সালের ২১শে পৌষ মানবলীলা সংহরণ করেন।

দুর্ভাগ্য চিরদিনই অটুটভাবে বিদ্যমান। কবিবর জয়দেব ও চণ্ডীদাস হইতে পণ্ডিতকুলতিলক রামকমল পর্য্যন্ত কত শত 'বঙ্গবাণীবিনোদ-নিকুঞ্জের কোকিল কুল' বসন্তের প্রারম্ভেই চলিয়া গিয়াছেন! মহিলাকাব্যের সুরেন্দ্রনাথ, যোগেশকাব্যের ঈশানচন্দ্র আরও কত কত বঙ্গ কাব্য-সরোবরের শতদল বিকসিত হইতে না হইতেই শুকাইয়া গিয়াছে! বঙ্গমাতার প্রতি ভাগ্যদেবতা বড়ই অপ্রসন্ন!

অমরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফলতা লাভের পূর্ব্বেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলেও, বঙ্গরঙ্গালয়ে তাঁহার অপ্রতিহত সুসমুন্নত স্থান দর্শনে পরম পুলকিত। যদ্যপি তিনি সাধারণ নাট্যশালায় আদি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতমরূপে গৃহীত হইবার অধিকারী নহেন, তথাপি রঙ্গালয় যে সর্বশ্রেণীর লোকের আদরের সামগ্রী ও নাট্যাভিনয় দর্শনে মৃত সমাজ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগরিত হয় তাহা তিনিই বঙ্গবাসীর নেত্রসমক্ষে প্রথমে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। সমাজের অন্তর্নিহিত বিষম পাপগুলি অমৃতলাল ও অমরেন্দ্রনাথ, ইহারা দুই জনেই আমাদিগকে জ্বলন্ত অক্ষরে জীবন্ত চিত্রে দেখাইয়া দিয়াছেন। অমৃতলালের চিত্রগুলি সাহিত্য-হিসাবে অদ্বিতীয়। অমরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি নগ্ন স্বভাবসৌন্দর্য্যে অননুকরণীয়। অমরেন্দ্রনাথ সাহিত্যের দিক্ দিয়া আদৌ কোন চরিত্রাঙ্কনে অগ্রসর হন নাই, সে বিদ্যা তাঁহার ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে দিক্ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি অদ্বিতীয়। তাজ্জব-ব্যাপার ও বিবাহ বিভ্রাট বিংশশতাব্দীর রঙ্গনাট্য-সাহিত্যকোহিনূর, কাজের খতম, চাবুক ও ঘুঘু বাহ্য সভ্য কিন্তু অন্তর্ঘুঘু অর্থাৎ 'পয়োমুখ বিষকুম্ভ' লোকদের মুকুর-প্রতিফলিত অবিকল প্রতিবিম্ব। তাঁহার 'দুটী প্রাণ' গীতিনাট্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাটকাকারে পরিবর্তন হইলেও, উহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্রে দর্পণে প্রতিফলিত জীবন্ত ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। উহা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের 'কৌতুক সর্বস্বের, জীবনহীন চিত্র নহে। অমরেন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত নৃত্য ও সঙ্গীত-বহুলতা তাঁহার নিজের দোষ নহে, উহা তখনকার দর্শকবৃন্দের রুচির পরিচায়ক মাত্র। তরুণ যুবক যে দিকে লোকের প্রবৃত্তির গতি বুঝিতে পারিতেন, সেই দিকেই তিনি গতি ফিরাইতেন। তাই পূর্বে বলিয়াছি যে সুচালকের হস্তে পড়িলে অমরেন্দ্র-প্রতিভার শুদ্ধ বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতে, অপূর্ব্ব দিব্য বিভা উচ্ছ্বসিত হইত। অমরেন্দ্রনাথের 'দলিতা-ফনিনী' ও 'প্রণয় না বিষ' এই দুইখানি নাটিকার উপাখ্যান ভাগ সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নাট্যকারের মৌলিক নিজস্বের একটুও অভাব নাই। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও যেমন অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন, তদঙ্কিত চরিত্র মধ্যেও ভাবের বিহ্বলতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। সেই ভাবাধিক্যই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলিকে এক সোণার স্বপনে ঘিরিয়া রাখিয়া দর্শক

ও পাঠকবৃন্দের চিত্তকন্দর সর্ব্বদা এক বিচিত্র অভিনব আবেশে বিহ্বল করিয়া রাখিত। উহাই তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের বিশেষত্ব—উহাই তাঁহার অদ্ভুত উন্মাদনা বিকাশ-ক্ষমতা।

রঙ্গালয় সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের আর একটী সংস্কার অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমাজে তাঁহাকে চিরদিন অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে। তিনিই প্রথমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বোনাস ও বেনিফিট প্রদানের রীতি প্রবর্তিত করেন। তাঁহারই প্রসাদে অদ্যাবধি অনেক ভদ্রসন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ না করিয়াও শুদ্ধ অভিনয় প্রতিভার বিকাশে পুত্রপরিজনসহ শান্তিতে বিনাড়ম্বরে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছেন।*

অভিনেতার জীবন যে হেয় ও নিন্দিত নহে, ইহা যে জীবনযাত্রা নির্বাহের অন্যান্য উপায়ের ন্যায় একটী ভদ্রোচিত ব্যবসায় তাহা অমরেন্দ্রনাথই প্রথমে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দেখাইয়াছেন। অভিনেতার বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্ত্তক। যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কত শত শত লোকের বিবিধ কর্ম্মদ্বার খুলিয়া যাওয়ায় দেশের অনেক অভাব দূরীভূত হইয়াছে, সেইরূপ অমরেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত দীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় ব্যাপারে প্রায় প্রতি রঙ্গালয়ে চতুর্গুণ লোকের আবশ্যক হওয়ায়, অনেক অশিক্ষিত অথচ অভিনয়প্রতিভান্বিত ভদ্র সন্তানের অন্নের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য আফিসের ন্যায় থিয়েটারে চাকুরীও এখন আর সকলের অসম্মানের নহে। বস্তুতঃ যাঁহাদের প্রতিভা অব্যবহারে বা অপব্যবহারে কেবল নষ্ট হইয়া যাইত, তাঁহারা প্রতিভানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমশঃ লোকসমাজে প্রতিভার বিকাশে বরণীয় হইয়া উঠিতেছেন। তাই আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার কখনও কাপ্তানের লীলা-ভূমি মনে করিতেন না, তাঁহার কুসঙ্গিগণ সর্বদা তাঁহাদ্বারা সেইরূপ ব্যবহার করাইলেও, তিনি সর্বদা থিয়েটার মন্দিরকে বাণীর বিনোদ-নিকুঞ্জ, ললিতকলার শিক্ষানিকেতন বলিয়া মনে করিতেন ও তদনুরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং পূতজ্ঞানে তথায় জীবনের সাধনা সম্পাদিত করিতেন।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল বাণীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সর্বসাধারণ্যে তাঁহার পূজার প্রচার করেন। অমরেন্দ্রনাথ গুরুপদে শিক্ষিত না হইয়াও স্বীয় জন্মাবচ্ছিন্ন সংস্কারবশতঃ একলব্যের ন্যায় অনন্যপরায়ণ সাধনা বলে সেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা প্রাণপণ সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। সংক্ষেপে তিনি বিনা শিক্ষায়—নাট্যকার

---

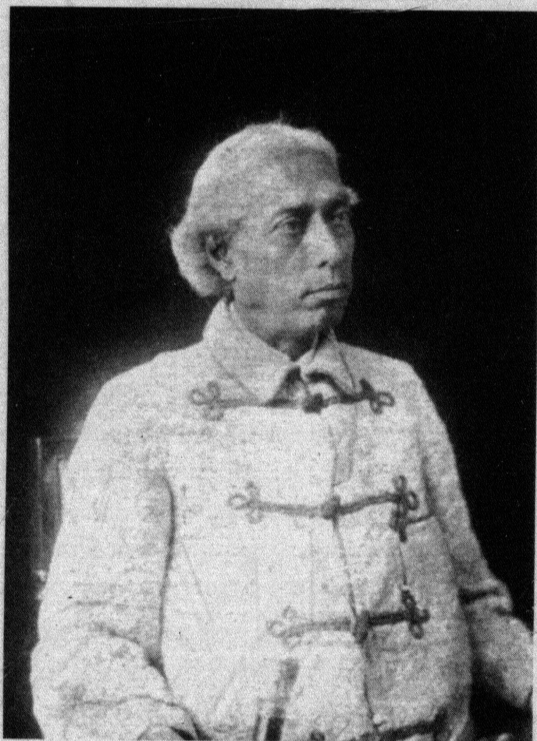
* নায়ক পত্রের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথের স্মৃতি সভায় বলিয়াছেন—"তিনি থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেতন বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে আজ বহু দুঃস্থ ভদ্র সন্তান ও অন্যান্যেরা সম্মানের সহিত স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনি যদি এই সকল কার্য্য না করিতেন তো বহু ব্যক্তি তাঁহাদের পরিবারের এবং নিজের ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ।

ও উপন্যাসকার, এবং প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ও রঙ্গালয়পরিচালক। বস্তুতঃ প্রতিভা যে শিক্ষার সহযোগ বিনাও স্বক্ষেত্রে সময়ে বিকশিত হইতে পারে তাহাও অমরেন্দ্র-জীবনের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন। প্রকৃত নেতার অভাবে প্রতিভার কিরূপ অপগতি হয়, তাহাই তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় উপদেশ। সর্বোপরি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও বহ্নি যে পরিশেষে জ্বলিয়া উঠিবেই—অমরেন্দ্রনাথের অনন্যাসাধারণ দয়া ও দক্ষিণতাই বঙ্গবাসীর প্রতি তাঁহার জীবনের চরম শিক্ষা।

যাও অমরেন্দ্রনাথ, যাও অমরধামে। কৈশোরে কুসঙ্গীর কুপ্রলোভনে মার্গচ্যুত হইয়া সংসারের অশেষ যন্ত্রণা-পারাবারের মধ্যে তোমাকে অশেষবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সাধ্বী পতিপ্রাণা পত্নীর দক্ষিণে সতীলোকে উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখে অবিরত তোমার চিরারাধ্য নাট্যকলার অধিষ্ঠাতৃদেবতা উমামহেশ্বরের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে অহর্নিশ নাট্যলীলা প্রত্যক্ষ করিবে। এ রাজ্যে বন্ধুর কৃতঘ্নতা নাই, পিশাচীর ছলনা নাই, অর্থের অসচ্ছলতার জন্য মানসিক অশান্তি নাই—আত্মীয় স্বজনের ভ্রান্তি বশতঃ তিরস্কার গঞ্জনা নাই. প্রাণাধিকা প্রিয়তমার বিচ্ছেদ যাতনা নাই—আছে শুধু সুখ—শান্তি—বিশ্রাম—শ্রদ্ধা—সাধনা ও সিদ্ধি!!! এই পবিত্র নিত্যানন্দধাম তুমি তোমার আজীবন সাধনায় ও পতিপ্রাণা সাধ্বীর দিব্য প্রাণান্তকর প্রণয়ে লাভ করিয়াছ! সাংসারিক যন্ত্রণাগুলি কেবল ভ্রান্তমার্গ পথিকের ন্যায় তোমায় ভুগিতে হইয়াছে,— পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের সঙ্গেই সমুদায় পঙ্কিলতা চিরতরে বিদূরিত হইয়াছে।

সমাপ্ত

অর্দ্ধেন্দুশেখর



অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

প্রথম অধ্যায়

বাল্য ও অভিনয়দীক্ষা

কবি ও অভিনেতা ঐশীশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেবল শিক্ষায় গঠিত হয় না। কবি ও অভিনেতার উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন বটে, কিন্তু কেবল শিক্ষায় কবি কিম্বা অভিনেতা হওয়া যায় না। স্বভাবপ্রদত্ত নিগূঢ় প্রতিভা ভিতরে থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুশেখর সেইরূপ অভিনেতা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের সমাজে অভিনেতার আদর নাই, সমাজ অভিনেতাকে ঘৃণা করে, কাজেই নিজেকে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দিতে সকলেই বেশ একটু 'কিন্তু' হইয়া পড়েন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজেকে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দিতে 'কিন্তু'তো বিন্দুমাত্রই হইতেন না, বরং গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

বাঙ্গালা দেশে অভিনেতার অভাব নাই,—আজ কাল রাম, শ্যাম, যদু সকলেই অভিনেতা। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর ঠিক সেরূপ নামে অভিনেতা ছিলেন না, তিনি যথার্থই অভিনেতা ছিলেন,—ভগবান্ তাঁহাকে অভিনেতা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে আমরা আজ কাল যাঁহাদের অভিনেতা বলিয়া দেখিতে পাই, সেরূপ শত শত অভিনেতা ও অভিনেত্রী অর্দ্ধেন্দুশেখর গড়িয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত লোক যদি বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে বোধহয় বাঙ্গালা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় বলিয়া একটা কিছুই থাকিত না। বঙ্গ রঙ্গালয় শত শোভায় শোভিত হইয়া, আজ যে শত লোকের আনন্দ ও প্রশংসা লইয়া, কলিকাতার বুকের উপর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবল তাঁহাদেরই জীবনব্যাপী প্রাণ-ঢালা পরিশ্রমের ফল।

অর্দ্ধেন্দুশেখর শ্যামবাজার নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুস্তোফী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্যামাচরণবাবু বড় রসিক ও উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার নয়নের মণি ছিলেন। তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরকে যত ভালবাসিতেন পুত্রকে পিতার এতটা ভালবাসা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন অতি শিশু তখন তিনি পুত্রটীকে দিনরাতই কোলে লইয়া থাকিতেন। পাছে পুত্রের কোনরূপ

অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কায় তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পুত্রটিকে অপরের কোলে প্রাণ ধরিয়া দিতে পারিতেন না।

শ্যামাচরণবাবু মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের মাতুল ছিলেন। "মহারাজ বাহাদুর" তাঁহার মাতুলকে বড় স্নেহ করিতেন, এবং যখন তখন মাতুলালয়ে যাইয়া নানা রূপ আদরের উপদ্রব করিয়া শ্যামাচরণবাবুকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। যে দিন অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথম ধরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন সেইদিন মহারাজ বাহাদুর মাতুলালয়ে আসিয়া, 'মামা তোমার ছেলে দেখাও' বলিয়া শ্যামাচরণবাবুকে এমনই 'অতিষ্ঠ' করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে শ্যামাচরণবাবু তাঁহার ভগিনীকে 'তোর ছেলেটাকে সাম্‌লা বাবু' বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এই কলিকাতা মহানগরীর বাগবাজার পল্লীতে পিতার ভবনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হয়। সেদিন কি বার কি তিথি ছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমরা এটুকু বলিতে পারি যে, সেদিন যে তিথি বা যে নক্ষত্রই হউক, তাহা যে অতি শ্রেষ্ঠ তিথি ও নক্ষত্র তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কেননা অর্দ্ধেন্দুশেখর যে অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাদৃশ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির কখনই হীন তিথি ও নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না। কাজেই বলিতে হইবে এক মহা শুভদিনে শুভক্ষণে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হইয়াছিল।

শ্যামাচরণবাবুর বাটীর সম্মুখেই ৺স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয়ের বাটী ছিল। নিয়োগী মহাশয় ও ৺দীননাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির উদ্যোগে কৃষ্ণকিশোরবাবুর বাটীতে একটী 'মরণিং স্কুল' স্থাপিত হয়। এই 'মরণিং স্কুলে'ই অর্দ্ধেন্দুশেখরের হাতে খড়ি, এই স্কুলেই শৈশবে অর্দ্ধেন্দুশেখর লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে কবিবর গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন "অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের মাতুল বাগবাজার নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুস্তোফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তোফী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটীতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৺দীননাথ বসু প্রভৃতি কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটী মরণিং স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ স্কুলে আমি বালক অর্দ্ধেন্দুকে প্রথম দেখি।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারকে যত ভালবাসিতেন, আজকাল কোন অভিনেতাই আর সেরূপ ভাবে থিয়েটারকে ভালবাসেন না। তিনি যে চক্ষে থিয়েটারকে দেখিতেন, সেরূপ চক্ষেও আজকাল থিয়েটারকে আর কোন অভিনেতা দেখেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চিরকালের একটা ভাবনাই ছিল যেন অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আজ কাল যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী বঙ্গরঙ্গালয়ে অভিনয় করেন, তাঁহাদের অনেকেরই থিয়েটারের উপর বিন্দুমাত্রও হৃদয়ের প্রীতি নাই, এবং অভিনয় কলার অভ্যুন্নতির দিকে তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, তাঁহাদের কেবল মাস কাবারের দিকে দৃষ্টি থাকে, কোন ক্রমে মাস কাবার হইলেই হইল। এরূপ অভিনেতা অভিনেত্রীর

নিকট নাট্যকলার উন্নতির আশা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাদের অভিনয় কলার অভ্যুন্নতির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা নাই, যাঁহারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অভিনয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা নিখুঁত অভিনয় কিছুতেই হইতে পারে না,—তাঁহাদের অভিনয় সেইজন্য কতকটা ঢংএর মত হইয়া দাঁড়ায়, আসল জিনিষ কিছুই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই বঙ্গ রঙ্গালয়ে ক্রমশঃ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিন দিন যে উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারকে যে কি চক্ষে দেখিতেন, থিয়েটার তাঁহার যে কত প্রিয় ছিল, সে সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যাঁহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয়প্রিয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্ব্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার জপ ছিল, রঙ্গালয়ের শিক্ষাদান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, এমন কি, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে,—আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দম্ভভরে পরিচয় দিতেন আমি অভিনেতা।"

বাল্যকালে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি শৈশবকালেই তাঁহার পিসিমা অর্থাৎ মহারাজ বাহাদুরের মাতা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে লইয়া আসেন এবং সেই হইতে অর্দ্ধেন্দু পাথুরিয়াঘাটায় তাঁহার পিসিমার নিকটই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। অর্দ্ধেন্দুর পিসিমাতা অর্দ্ধেন্দুকে জননীর অধিক স্নেহ করিতেন, কাজেই রাজবাড়ীতে তিনি রাজপুত্রের মতই অবস্থান করিতেন। সেখানে তাঁহার আদরের পরিসীমা ছিল না।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের থিয়েটারের বিশেষ সখ ছিল, তিনি তাঁহার বাটীতে একটী থিয়েটারের ষ্টেজ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, এবং মাঝে মাঝে তথায় এক একখানি নাটকের অভিনয় করাইয়া নাট্যপ্রিয় ব্যক্তিগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। পিসিমাতার সহিত অর্দ্ধেন্দু যখন রাজবাটীতে গমন করেন সেই সময়ে রাজবাটীতে প্রায়ই অভিনয় হইত। এই সকল অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখর এতই আগ্রহের সহিত দেখিতেন যে, যেদিন রাজবাড়ীতে অভিনয় হইত সেদিন আর তাঁহার স্নান আহার করিতেও মনে থাকিত না। কেমন করিয়া ভাল স্থানটুকু পাইবেন, কেমন করিয়া থিয়েটার আগাগোড়া দেখিবেন, তাহাই হইত সেদিন তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয়। অভিনয় হইবার বহু পূর্ব্বে হইতেই একটী ভাল স্থান দখল করিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সে সময় সেস্থান হইতে তাঁহাকে নড়াইবার কাহারও সাধ্য ছিল না। জনশ্রুতি আছে, একদিন এইরূপ রাজবাড়ীতে অভিনয় হইবার আয়োজন হয়। কাজের বাড়ী, চারিদিকে গোলমাল, এ অবস্থায় রাত্রির আহার শেষ করিয়া আসিয়া থিয়েটার দেখিতে

হইলে ভাল স্থান পাইবার আশা অতি অল্প। সেইজন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর আহার না করিয়াই অভিনয় আরম্ভ হইবার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া একটী ভাল স্থান লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তখন তথায় একজনও দর্শক ছিল না। এমন কাহার খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই যে সে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া অভিনয় দেখিবার জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? কাজেই সমস্ত আসর শূন্য, কেবল একাকী অর্দ্ধেন্দুশেখর একখানি চেয়ার জুড়িয়া বসিয়া আছেন। বাটীতে রাত্রে থিয়েটার হইবে বলিয়া সন্ধ্যার পরই বাটীর ছোট ছোট ছেলেদের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহারের স্থানে সকল বালকই আহারে বসিয়াছে, কেবল অর্দ্ধেন্দুশেখর নাই। মহারাজ বাহাদুরের মাতা কি একটা কার্য্য উপলক্ষে বাটীর বালকেরা যে স্থানে আহার করিতে বসিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়াছিলেন ; তিনি বালকদিগের ভিতর অর্দ্ধেন্দুশেখরকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা সবাই খেতে বসেছিস, অর্দ্ধেন্দু কোথায়?"

মহারাজ বাহাদুরের মাতার প্রশ্নে বালকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া উত্তর দিল, "কি জানি, সে কোথায় আছে বল্‌তে পারিনিতো।"

অমনি অর্দ্ধেন্দুর জন্য চারিদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হইল, মহারাজ বাহাদুরের মাতার আদেশে দুই তিনজন ভৃত্য অর্দ্ধেন্দুকে খুঁজিতে ছুটিল। তাহারা এদিক ওদিক খুঁজিয়া থিয়েটারের আসরে আসিয়া দেখিল, অর্দ্ধেন্দু তথায় একাকী বসিয়া আছে। ভৃত্যেরা রাজমাতার আদেশ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিল, অর্দ্ধেন্দুশেখর কিন্তু নড়িতে চান না, পাছে তিনি স্থানটুকু হারান। ভৃত্যেরা তাঁহাকে বাটীর ভিতর যাইয়া আহার করিবার জন্য অনেক 'সাধাসাধি' আরম্ভ করিল, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর একেবারে অচল অটল। কিছুতেই তিনি নড়িতে চাহেন না। ভৃত্যেরা তাঁহাকে তুলিতে না পারিয়া অন্তঃপুরে গিয়া সংবাদ দিল, তখন মহারাজ বাহাদুরের মাতা অর্থাৎ অর্দ্ধেন্দুশেখরের পিসিমাতা ঠাকুরাণী, তাঁহার একটী দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতাকে অর্দ্ধেন্দুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আবার প্রেরণ করিলেন। সেই ভদ্রলোক অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক বুঝাইলেন ও বলিলেন, "থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইবার এখন অনেক বিলম্ব আছে, এত পূর্ব্বে কেহই অভিনয় দেখিতে আসিবে না,—কাজেই তোমার যায়গা যাইবারও কোন আশঙ্কা নাই।"

কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের কর্ণে কাহার কোন কথাই প্রবেশ করিল না। তাঁহার মুখে সেই এক কথা, "না আমি এখন এখান থেকে উঠ্‌ব না।"

অনাহারে স্থানটুকু রাখিবার জন্য দুই ঘণ্টা যাবৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকা,—কেননা ভাল স্থানে বসিয়া থিয়েটার দেখিতে পাইব, এমন যাঁহার আগ্রহ তাঁহারই অভিনয় দেখা সার্থক, সেই লোকই যথার্থ অভিনয় দর্শন করে। অতিশৈশব হইতেই অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের একেবারে প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর ভিতর তিনি থিয়েটার দেখিতে যত ভালবাসিতেন, এত ভাল আর কিছুই বাসিতেন না।

কোনকালে অর্দ্ধেন্দুশেখরের কোন বিষয়ে কোনরূপ সখ ছিল না। তিনি যাহা পাইতেন তাহাই পরিতেন, তাঁহার আহারের কোন খুতমুত ছিল না—ক্ষুধার সময় যাহা কিছু পাইলেই হইল। কিন্তু ঐ নেশা থিয়েটার দেখা, তিনি যদি শুনিতেন কোথায়ও থিয়েটার হইবে তখনি তাহার মাথা খারাপ হইয়া যাইত। কেমন করিয়া তথায় যাইয়া থিয়েটার দেখিবেন তখন হইতে তাঁহার কেবল সেই চিন্তাই হইত। এইরূপ থিয়েটার দেখিবার ঝোঁকের জন্য বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছে তথাপি তাঁহার সে নেশার একদিনের জন্যও হ্রাস হয় নাই।

অতিশৈশব হইতেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের আর এক শক্তি ছিল। তিনি লোকের কথাবার্ত্তা চলন বলন অবিকল নকল করিতে পারিতেন। তিনি একবার কাণে যাহা কিছু শুনিতেন, তাহাই একেবারে হুবহু নকল করিতে পারিতেন। থিয়েটারে অভিনয় দেখার অপেক্ষা তাঁহার এই নকল শুনিয়া রাজবাটীর অনেকেই বেশী আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইভাবে পিসিমার স্নেহাঞ্চলের নিম্নে থাকিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখরের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"বাল্যকালে অর্দ্ধেন্দুর পিতৃস্বসা, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহাকে পাথুরিয়াঘাটার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহ প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। গণ্যমান্য ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের সে সুবিধা ছিল না। মাইকেল তাঁহার কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় (preface), যে পূজনীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া নট-কুল-চূড়ামণি বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজবাটীর নাট্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহালাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অনুকরণপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু যে কেবল তাহা শুনিতেন ও দেখিতেন তাহা নয়, বালক হৃদয়ে তাহা দৃঢ় অঙ্কিত হইত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বহু বিবাহ নিন্দা করিয়া রামনারায়ণের 'নব নাটক' অভিনীত হয়। অভিনয়পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল।"

অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই সকল অভিনয় দর্শনের সুবিধা থাকায় নাট্যকলা শিখিবার ও জানিবার তাঁহার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন কেহই কোন থিয়েটারে যোগদান করেন নাই, তখন উভয়ের কেহই জানিতেন না যে তাঁহারাই ভবিষ্যতে সাধারণ বঙ্গরঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি আমার এক বন্ধুর ভ্রাতা লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে দেখি। লোকনাথ 'নকুলে' লোক, দেশ বিদেশের ভাষা অনুকরণ করিতে পারিতেন। লোকনাথ বলিতেছেন, 'বল বল প্যাটের যে কামর বলতো?' অর্দ্ধেন্দু

পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই পংক্তিটী আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটী লোকনাথ অনুকরণপটু হইলেও তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনুকরণ অতিস্বাভাবিক হইল। স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুর বাড়ীতে চক্ষুদান ও উভয় সঙ্কটের অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু কখন কখন সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া করিতেন।”

অর্দ্ধেন্দুর জীবন যখন এই ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময় থিয়েটারের একটী সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণের ভিতর যে জাগিয়া না উঠিয়াছিল এমন নহে। তাঁহার মনের সে ইচ্ছাটা বহুদিন তিনি মনের ভিতরই দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা যে খুঁজিতেছিলেন না এমন কথা হইতেই পারে না। তিনি যে ভগবত্-প্রদত্ত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে প্রতিভা চাপা থাকিবার নহে,— তিনি নিজেকে দমন রাখিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে, প্রতিভা দমন থাকিবে কেন? ইচ্ছা ও আগ্রহ তাঁহার প্রাণের ভিতর দিন দিন এমনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে তিনি আর নিজেকে দমন করিতে পারিলেন না। সেই সময় তাহার প্রতিভা যিনি দিয়াছিলেন তিনিই তাহার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দু রাজবাটীতে দুই একখানি নাটকে দুই একটী ভূমিকা অভিনয় করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা সামান্য একটু কারণে রাজবাটীর সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্য হয়। তিনি অবিলম্বে রাজবাটী পরিত্যাগ করেন ও বাগবাজারে একটী নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর যে সময় বাগবাজার নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন সেই সময় এই সম্প্রদায়ে কবিবর ঁদীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” নাটকের মহাসমারোহে মহালা চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই নিজ প্রতিভাবলে এই থিয়েটারের শিক্ষক হইয়া দাঁড়ান। এই থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। সধবার একাদশী নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর “জীবনচন্দ্রের” ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূমিকাটীর এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে স্বয়ং গ্রন্থকারকে পর্য্যন্ত বলিতে হইয়াছিল, “এমনটী আশা করি নাই।” তাঁহার এ অভিনয় যিনিই দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকেই শত মুখে প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

“বাগবাজারে “সধবার একাদশী” সম্প্রদায়ের আকড়ায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যোগদান করেন। কৃতবিদ্য বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু, রায় বাহাদুর ঁরামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আইসেন। অর্দ্ধেন্দুর “জীবনচন্দ্রের” ভূমিকা (part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, “আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।”

বাগবাজারের নাট্য সম্প্রদায়ের শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই

থিয়েটারে যোগদান করিলে তাঁহাকে সহকারী শিক্ষকের পদ প্রদান করা হয়। এই সম্প্রদায় "সধবার একাদশী"-র নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। জনসাধারণ ও স্বয়ং গ্রন্থকারের পর্য্যন্ত প্রশংসা লাভ করিয়া এই সম্প্রদায়ের নূতন নূতন নাটকের অভিনয় করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ শতগুণে বাড়িয়া উঠে। "সধবার একাদশী" অভিনয় হইবার পর তাঁহারা দীনবন্ধু বাবুর "লীলাবতী" নাটক অভিনয় করিবার জন্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের শিক্ষকতায় কিছু কিছু বাদ দিয়া লীলাবতী নাটকের মহালা চলিতেছিল। কাজেই বাগবাজারের এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অভিনেতার কেমন একটা জেদ্ হইল, যেমন করিয়া হউক চুঁচুঁড়ার অভিনয় অপেক্ষা তাঁহাদের অভিনয় ভাল করিতেই হইবে। অৰ্দ্ধেন্দুশেখর দিনরাত পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেক অভিনেতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সম্প্রদায়ে শিল্পী শ্রীযুক্ত ধৰ্ম্মদাস সুরও ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র পালকে সহকারী লইয়া দিনরাত পরিশ্রম করিয়া শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নিৰ্ম্মিত করিলেন। ১২৭৮ সালে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় ও অৰ্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় শ্যামবাজারে ৺রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে ৺ধৰ্ম্মদাস সুরের নিৰ্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইল। লীলাবতী নাটকে অৰ্দ্ধেন্দুশেখর হরবিলাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হরবিলাসের অভিনয় দেখিয়া গ্রন্থকার একেবারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সধবার একাদশীতে জীবনচন্দ্রের ভূমিকা দেখিয়া যত আনন্দিত হইয়াছিলেন এই হরবিলাসের অভিনয় দেখিয়া তাহার শত গুণ আনন্দিত হইলেন। অৰ্দ্ধেন্দুশেখর যে কত বড় গুণী, নাট্যকলা যে তিনি কতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই এক হরবিলাসের অভিনয়েই নাট্যমোদী সুধীবৃন্দ জানিতে পারিয়াছিলেন।

লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইবার পর, দর্শকের আতিশয্য দেখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রস্তাব করিলেন, যে এখন হইতে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করা হউক। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিবার পক্ষে সম্প্রদায়ের সকলেরই মত কেবল একা গিরিশচন্দ্র অন্যমত। কাজেই সম্প্রদায়ের কোন লোকই তাঁহার সে মত গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। গিরিশচন্দ্রের মতে কেহই মত না দেওয়ায় গিরিশচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন। গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে দলের কাহারও উৎসাহ এক বিন্দুও কমিল না। তাঁহারা অৰ্দ্ধেন্দুশেখরকে শিক্ষক করিয়া দীনবন্ধু বাবুর "নীলদর্পণ" নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। থিয়েটারের টিকিট বিক্রয় করিতে হইলে একটী রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক। কাজেই পাথুরিয়াঘাটার মোড়ে ৺মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীর প্রকাণ্ড চত্তরটী মাসিক তিরিশ টাকায় ভাড়া লওয়া হইল এবং ধৰ্ম্মদাস বাবু দিন রাত পরিশ্রম করিয়া তথায়-একটী নূতন রঙ্গমঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করিলেন।

১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় গঠিত হইয়া বাগবাজারের নাট্য সম্প্রদায় ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া নব রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণ নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। নীলদর্পণ নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর একাই চারিটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভিতর তিনটী পুরুষের একটী স্ত্রীলোকের। ভূমিকা কয়টী যথা,—উড্ সাহেব, গোলক বসু, জনৈক রায়ত ও সাবিত্রী। এক নাটকে চারিটী ভূমিকা একরাত্রে অভিনয় করা যে কত কঠিন তাহা নাট্যকলায় যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান আছে তিনিও অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই চারিটী ভূমিকা সম্পূর্ণ পৃথক এবং চারি ভাবের। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভায় তাহাও সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই চারিটী ভূমিকার প্রত্যেকটীতেই অর্দ্ধেন্দুশেখর সমান প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশংসায় সমস্ত কলিকাতা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে এই সম্প্রদায় টিকিট বিক্রয় করিয়া দীনবন্ধু বাবুর সব কয়খানি নাটকই অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় সবগুলিরই অতি মনোহর অভিনয় হইয়াছিল। এই সকল নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূমিকাগুলি এত সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল যে তাহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক বিখ্যাত অভিনেতার দ্বারা সেগুলি অভিনীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তেমনটী আজ পর্য্যন্ত আর হইল না।

তাহার পর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক ঁশিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত "নয়শো রুপেয়া" নামক একখানি পুস্তকের অভিনয় হয়। এই পুস্তকে অর্দ্ধেন্দুশেখর "ছাতুলালের" ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার ঁশিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, "নয়শো রূপেয়ার" ছাতুলালের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের যে অভিনয় দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারের অভিনেতার দ্বারা সম্ভব তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মোট কথা অর্দ্ধেন্দুশেখর যখনই যে ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন তাহাই এক নূতন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর জীবনচন্দ্র দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। লীলাবতীতে অর্দ্ধেন্দুকে "হরবিলাস" দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম "নীলদর্পণ" অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু গোলক বসু, উড সাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে দর্শক বৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্পর্ক ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর "জলধরের" অভিনয়

অতুলনীয়ের মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চহৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ˚গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বলিতেন, সমাজদার গুণীর গোলাম। আর গুণী সমাজদারের গোলাম।" গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সহৃদয় সমাজদার রাজা চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথার একটী অকাট্য প্রমাণ। ক্রমে ন্যাশনাল থিয়েটারে "নয়শো রূপেয়া" অভিনীত হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটার ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃত বাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ ˚শিশির কুমার ঘোষের সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে "নয়শো রূপেয়ার" ছাতুলালের ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম তাহা যে, কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অনুনকরণীয় হইত।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাহাই যে শুধু নিখুঁত অভিনীত হইত তাহা নহে, তিনি যাহাকে যে ভূমিকাটী শিক্ষা দিতেন, তাহাও অপরূপ হইত। তাঁহার শিক্ষা দিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তিনি যখন যাহাকে যে ভূমিকাটী শিক্ষা দিতেন তাহা যতক্ষণ না নিখুঁত হইত ততক্ষণ তিনি তাহা কিছুতেই ছাড়িতেন না। যে অভিনেতা শিক্ষা গ্রহণ করিত সে হয়তো বিরক্ত হইয়া উঠিত, তথাপি তাহার নিস্তার নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর ঠিক সেই এক ভাবে বসিয়া, ভূমিকাটী নিখুঁত করিবার জন্য ক্রমাগত বলিয়া যাইতেছেন, বিরক্ত হইবার নামটী নাই। তিনি নিজে যেমন অনন্যসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, তাহার শিক্ষা প্রণালীও তদ্রূপ অদ্ভুত ছিল। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি শিক্ষাপ্রদানে কিরূপ দক্ষ ছিলেন তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সধবার একাদশীতে দরওয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাষ্টার একথা সর্ব্বত্র প্রচার। প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থানে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার শিক্ষার পরিচয় ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিনেতা হইতে হইলে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন, অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে শিক্ষা বাল্যকালে অনেক হইয়াছিল। বাল্যকালে যখন তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে ছিলেন, সে সময় তাঁহার অনেক বড় বড় নটের অভিনয় দেখিবার মহাসুযোগ ঘটিয়াছিল। শুধু এই সকল নটের অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার অভিনয় বিদ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই, অভিনয় শিক্ষার জন্য ইহা ব্যতীত তাঁহাকে অনেক পুস্তকও পাঠ করিতে হইয়াছিল। তিনি রাজবাটীতে "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনে তিনটী ভূমিকা লইয়া সর্ব্ব প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। এই তিনটী ভূমিকার ভিতর একটী ভূমিকাতে রাজবাটীর কোন একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। এই ভূমিকাটী অভিনয়

করিবার জন্য তাঁহার পিসিমাতার বাটীর অনেকেই তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং কথাটা তাঁহার পিতার নিকটেও তাঁহারা বলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখরের পিতা শ্যামবাবু পুত্রের এই কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া পুত্রকে রীতিমত তিরস্কার করিয়া, আর তিনি যাহাতে কখনও না অভিনয় করেন সেজন্য বিশেষভাবে বলিয়া দেন, কিন্তু অভিনয় অর্দ্ধেন্দুর তখন প্রাণের ভিতর এমন ভাবে বসিয়া গিয়াছিল যে, পিতার নিষেধ বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। রাজ বাটীতে অভিনয় করায় তিনি নানা দিকে অসুবিধা দেখিয়া বাধ্য হইয়া শেষে বাগবাজার সম্প্রদায়ে সধবার একাদশীর অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের তিনটী ভূমিকা লইয়া অর্দ্ধেন্দু প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন। একটী অংশ রাজ বাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃষ্বসার গৃহে বিরক্তিভাজন হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাতে তাঁহাকে পিতৃষ্বসার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সধবার একাদশী সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে হয়।"

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সহিত গিরিশচন্দ্র সংশ্রব ত্যাগ করিবার পর সম্প্রদায়ের ভিতর গোলযোগ উপস্থিত হইল। সম্প্রদায়ের ভিতর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, গিরিশবাবুর মতেই থিয়েটার চালান উচিত, তিনি এ বিষয় ভালই বলিতেছেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন, না গিরিশবাবুর মতে একেবারেই চলা যায় না। কাজেই এক সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া দুইটী দলের সৃষ্টি হইল। অর্দ্ধেন্দু একটী দলের নেতা হইলেন, আর গিরিশচন্দ্র অপর দলের নামমাত্র নেতা রহিলেন। নিন্দুকেরা গিরিশবাবুর মনের কথা কেহ একবার যাচাই করিয়া দেখিল না, তাহারা গিরিশবাবু সম্বন্ধে নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম দিয়া ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম ব্যতীত সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল, কারণ একেই ত এখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকিয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থায় ন্যাশনাল থিয়েটার দেখিলে কি না বলিবে, এই আমার আপত্তি। ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা বাঙ্গালী জাতির রঙ্গমঞ্চ—বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েক জন গৃহস্থযুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশন্যাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল, এই মত ভেদ। কিন্তু এই সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন,—এমন দুই এক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। বর্ষাসমাগমে জোড়াসাঁকো স্যাণ্ডেল বাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাশন্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়—অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজসরঞ্জাম কে রাখিবে?

বিবাদ এই লইয়া। যে যে নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (Hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা।”

“বিবাদ মীমাংসা হইল না, দুইটী দল হইল। দুই দলেরই ইচ্ছা মফঃস্বলে অভিনয় করে। এক দলে অর্দ্ধেন্দু, আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয়দলের প্রকৃত পরিচালক,—৺ধর্ম্মদাস সুরও সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দলভেদের মর্ম্ম উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরিচালক যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ পিপাসায় ন্যাশন্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, এ কথা মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।”

অর্দ্ধেন্দুশেখর যে দলের নেতা হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার সেই দল লইয়া মফঃস্বলে নানা স্থানে অভিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনয়-প্রশংসা বঙ্গের গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িল। সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর এক অদ্ভুত ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন। তিনি যে কয়টী সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন সেরূপ অভিনয় আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। ইদানীং লোকে অর্দ্ধেন্দুশেখর সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিবেন, শুনিলেই দলে দলে থিয়েটারে ছুটিয়া আসিতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সাহেবের অভিনয় লোকের এত প্রাণে লাগিয়াছিল যে, তাঁহার নামই সাহেব হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন বিদেশে বিদেশে তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া ঘুরিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার হস্তে কত সম্প্রদায় যে গঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার হস্তে যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রী শিক্ষিত হইয়াছে, তাহারা তোতা পাখীর মত শুধু মুখস্থ বলিতে শেখে নাই, নাট্যকলার ভিতরেও কিছু কিছু প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। শ্রীমতী সুকুমারী (গোলাপ) যখন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করিত তখন সে কেবল তোতা পাখীর মতই অভিনয়ই করিত, নাট্যকলার ভিতরে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহার পর সে যখন বেঙ্গল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাধীনে আসিয়াছিল তখন হইতে সে নাট্যকলার ভিতরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং অভিনয়কৌশলে দর্শকবৃন্দকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী ৺কুসুমকুমারী (বিষাদ কুসুম) প্রথম হইতেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের হস্তে গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই সে নাট্যকলাবিদ্যায় একেবারে সুনিপুণা হইয়া উঠিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাপ্রদান সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

“গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময় বহু নাট্য সম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য সম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর কার্য্যের শেষ। অর্দ্ধেন্দুশেখর দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত অভিনেতারা থাকিতেন তথায় যোগদান করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কার্য্যক্ষেত্র ও বিপুল যশোলাভ

ইহার পর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রতাপচাঁদ জহুরী যখন থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর কলিকাতায় ছিলেন না। তখন তিনি আবার বিদেশে ঘুরিতেছিলেন, কাজেই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রথম মুখে তিনি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করিতে পারেন নাই। তখন গিরিশ বাবু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন গিরিশ বাবুর সহিত প্রতাপচাঁদের সামান্য একটা কারণ লইয়া মনোমালিন্য হইল ও গিরিশবাবু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন, সেই সময় প্রতাপচাঁদ ৺কেদারনাথ চৌধুরীকে থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিয়োজিত করেন। কেদার বাবু যখন ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইলেন সেই সময় তিনি আবার অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে লইয়া আসেন। কিন্তু কেদারবাবুর অধ্যক্ষতায় থিয়েটার অধিক দিন চলিল না। প্রতাপচাঁদ থিয়েটার তুলিয়া দিলেন। এই সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করিয়া কয়েকখানি নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত তাহা অভিনয় করেন। এই থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটকে শেষ অভিনয় করেন। এ সম্বন্ধে গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন,—

"যখন ৺প্রতাপচাঁদ জহুরী গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়া আমার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালান সে সময় অর্দ্ধেন্দু বিদেশে। প্রতাপচাঁদকে নূতন দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ নট ৺মহেন্দ্রলাল বসুর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত হইল। এই সময় আমি পার্কার সাহেবের আফিস্ পরিত্যাগ করি এবং রঙ্গালয় আমার স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপায় রহিল না। এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের বাহিরে যথাসাধ্য আমার বিপক্ষে শত্রুতা চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। পরে নানাকারণে প্রতাপচাঁদের সহিত আমার

'অবনিবনাও' হওয়ায় ৺গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হইল। [যেথায় এক্ষণে মনোমোহন থিয়েটার বিদ্যমান, ষ্টার থিয়েটার ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়।] সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৺কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটার রহিল না। কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটক তাঁহার শেষ অভিনয়।"

ন্যাশনাল থিয়েটার উঠিয়া যাইবার কিছুদিন পরে যখন ধনকুবের ৺গোপাললাল শীলের মাথায় থিয়েটারের নেশা প্রবল হইয়া উঠে এবং যখন ষ্টার থিয়েটারের বাটী ক্রয় করিয়া তিনি এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময় গোপাল বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখরকে তাঁহার থিয়েটারে লইয়া আইসেন। গোপাল বাবু ৺কেদারনাথ চৌধুরীকে তাঁহার থিয়েটারের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কেদারবাবু এমারেল্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন' নামক একখানি নাটক ঐ থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য রচনা করেন। এই পাণ্ডব নির্ব্বাসন নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভূমিকাটি লইয়াছিলেন তাহা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ৺গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে তিনি অধিক দিন অভিনয় করেন নাই। পাণ্ডব নির্ব্বাসন নাটকের এমারেল্ড থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় হইবার পর গোপাল বাবু গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে লইয়া আইসেন ও কেদার বাবুর স্থানে তাঁহাকেই অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। ইহাতে কেদার বাবু বিশেষ ক্ষুণ্নমনা হইয়া পড়েন এবং এমারেল্ড থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত কেদার বাবুর বিশেষ প্রণয় ছিল। তাঁহাদের দুইজনের চেষ্টাতেই এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হয়। কেদারবাবু এমারেল্ড থিয়েটার ত্যাগ করায় অর্দ্ধেন্দুশেখরও এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"কিছুদিন পরে ৺গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন,, তখন থিয়েটার গুর্ম্মুখ রায়ের নহে, উপস্থিত ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীগণের। ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয়ার্থে ঢাকায় গমন করিল। কেদারনাথ পরিচালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্ত্তিত ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতৃগণ সংমিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ বিরচিত পাণ্ডব নির্ব্বাসন নাটক। দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর গোপাললাল আমায় তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্ত্তে আমায় ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।"

এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর বহুকাল আবার কোন সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নাই। তবে তখন তাঁহার হস্তে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপন করেন, সেই সময় তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আবার থিয়েটারে লইয়া আইসেন।

নাগেন্দ্র বাবুর মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিবার পর তথায় প্রথমই ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর চারিটী ভূমিকা গ্রহণ করেন ; এবং চারিটী ভূমিকার অভিনয়েই তিনি যে অর্দ্ধেন্দু এ কথা প্রত্যেক দর্শককে জানাইয়া দিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যাক্‌বেথের অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল তাহা লিখিয়া বুঝান কঠিন। আর হইবেই বা না কেন,—যে নাটকে শ্রীমতী তিনকড়ি লেডী ম্যাক্‌বেথ, গিরিশচন্দ্র ম্যাক্‌বেথ ও চারিটী স্বতন্ত্র ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর সে নাটকের অভিনয় যে সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহা লেখাই বাহুল্য। অর্দ্ধেন্দুশেখর ম্যাক্‌বেথ-নাটকে পোর্টার, উইচ, ওল্ড ম্যান ও ডক্টর এই কয়টী ভূমিকা একই রাত্রে অভিনয় করিতেন।

ম্যাক্‌বেথ নাটকের অভিনয় হইবার কিছুদিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে আবুহোসেন গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। এই গীতিনাট্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর আবুর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই আবুর ভূমিকাটীর তিনি এমন অভিনব ও মনোহর অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই ; শুধু এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে এই আবুহোসেন গীতিনাট্যের আজও রঙ্গালয়ে অভিনয় হইতেছে, বহু স্বনামখ্যাত অভিনেতা এই ভূমিকাটীর অভিনয় বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর এই আবুহোসেন গীতিনাট্যে যে প্রাণ দিয়াছিলেন সে প্রাণটুকু কেহই দিতে পারিলেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখনই যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তখনই যেন তিনি অর্দ্ধেন্দু হইয়া বাহির হইতেন। সে অভিনয় অনুকরণ করিতে আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনেতাই পারিল না। আবুহোসেন গীতিনাট্যের অভিনয়ের পর মুকুলমুঞ্জরা নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর বরুণচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই ভূমিকার অভিনয়ে বেশ নূতনত্ব দেখাইয়া দেন। তাহার পর জনা নাটকে তিনি বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন ও অভিনয়কলার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"পরে-যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনরায় একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় ম্যাক্‌বেথ—ইহাতে অর্দ্ধেন্দু পোর্টার, উইচ, ওল্ড ম্যান ও ডক্টর এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেন প্রহসনে আবুহোসেন, মুকুলমুঞ্জরায় বরুণচাঁদ, জনায় বিদূষক প্রভৃতির অভিনয়দক্ষতায় নব শ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যোমোদীর মুখে অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী ব্যাখ্যা।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর বড় খেয়ালী লোক ছিলেন, তাঁহার মেজাজ ঠিক আমিরের মত ছিল। যেখানে দুই টাকা ব্যয় করিলে যথেষ্ট হইত সেখানে তিনি পাঁচ টাকা ব্যয় করিতেন। লোকে তাঁহার নিকট খাইতে চাহিলে তাঁহার আর আনন্দ ধরিত না, তিনি সব ভুলিয়া

কেমন করিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভূরি ভোজন করাইবেন সেই ভাবনায় একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন। এত বড় মহৎ প্রাণ—এত বড় উচ্চ মেজাজ কয়জনের দেখিতে পাওয়া যায়! তাঁহার আর এক গুণ ছিল তিনি নাট্যকারগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। আজকাল যেমন নাট্যকারগণ একখানি নাটক লিখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের হস্তে অর্পণ করিয়া আসিয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নাটকখানি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে পড়াইতেও পারেন না; অর্দ্ধেন্দুর আমলে তাহা হইত না, তাঁহার নিকট কোন নাট্যকার কোন নাটক দিলে তিনি তখনই সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া সেই নাটকখানি শুনিতে বসিতেন এবং যে নাটকখানি থিয়েটারে অভিনীত হইতে পারে না, কিরূপ হইলে নাটকখানি অভিনয় করিবার উপযোগী হয় তাহা তিনি সেই গ্রন্থকারকে অতি সুন্দর ভাবে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্দ্ধেন্দুশেখর বড় খেয়ালী লোক ছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি জনা নাটকে বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করিতেছিলেন সেই সময় ˚গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া দিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার অমনি খেয়াল হইল তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজেও নিজেকে কোন দিনই ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না, একবার যদি তাঁহার প্রাণে কোনরূপ খেয়াল উঠিত তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। যেমন তাঁহার প্রাণে খেয়াল উঠিল তিনি স্বত্বাধিকারী হইয়া নিজেই থিয়েটার চালাইবেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লওয়া স্থির হইয়া গেল এবং তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এমারেল্ড থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্যের অভাব ছিল না, তাঁহার অনেক শিষ্য তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। মহাসমারোহে এমারেল্ড থিয়েটার চলিতে লাগিল। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিষয়বুদ্ধি একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। টাকা কেমন করিয়া রাখিতে হয়,—বুঝিয়া সুঝিয়া কেমন করিয়া ব্যয় করিতে হয়, এ বিদ্যা তাঁহার আদৌ জানা ছিল না। তিনি জানিতেন কেবল টাকা ব্যয় করিতে, কেমন করিয়া টাকা ব্যয় করিতে হয়—অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট হইতে তাহা শিখিবার জিনিষ ছিল। যাহার কাছে টাকার কোন মূল্য নাই তিনি কি কোন দিন ব্যবসায়ী হইতে পারেন, না কোন ব্যবসায় জমাইতে পারেন! অর্দ্ধেন্দুশেখরেরও ব্যবসায় তেমন চলিল না,—কিছুদিন পরেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের থিয়েটারের নিয়মও ছিল কঠিন,—নেপথ্য হইতে অভিনয়ে যদি কোন গোলযোগ বা চীৎকারের আবশ্যক হইত তাহা হইলে প্রত্যেক অভিনেতাকে চীৎকার করিতে হইত তা তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"জনায় বিদূষক দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি (অর্দ্ধেন্দু) স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন।

কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন ; এইটী অর্দ্ধেন্দু জীবনে একটী ভ্রম ! তিনি অভিনেতা ছিলেন,—বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক্ সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয় তাহা জানিতেন না। যথা, নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন। বড় বড় অংশ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে তাহারই জন্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলেও তিনি বিরক্ত,—ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনরূপে শিখিতেছে না,—অর্দ্ধেন্দু তাহাকে শিখাইবেই। যদি কোন অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, সকল ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন,—নিখুঁত না হইলে কোন অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া অতি-অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানারূপ কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণ গ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি নট চিত্রকর প্রভৃতির বিষয় বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি খাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচা মিলাইবার জন্য তিনদিন মস্তিষ্ক খাটাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করেন না। কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একমাত্র আহারের চিন্তা থাকে, তাহা পূর্ণ হইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বিষয়ীর সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তিকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি অর্দ্ধেন্দু থিয়েটারের জন্য আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিতেন, বাড়ীঘর, পুত্র কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতেন না। তাঁহার আহার কার্য্যটী চলিলেই হইল। তাহার পর যাহা হউক না কেন, তিনি থিয়েটার লইয়াই, থাকিতেন। 'কখনও বা যত্নপূর্ব্বক কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকের অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও কোন চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কিরূপে কোন নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার স্বরচিত নাটক লইয়া আসিয়াছে তাহা শুনিতেছেন, শ্রোতারা যখন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পড়িতে ক্লান্ত, কিন্তু অশ্রান্ত অর্দ্ধেন্দু "পড়ে যাও

ভাই” বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে থিয়েটারে আর কেহ কোথায় নাই এক চেয়ারে গ্রন্থকার অপর চেয়ারে অটল অচল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির লেষ মাত্র মুখে অঙ্কিত নাই'। উপর্য্যুপরি কত দিন পর্য্যন্ত গ্রন্থপাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা শেষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু তাঁহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন। সে নিজ চরিত্রসম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক অর্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন নাটককার দুর্দ্দৈব বশতঃ বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু বলিত খোল ভাই তোমার খাতা খোল। গ্রন্থকারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবারের পরে আরও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অন্যান্য স্থান গুলিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাঁহার বাড়ী ফেরা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিল “মশাই ওসব কি করেন?” অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে কোথায়? কোন রং ঢংয়ের কথা যে কেহ যে সময় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে প্রস্তুত, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইত না। রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু এ সম্বন্ধে সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্যালে বসিলে অভিনেতা অভিনেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহার নিকট একটী কথা বলিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেই দিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, তাহাকে কহিলেন, “থাম, বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, আগে শেষ হউক, তাহার পর কার্য্য হইবে।” কেহ উঠিয়া গেলে, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রগণকে “বলিলেন, স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কার্য্য আরম্ভ করি।” তাহার শিক্ষাপ্রদানে এতদূর আগ্রহ ছিল, যে সামান্য বাধা বিঘ্নেও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু রিহার্স্যাল ফুরাইলে অতি ক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধুভাবে একত্র কথাবার্ত্তা, ভোজের আয়োজন, রন্ধনে উপদেশ প্রদান, এইরূপে বারমাসের মধ্যে একাদশ মাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারের নিয়মাবলীও কঠিন ছিল। অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্যগণের “আল্লা-আল্লা হো” শব্দ করিবার আবশ্যকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র “আল্লা হো আকবার” করে, তাহাতে জমাই হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করিলেন, যখন “আল্লা আল্লা হো” করিবার নেপথ্যে প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় থাকিবে একবার আল্লা হো শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই সকলকেই “আল্লা আল্লা হো” শব্দ করিতে হইবে। কেহ হুকা হাতে করিয়া আল্লা আল্লা হো করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া আল্লা আল্লা হো করিতেছে, আবার জলের গ্লাস হাতে বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবস্থায়, কেহ বা পাইখানায়—সেই অবস্থায়ই “আল্লা আল্লা হো” করিতে হইবে, কেননা সাহেব দিব্বি দিয়াছেন।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অসীম দয়া ছিল। প্রয়োজন হইলে যে স্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমির অপেক্ষা অধিক ছিলেন।"

বাঙ্গালাদেশে অভিনয় করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুখ্যাতি অপর কোন অভিনেতার ভাগ্যে বড় ঘটে নাই. তাহার ভিতরে ঈশ্বর প্রদত্ত এমন একটা জিনিষ ছিল যে তিনি একাই একশো ছিলেন। তাঁহার ভিতরে যে শক্তি ছিল, তিনি ভগবৎপ্রদত্ত যে অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশীয় থিয়েটার তাঁহাকে সে সম্মান প্রদান করিতে পারে নাই। বিলাত ও আমেরিকার মত এখানে যদি ভ্যারাইটী থিয়েটারের আদর থাকিত তাহা হইলে একাকী অর্দ্ধেন্দুর দ্বারাই একটী নাট্যশালা চলিতে পারিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এটা বিলাত নয় বাঙ্গালা দেশ, কাজেই অর্দ্ধেন্দুর সে সম্মান এখানে হয় নাই। তবুও তিনি যে সম্মান পাইয়াছিলেন তাহাও অত্যল্প অভিনেতার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশব্যাপ্ত তাহা নহে, ভারতবর্ষে যেখানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা হয় সেইখানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার। সকলেই তাহাকে অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য সেরূপ প্রসন্ন ছিল না, সে বাঙ্গালার ভাগ্য, কেবল অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য নহে। ভ্যারাইটী থিয়েটার, অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুক-আলাপ হইয়া থাকে এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে অর্দ্ধেন্দু একা অল্প সাহায্য লইয়া দেবকার্সনের ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাব ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যাবিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

দর্শকগণ অর্দ্ধেন্দুকে অর্দ্ধেন্দুই দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দুর এমন কতকগুলি জিনিষ নিজস্ব ছিল, যাহা অনুকরণ হইবারই নহে। সে বিশেষত্বটুকু কেবল অর্দ্ধেন্দুতেই সম্ভব ছিল। অর্দ্ধেন্দু যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তাহাতে এমন একটী বিশেষত্ব দিতেন যাহা শত চেষ্টায়ও অন্যের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হইত না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে "গোলক বসুর" অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও 'অর্দ্ধেন্দুরী' একটু টিপ্পনী আছে। চাষা হা করিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটী মশা মারিল, এটী "অর্দ্ধেন্দুরী।" "বুড়া উড়্" সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত 'পীঠবস্ত্র ঘাঘরার ঢংয়ে দাঁড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো" প্রহসনে গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, ষ্টেজের কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে দেরি হইতেছে বলিয়া নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া, লীলাবতীতে হরবিলাস বসিয়া আছে (কাহার

আসিতে বিলম্ব হইতেছে আমার স্মরণ হইতেছে না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, "জমাদার সাহেব তোমার আসামী সট্‌কেছে,—এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হয়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক, (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব বসে আছেন।" এ সমস্ত কাহার বিসদৃশ লাগিত! অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্তই ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই। ইহা কলা বিদ্যাগার—স্বভাব নয়।"

অর্দ্ধেন্দুর আর এক গুণ ছিল, তিনি অভিনয় করিতে করিতে এমন এক একটী কথা অভিনয়ের ভিতর যোগ করিয়া দিতেন যে তাহাতে দর্শকগণ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। অভিনয়ের ভিতর ভাবসামঞ্জস্য রাখিয়া মাপসই দুই চারিটী কথা ঠিক সাময়িক বলা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। অর্দ্ধেন্দুর পরে যদি অপর কোন অভিনেতা এইরূপ করিতেন তাহা হইলে তাহা দর্শকের কর্ণে একেবারেই বিকট ঠেকিত, কিন্তু অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুর অসীম প্রতিভা ছিল কাজেই তিনি যাহাই করিতেন তাহাই মানাইয়া যাইত, কারণ অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দুই দেখিতেন, তিনি কোন ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন সে কথা কেহই বড় বিচার করিতেন না। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজের কথা অভিনয়ের ভিতর প্রকাশ করাইয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর আর একটী শক্তি ছিল, অভিনয় কালে নাটকের কথায় নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন,—যথা, মুকুলমুঞ্জুরায় বরুণচাঁদের ভূমিকায় বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া রাজা যখন বলিতেছে—"এ কে ভাঁড় নাকি?" তখন অর্দ্ধেন্দু বরুণচাঁদ উত্তর করিল,—"মহারাজ ভাঁড়—অত বড় নই-- আমি একখানি খুরী।" ইহা নাটকের কথা নহে, কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের রোল উঠিল তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া তাহার মত ঢং করিতে গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে।"

অর্দ্ধেন্দু যে শুধু হাস্যরস অভিনয় করিতেই পটু ছিলেন তাহা নহে, তিনি সুগভীর ভূমিকা অভিনয়েও কম পটু ছিলেন না। হাস্যরস অভিনয়ে যেমন তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল গম্ভীর ভূমিকা অভিনয় করিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকে দর্শকগণ অর্দ্ধেন্দুই দেখিতেন, সেই কারণ তাঁহার গম্ভীর ভূমিকার সৌন্দর্য্য তাঁহারা সহজে ধরিতে পারিতেন না। অর্দ্ধেন্দু আসিয়াছে, কাজেই হাসিতে হইবে, সেইজন্য কি ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা তাঁহারা একবারের জন্যও চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়াই হাসিয়া আকুল হইতেন। কাজেই গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহার তেমন নাম ছিল না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম তাহা হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর ভূমিকা অভিনয়েও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল, কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে,

দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিতেন না। অবশ্যই সে ভূমিকার পরে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেরূপ হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিতেন, করুণরসাত্মক অংশেও কাঁদিতেন।"

অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশানুরাগ বড় কম ছিল না। তিনি দেশকে সত্যই প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। 'ভারতমাতা' প্রভৃতি পুস্তক কেবল তাঁহারই জেদে থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রঙ্গমঞ্চ হইতে সমাজকে অনেক শিক্ষা দেওয়া যায়,—অনেক সৎপ্রবৃত্তি রঙ্গালয় হইতে মানুষের মনে জাগাইয়া দিতে পারে। তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, রঙ্গমঞ্চের কাজ দেশের কাজ,—সে কাজে তিনি কিছুতেই অবহেলা করিতে পারেন না।

তিনি যে সদ্‌গুণ ও প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই, উহার যে কারণ ছিল না তাহা নহে। তাঁহার প্রাণে এক মহাদুর্ব্বলতা ছিল, যে কেহ তাঁহাকে একটু যত্ন করিত,—আত্মীয় হইবার চেষ্টা করিত, সেই তাঁহার আত্মীয় হইতে পারিত এবং তাহারই কথা তাঁহার নিকট অকাট্য সত্য হইয়া দাঁড়াইত। সেই সকল স্বকার্য্যসিদ্ধকারী সুহৃদ্‌বর্গে তিনি চির জীবনটা বেষ্টিত ছিলেন, এবং তাহাদের কথায় এমনভাবে নাচিতেন যে নিজের ক্ষতির দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিতেন না। এইভাবে নাচিবার দরুণ তাঁহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। এই কারণে যে তিনি কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন তাহার পরিসীমা নাই। তাঁহার এই সকল সুহৃদ্‌বর্গের তিনি যে রঙ্গলায়ে থাকিতেন সেখানে, যদি একটু খাতিরের উনিশ বিশ হইত অমনি তাহারা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের যাহাতে ক্ষতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিত এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট নানা মিথ্যা কথা লাগাইয়া তাঁহার মন ভারি করিয়া তুলিত, এমন কি তাহাদের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া তিনি অনেক সময় থিয়েটার পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতেন ও নূতন সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অভিনেতৃবর্গের প্রতি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ মমতা ছিল,—অভিনেতৃগণ কাজের অবহেলার দরুণ যদি কখনও কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট হইতে ভর্ৎসিত হইতেন তাহা হইলে তাহারা অমনি অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ধরিত। তাহারা জানিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের দুর্ব্বলতা কোথায় এবং এমনভাবে সেই স্থানে আঘাত করিত যে অর্দ্ধেন্দুশেখর অমনি নাচিয়া উঠিতেন এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে যাহা তাহা বলিয়া যত অপদার্থ অভিনেতৃগণকে লইয়া নূতন থিয়েটার খুলিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে পদে পদে তাঁহার অভিনয়ে বিঘ্ন ঘটায় তাহার প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ পাইবার অবসর পায় নাই। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশ অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। ভারতমাতা প্রভৃতি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্ররোচনায়। যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল; এবং তীব্র শব্দশক্তিতে ঐ

সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্দ্ধেন্দুর ধারণা ছিল রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কর্ম্মচারী দমিত হয়। নীতিশিক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য দেশের কার্য্য তাঁহার জ্ঞান ছিল। অর্দ্ধেন্দু বহুসদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাহা বিকাশ হইবার প্রবল বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্দ্ধেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত তৎক্ষণাৎ সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং সে যখন যেদিকে লইয়া যাইবার চেষ্ট করিত, অর্দ্ধেন্দুকে সেই দিক লইয়া যাইতে কৃতকার্য্য হইতে, বলাবাহুল্য অর্দ্ধেন্দুর অভিনেতাদিগের প্রতি বিশেষ মায়া ছিল, যাহারা অকর্ম্মণ্য, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট ভর্ৎসিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিন্দাবাদ করিয়া অর্দ্ধেন্দুকে শুনাইত। কর্ত্তৃপক্ষীয় হইতে অর্দ্ধেন্দুর সম্বন্ধে একথা উঠিয়াছে, ওকথা উঠিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অর্দ্ধেন্দুকে অযোগ্য জ্ঞান করেন,—নানাবিধ নিন্দা করেন, "সাহেব এখানে তোমার থাকা উচিত নহে"—এইরূপে অর্দ্ধেন্দুর মনোভঙ্গ করিত। অর্দ্ধেন্দু তাহার বিশেষ তত্ত্ব না লইয়াই সেই সকল মিথ্যা কথা প্রত্যয় করিতেন। মিথ্যা বলিবারও তাহাদের কৌশল ছিল। হয়তো কার্য্যস্থলে বলা হইয়াছে, সাহেব অমন বলেন উহার মতে সকল কার্য্য করা চলে না। সে অবজ্ঞা নয় কথার উত্তরে কথা,—তাহা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ক্রোধ উৎপাদন করিত এবং অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া নূতন দল বসাইবার প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারেই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন,—কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার রঙ্গমঞ্চে মিলন হইবার পর সুহৃদ্‌ভেদকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট পাইয়াছেন,—তাঁহার গুণ বিকাশে বিস্তর বাধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দৈববিড়ম্বনা।"

অর্দ্ধেন্দুর প্রাণটা ছিল যেমনই উদার তেমনি সরল। তিনি সকলকেই নিজের মত ভাবিতেন। কাজেই তাঁহাকে পদে পদে ঠকিতে হইয়াছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র

অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র এই দুইজনের ভিতর কে বড় এই লইয়া নাকি কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন। কাহার কাহার নাকি বিশ্বাস অভিনেতা হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়। ইহাও নাকি কেহ কেহ বলেন সেই কারণে গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভার হিংসা করতেন এবং যাহাতে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতে না পারে সে জন্য তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমাদের মনে হয় এ-কথার মূলে কোনই সত্য নাই, গিরিশ বাবুর ন্যায় লোকের পক্ষে এতটা হীন হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। যিনি থিয়েটারের জন্য জীবন দিয়া গিয়াছেন,—অভিনেতা অভিনেত্রী যাঁহার প্রাণ ছিল, তিনি কি কখন এত নীচ হইতে পারেন? অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা যাহাতে ফুটিয়া উঠে, আমরা জানি, গিরিশচন্দ্র চিরদিন সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে যে তিনি কখন বাধা দিয়াছেন, এ কথা আমরা কখনও শুনি নাই। অনেক সময় দুঃখ করিয়া গিরিশচন্দ্রকেই আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, "অর্দ্ধেন্দু লোকের কথায় নাচিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছেন।" ইহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা বিকসিত হইবার কোন দিনই অন্তরায় ছিলেন না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র একস্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"কাহার কাহার ধারণা আমার উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একই কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন যে, 'গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই।' আমরা অনেক সময়ে একত্র ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ যিনি থাকুন,— যিনিই যত তাঁহার প্রশংসা করুন, যিনি যতই অন্তর হইতে বলুন যে, অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত হওয়ায় বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ,—এ কথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।"

উপরিলিখিত গিরিশচন্দ্রের লেখাটুকু হইতেই অনায়াসে প্রমাণ হইতে পারে যে গিরিশচন্দ্রের সহিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের কি এক অবিচ্ছেদ্য আন্তরিক ভাববন্ধন ছিল। তবে অভিনয়সম্বন্ধে কে বড় সে কথা লেখাই বাহুল্য। তাহার কারণ অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও গিরিশচন্দ্রের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইয়াছিল, এ কথা অর্দ্ধেন্দুর নিজের মুখে আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় অভিনেতা বড় একটা জন্মগ্রহণ করে না বটে, কিন্তু তা বলিয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন না। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রথম মহালা হয় তখন উইচ এর ভূমিকা অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহা ঠিক হইতেছিল না। এই উইচ-এর ভূমিকার কিরূপ ঠিক আবৃত্তি হইবে গিরিশচন্দ্র তাহা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে কতবার দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথমে কিছুতেই সেরূপ করিতে পারিতেছিলেন না, গিরিশচন্দ্রের আবৃত্তি এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাহা অননুকরণীয়। নূতন অভিনয়ের মহালায় এরূপ অনেক সময়ই হইয়াছে! নব ভাবোদ্ভাবনে ও উহার প্রয়োগে গিরিশপ্রতিভা অদ্বিতীয়। কাজে ইহা হইতেই বেশ জানিতে পারা যায় যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্থান গিরিশচন্দ্রের নিম্নে, উপরে তো নহেই। বিশ্বকোষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে রাজবাটীর অভিনয় দেখিয়াই অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা জানি রাজবাটীর অভিনয় দেখা ব্যতীতও অর্দ্ধেন্দুকে অনেক শিখিতে হইয়াছিল, রঙ্গালয়ে প্রবেশ লাভের পর তাঁহার গিরিশচন্দ্রের নিকটও অনেক শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছিল। যদি কেবল রাজবাটীর অভিনয় দেখিয়াই অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়শিক্ষার শেষ হইত তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, তিনি কখনই অর্দ্ধেন্দু হইতে পারিতেন না। অভিনয়কলা বড় সোজা বিদ্যা নহে,—শুধু দেখিয়া মানুষে কখনওএ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না, রীতিমত শিক্ষা ও প্রাণের সাধনার প্রয়োজন। অর্দ্ধেন্দুশেখর সে শিক্ষা, সে সাধনা, করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার এত সম্মান—তাই তিনি অর্দ্ধেন্দু। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন,—

'বিশ্বকোষে লিখিত আছে যে, এই অভিনয় (রাজবাটীর) দৃষ্টে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকি রহিল না। এ স্থলে "বিশ্বকোষ" ভ্রান্ত। পাথুরিয়াঘাটা রাজ বাড়ীর "মালবিকাগ্নি মিত্র', 'বিদ্যা সুন্দর', "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল", "বুঝলে কিনা!", "মালতী মাধব", 'উভয় সঙ্কট', "চক্ষুদান", "রুক্মিণী হরণ", "রসাবিষ্কারবৃন্দক" ও জোড়া সাঁকোর "নব নাটক" দেখিয়া নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষার কিপ্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি তাহা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্য্য 'To give to airy nothing a local habitation and a name' অর্থাৎ বায়ু নির্ম্মিত আকাশ কুসুমেতে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্রের উপলব্ধি ব্যতীত নট

কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্য ও আন্তরিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে নট তাহা বুঝিতে পারে না। "বিশ্বকোষ"-উল্লিখিত শিক্ষা ব্যতীতও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপর শিক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। কেবল পুস্তকপাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা শুনিলে অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসাভাজন হইতেন না। ম্যাক্‌বেথের উইচ প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে। * * * * *

* * স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না।

"* * * * * নটের কল্পনা যে সামান্য নহে তাহা বহু দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করা যায়। নাটকের চরিত্র লইয়া নট তচ্চরিত্র প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে ও শিল্প দ্বারা নিজ অবয়বে কিরূপ পরিবর্ত্তনই বা আবশ্যক তাহা দর্পণ সাহায্যে স্থির করেন। চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করাতেই অভিনেতার কার্য্যের অবসান হয় না। তাঁহার অবয়ব স্বেচ্ছানুসারে চালিত হওয়া চাই। শুনা যায় জগদ্-বিখ্যাত অভিনেতা সার হেনরী আরভিং ফরাসী মন্ত্রী "রিশলুর" ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজ রিশলুকে মার্জ্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই শত্রুদমনোৎসুক আরভিংরিশলু ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। সংবাদপত্রপাঠে জানা যায় ভারতের সীমান্তযুদ্ধে (চিত্রল সমরে) আরভিং দেখিতে আসিয়াছিলেন কিরূপে গুলির আঘাতে সতেজ সৈনিক মৃত হইয়া পড়ে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া ও সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই;—তাহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল বীরমদোজ্জ্বল মুখমণ্ডল কি প্রকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও তাহাতে মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়। দেহের উপর এরূপ আধিপত্যলাভ অল্প আয়াসের কার্য্য নহে। কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাব ভাব আনা নটের অতি কঠোর সাধনা। কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাবজ্ঞাপক নহে। সৈনিক পুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারিমুখে ব্যূহরচনা চিত্রিত করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলিভঙ্গীতে মালা গাঁথে, কেরাণী কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে; প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সুন্দর বস্তু দেখিয়া অন্যমনা হয়; বেদিয়া চলিতে চলিতে ডিগ্‌বাজী খায়; গায়ক শিস দেন, বাজিয়ে অঙ্গ বাজান— এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেন অভিনয় কালে এই সব ভাবভঙ্গী স্বভাবপ্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন।"

উপরি উদ্ধৃত গিরিশচন্দ্রের এই বিবৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষা ও সাধনা কম ছিল না। তা ছাড়া আমরা জানি ও শুনিয়াছি যে গিরিশচন্দ্রের নিকট হইতেও অর্দ্ধেন্দুশেখর অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের ভিতর অনেকেরই বিশ্বাস—শিক্ষকতায় অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল ও এই কথারই পোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিল্বমঙ্গলের শিক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখর যাহা দিয়াছিলেন তাহা গিরিশচন্দ্রের অপেক্ষা অনেক ভাল। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় বিল্বমঙ্গলের ভূমিকার অভিনয় ভাল হইয়াছিল কি অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় বিল্বমঙ্গলের ভূমিকা ভাল ফুটিয়াছিল সে কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসাকথনে রায় মহাশয় (দ্বিজেন্দ্রলাল) অর্দ্ধেন্দুর শোক সভায় 'বিল্বমঙ্গল' নাটক হইতে একটী দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থানে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে,—"তুমি অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর!" পূর্ব্বে একজন অভিনেতা, এই 'অতি সুন্দর,—অতি সুন্দর' ছত্রটী উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকর্ত্তৃক শিক্ষিত নট এই স্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্ন-কণ্ঠ করিয়া আনিতেন। রায় মহাশয় বলেন অর্দ্ধেন্দু-কৃত এই পরিবর্ত্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমি বিনীতভাবে বলিতেছি, তাঁহার এই মতের সহিত আমার সম্পূর্ণ অনৈক্য আছে। রায়মহাশয় বলেন যে উত্তরোত্তর চীৎকারে কামভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্রমে নিম্নকণ্ঠে বলিলে কামভাব বর্জ্জিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় প্রকারের অভিনয় তাঁহার চক্ষে সুন্দর। আমার মতে এই স্থলে কামভাব প্রকাশই নটের উচিত। ক্রমে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করিলে প্রদর্শিত হয় যে সরলহৃদয় কুহকিনীর রূপজালে জড়িত হইয়াছে। সেই মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম "অতি সুন্দর" আছে—'নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও' এই কথার পরে। দ্বিতীয় বারে আছে "চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!' তৃতীয়বারে এইরূপ 'নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।' বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না, বলিতেছে—এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত। কামদৃষ্টিতে সুন্দর, কিন্তু বস্তুতঃ রাক্ষসীর রূপ। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিম্ন করিয়া আনিলে প্রকাশ পাইত, অতিসুন্দররূপ-দর্শনে রূপের পূজা অন্তরে বিকাশ পাইয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের রূপপূজা করিবার অবস্থা নহে। এতদিন সে পূজা করিয়াছে, কিন্তু এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। কামশূন্য রূপপূজা সাধনার চরম—যে চরম অবস্থপ্রাপ্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শনে 'আহা। ' বলিয়াছিলেন। কামভাব প্রকাশ হওয়াতে বিল্বমঙ্গল ছোট হয় না। কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব—মধুরভাব লাভ হয়। বৃন্দাবনে গোপীদিগের

এইভাব লাভ হইয়াছিল। কামই শ্রীরাধার অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের জনক। রায়মহাশয় বক্তৃতায় বিদ্যাপতি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কবির প্রশংসা করেন, তাহার ভাব কামজনিত এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত। শুনিতে পাই বিল্বমঙ্গলের এই স্থল নিম্ন সুরে অভিনয় করাতে খুব করতালি পড়িয়াছিল। উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করিলে যদি করতালি না পড়ে, আর নিম্নস্বরে ঘন করতালি পড়িতে থাকে, তবে প্রকৃত নটের তাহা উপেক্ষা করা উচিত।* * * *

বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশ অভিনয়ে হয়ত কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্ন সুরে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাক না। নাটকেও পরে প্রকাশ আছে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াও কামের হাত এড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং স্থানীয় একটু মাধুর্য্যের অনুরোধে চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা নটের কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন—

It is not in eye or a lip we beauty call
But the joint result and the full force of all.

"অর্থাৎ কোন সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর ওষ্ঠ থাকিলে যে সুন্দর হয় তাহা নহে,—সমস্ত অঙ্গের সুসম্মিলন দেখিয়াই আমরা সুন্দর বলি।"

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় গিরিশচন্দ্র যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত দিয়াছিলেন। কাহার কাহার মতে "গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসার ছলে নিন্দাই করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরকে কোন দিনই দেখিতে পারিতেন, না—শেষে তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার শোকসভায় প্রশংসার ছলে নিন্দাই করিয়াছিলেন।" কিন্তু একথা একেবারেই ঠিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। অভিনেতা অভিনেত্রীর কথা উঠিলেই তিনি সর্ব্বাগ্রে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম করিতেন। সেই গিরিশচন্দ্র কখনও কি অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিন্দা করিতে পারেন? না কখনই না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় প্রবন্ধপাঠ করিবার পর যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধে লোকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই,—তিনি প্রশংসাবচনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের কেবল নিন্দাই করিয়াছেন, তখন তিনি যেরূপ প্রাণে আঘাত পাইয়া ছিলেন সেরূপ আঘাত বড় একটা তিনি জীবনে পান নাই। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন,—

"অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম, যে মৎকর্ত্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ননিন্দা জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণনা করিয়াছি তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে,—বুঝি বা তাঁহাদের মস্তিষ্কের উপযোগী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময় হইতেন,

তখন তিনি আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না। যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত যে ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না, তাহা হইলে তাহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল মাৎলামোতে তন্ময় হয় কিন্তু সে মাতাল মাতালে অভিনয় করিতে পারে না। নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন,—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপরখণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না,—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না, প্রতিযোগী অভিনেতা (Co-actor) ঠিক চলিতেছে কি না। যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কি না,—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কি না? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থেকে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখন কখন সাক্ষী-অংশ আরও বেশী হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশী থকিত। একটী প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি,—অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার নিকট শুনিয়াছি। কোন এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু "হরে চাকরকে" ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিল, "আজ্ঞে যাই।" অর্দ্ধেন্দুশেখর তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"ও গুওটা, তুমি ওইখানে ব'সে আছ"—এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল—তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ অর্দ্ধেন্দুকে লোকে অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভাল বাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম তাহা যদি আমার অপর পক্ষ না বুঝেন তবে তাঁহারা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন—অন্ততঃ 'Recent Actors' নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রশংসা—প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।"

অনেকে বলেন আজকাল বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে দুইটী প্রথায় অভিনয় হয়, একটী অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপরটি গিরিশচন্দ্রের। তাহাদের মত অর্দ্ধেন্দুর পদ্ধতিই স্বাভাবিক, গিরিশচন্দ্রের পদ্ধতিতে বড়ই সুরের আধিক্য। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কোন কথা বলিতে চাহি না, গিরিশচন্দ্র এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

* * * * একটী কথা চলিয়া আসিতেছে যে অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক। * * * আমার শিক্ষার সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সুরবর্জ্জিত স্বাভাবিক। * * * স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাবপ্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন,—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয় এবং ছন্দ ও সুর

কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়, আর নট ভাবপ্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন। সাধারণের ধারণা গদ্যে যাহা রচিত হয় তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নহে। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি, সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশীমাত্রায় করিলে তাহা ঢং হয়, আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়াম বলে। নাটকশিক্ষায় প্রণালী দুই প্রকার হয় না। কোন এক নাটক দুইজন নট দুইভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুইভাবে ব্যাখ্য করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে, তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখ্যার ভুল হইতে পারে, কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ যিনি যেরূপে নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি উহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়। যদি কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন, তবে তাহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে? কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নহে। * * * * নট মুখে রং মাখেন, কিন্তু দৃশ্যপটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনীত হয়, তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্‌সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য্য বোধ হইত; কিন্তু দূর হইতে অন্যরূপ দেখাইত—কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত—অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণসমাবেশের ন্যায় অভিনয় সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহালা দিবার সময়ে কঠোর হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না তিনি শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সরুকাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না, সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণা দৃশ্যে মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবতঃ চুপি চুপি করা হইলেও নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায় এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে—Rehearsal-এ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবেই। প্রেমিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে—অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে, দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে তাহা অন্ততঃ নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাসজনিত মাংসপেশীসঞ্চালন ত প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নটনটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে, কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন শিক্ষার্থীকে তাঁহার উহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব-সভাব-স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চীৎকার করেন তিনি Shakespear

এর স্বগত উক্তিগুলিকে (soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন? কেহ ত কাহাকেও শুনাইয়া মনের কথা বলে না। আবার শুনাইয়া না বলিলেও হ্যামলেটের "To be or not to be—that is the question ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশ সকল Shakesperer -এর অভিনয় হইতে বাদ পড়িত। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক যিনি বিচার করিতে চান তাঁহার শিক্ষিত দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, নচেৎ কাগজ কলম লইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনা মাত্র।"

"নটের আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত যিনি অভিনয় করিতেছেন, তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া উচিত। * * * * রাণাপ্রতাপ নাটকে পৃথ্বিরাজের ভূমিকা হাস্যরসাত্মক ও যোশীবাই এর অংশ গুরুগম্ভীর। একবার এই নাটকের অভিনয়ে পৃথ্বিরাজের ভূমিকার নট হাস্যরস প্রবল করিবার চেষ্টা করায় যোশীবাই-এর অভিনয়ে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বাধা-প্রদানে নট যে কেবল নাটক নষ্ট করেন তাহা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়েরও প্রশংসনীয় পরিচয় নহে। আবার সেই নট যাহাকে দাবাইয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করেন সে যদি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিনেতা হয় তবে রঙ্গালয়ে তাঁহার এ দোষ অমার্জ্জনীয়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায় তাহার প্রতি যত্নবান হওয়া নটের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।"

"অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে তিনি তাহার তর্ক বিতর্কে এতই মগ্ন হইতেন যে আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। সেস্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পলাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটকাইয়া রাখিয় অভিনয়বিষয়ক তর্ক বিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয়সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়,— তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর বিদ্যাদিগ্‌গজ দেখিয়াছেন তাঁহার স্মরণ হইবে যে আহারান্তে জলপান কালে বিদ্যাদিগ্‌গজের গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন গজপতি সত্যই জল পান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ সামান্য কার্য্যও কিরূপ অভ্যাসসাপেক্ষ। বস্তুত অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।"

উপরি লিখিত গিরিশচন্দ্রের উক্তি হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষা প্রণালী একই প্রকারের। গিরিশচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "যাহারা অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা প্রণালী বুঝেন না, তাঁহারাই কেবল এ কথা বলিতে পারেন, যে অর্দ্ধেন্দুর ও আমার শিক্ষা প্রণালী ভিন্ন প্রকারের।"

কেহ কেহ আবার বলেন,—অর্দ্ধেন্দুশেখর নাকি বলিতেন যে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গালায় কবিতা পাঠ ত সুন্দর হয়ই,—গদ্য পাঠের সময় ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ

করিয়া পড়িলেও সুন্দর হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র বলেন এ কথা একেবারেই ঠিক নহে। অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় অভিনেতার মুখ দিয়া এ কথা কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মুখে আর একটী নূতন কথা শুনিলাম—তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত একত্র বেড়াইয়াও জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন, যে অভিনয়কালে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গলায় কবিতা পাঠ তো সুন্দর হয়ই,—গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরুগম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোন আঘাত লাগিলে বৈপরিত্যই দেখা যায়। 'দীনহীন' শব্দটী তখন দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় না—'দিন হিন' ঐরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি—এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয় বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে "এইবারে দূত মহাশয়" এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না, রাণীর কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। "কৃষ্ণকুমারী' নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না,—চলিত ভাষায় যাহা লিখিত তাহাতে ত চলিবেই না—আব কবিতায়-—

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলীরে
রাধিকারমণ।

এই সুললিত ছন্দ নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী ইত্যাদিরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে তাহা পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন। * * * * বাঙ্গালা নাটকে অবশ্য ক্বচিৎ কোন ভূমিকায় স্থলবিশেষে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা—ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায় আকাশের দিকে চাহিয়া "রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্চেন!" ইত্যাদি স্থলের অভিনয় কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।"

অর্দ্ধেন্দুর সহিত গিরিশচন্দ্রের যে প্রকৃত কোনও মনোমালিন্য ছিল না, এ কথা বোধ হয় আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই। গিরিশচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি প্রায়ই বলিতেন, "থিয়েটারে আমি ও অর্দ্ধেন্দু হইলাম সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন,—কাজেই আমাদের দুইজনের ভাব সকলের অপেক্ষা বেশী।" মনে মনে অর্দ্ধেন্দুর উপর গিরিশচন্দ্রের যে টান ছিল,—সেরূপ টান তাঁহার অপরের উপর ছিল না। তিনি চিরদিনই অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং যেখানে সেখানে তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা

করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, যে সব সময় অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র এক থিয়েটারে ছিলেন সেই সব সময় অর্দ্ধেন্দুর কথার উপর তিনি কোন দিন কোন কথা কহেন নাই। হয়তো নূতন পুস্তকের ভূমিকা বিতরণের পর একজন অভিনেতার ভূমিকা অর্দ্ধেন্দু পরিবর্ত্তন করিয়া আবার একজন অভিনেতাকে প্রদান করিলেন। এই পরিবর্ত্তনের জন্য থিয়েটারশুদ্ধ সমস্ত অভিনেতা ক্ষুণ্ণ হইয়া অর্দ্ধেন্দুর এই অন্যায়ের জন্য গিরিশচন্দ্রকে জানাইলেন,— সকলে মিলিয়া গিরিশচন্দ্রকে গিয়া বলিলেন, "অর্দ্ধেন্দুবাবু অমুক অভিনেতার ভূমিকাটী অন্যায় ভাবে কাড়িয়া লইয়াছেন, —এ অন্যায়ের আপনাকে যাহা হয় একটা প্রতীকার করিতেই হইবে।" কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাহার উত্তরে প্রায়ই বলিতেন, "অর্দ্ধেন্দু যখন করেছে, তখন তার প্রতীকার আমি কিছু কর্ত্তে পারি না।"

গিরিশচন্দ্রের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গিরিশচন্দ্রের অর্দ্ধেন্দুর উপর কতটা বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। রঙ্গরঙ্গালয়ে এমন কোন অভিনেতা অভিনেত্রী নাই—যিনি অর্দ্ধেন্দুকে না প্রশংসা করিয়াছেন,—যিনি তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন। যখন সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে মুগ্ধ, তখন কি গিরিশচন্দ্র, যিনি রঙ্গালয়ের জন্য জীবন দিয়া গেলেন,—যাঁহার নাট্যকলা ধ্যান জ্ঞান ছিল তিনি কি প্রতিভার নিন্দা করিতে পারেন? কাজেই বুঝিতে হইবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত কোনও মনোমালিন্য তো ছিলই না, বরং সদ্ভাবই ছিল। আমরা অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্রের সহিত কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা দেখাইলাম। এইবার অর্দ্ধেন্দু কোন কোন ভূমিকা অভিনয়ে অমর হইয়া আছেন তাহাই বলিব।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়

অর্দ্ধেন্দুশেখর রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের অধিকাংশ নাটকেই কোন না কোন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে 'সধবার একাদশী'তে জীবনচন্দ্র, 'লীলাবতী'তে হরবিলাস, 'নীলদর্পণে' উড্ সাহেব ও 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কয়টী ভূমিকা অভিনয়কালে তিনি এমন একটী নূতন কল্পনা দেখাইয়াছিলেন,—যাহা দেখিয়া স্বয়ং গ্রন্থকারকে পর্য্যন্ত বলিতে হইয়াছিল, যাহা দেখিলাম,—আমার নাটকের ভূমিকা যে এত সুন্দর অভিনয়ে ফুটিতে পারে, তাহা আমি কোন দিন ধারণাও করিতে পারি নাই। এই কয়টী ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু এমন একটী রং দিয়াছিলেন যাহা গ্রন্থকারেরর কল্পনাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। উপরিলিখিত চারিটী ভূমিকারই অর্দ্ধেন্দু যাহা অভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহা একেবারে অননুকরণীয়। এই চারিটির ভিতর আবার জলধরের ভূমিকাটী শ্রেষ্ঠ। অর্দ্ধেন্দুর অভিনীত সব ভূমিকাই অননুকরণীয়, তবে জলধরের তুলনা হয় না। এটী যেন একেবারে সত্যিই জলধরের সজীব মূর্ত্তি জীবন পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। সেই পুকুর ঘাটে শিস্ দেওয়া হইতে 'হোদোঁল কুতকুতে' পর্য্যন্ত কোথায়ও একটুকু অস্বাভাবিক বা এক ঘেয়ে লাগিত না। নবীন তপস্বিনীর জলধরের ভূমিকাই অর্দ্ধেন্দুকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যদি অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে এক জলধরের ভূমিকা ব্যতীত অপর কোন ভূমিকার অভিনয় না করিতেন তাহা হইলেও তিনি ঐ এক ভূমিকা অভিনয় করিয়াই নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকতেন। আমাদের এটা বড় কম দুর্ভাগ্য নহে যে ভাল নাটক আজ কাল আর থিয়েটারে অভিনয় হইবার উপায় নাই। কেমন করিয়া হইবে? আমরা আজকালকার চল্‌তি থিয়েটারের কোন এক স্বত্বাধিকারীর মুখে শুনিয়াছি যে আজ কাল থিয়েটারে ভাল নাটক অভিনয় না হইবার প্রধান কারণ ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী নাই। যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দ্বারা ইদানীন্তন থিয়েটার চালিত হয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অভিনয় কি জানেনও না বুঝেনও না,—কাজেই তাহাদের দ্বারা

প্রকৃত নাটকের অভিনয় করানটা একেবারেই সম্ভবপর নহে। গীতিনাট্য যা তা অভিনেতা দিয়া সাজ পোষাকের জাঁক জমক করিয়া চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নাটকে তাহা হয় না। নাটক জমা না জমা অভিনেতা অভিনেত্রীর উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পূর্ব্বে যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ে তিলার্দ্ধ স্থান থাকিত না,—আজ কাল সেই সকল নাটকের অভিনয় হইলে দর্শকের একেবারে সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না,—তাহার প্রধান কারণ তখন অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল, নাটক আপনি জমিয়া উঠিত,—এখন অভিনেতা অভিনেত্রী নাই, কাজেই নাটক জমে না। এখন যদি কোন থিয়েটারে নবীন তপস্বিনীর অভিনয় হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সে থিয়েটারে দর্শকের সংখ্যা একেবারে হইবে না। সে জন্য তো আমরা বলিতে পারিব না যে নবীন তপস্বিনী নাটকখানি কিছু নহে, কিংবা লোকে আজকাল ওরকম নাটক চায় না। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আজ কালকার অভিনেতা অভিনেত্রীর দ্বারা আসল অভিনয় হয় না। কাজেই নাটক কেহ দেখিতে চায় না। শুধু নাচ গান দেখিতেই লোকে থিয়েটারে যায়। "জলধরের" ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে এমন একটা অভিনেতা আর বঙ্গরঙ্গালয়ে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আজ কাল যদি কোন অভিনেতা 'জলধরের" ভূমিকা অভিনয় করেন, তাহা হইলে সেটা আর অভিনয় হইবে না, অভিনয়ের ভ্যাঙ্গচানি হইয়া দাঁড়াইবে। বঙ্কিমবাবুর দুইখানি পুস্তকে অর্দ্ধেন্দুশেখর দুইটী ভূমিকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—একটী "কপাল কুণ্ডলায়" মুখুজ্যে মহাশয়, আর দ্বিতীয়টী দুর্গেশ নন্দিনীতে "বিদ্যাদিগ্‌গজ"। কপাল কুণ্ডলার মুখুয্যে মহাশয়ের ভূমিকাটি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রটুকুর ভিতরই অর্দ্ধেন্দু যেটুকু বস্তু দিয়াছেন তাঁহার সেই টুকুর অনুকরণ আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনেতাই পারিল না। যিনিই এই ভূমিকাটি অভিনয় করিয়াছেন তিনিই একেবারে উহা নষ্ট করিয়া বসিয়াছেন,—যেন চৈত্র মাসের সঙ্‌, সে যে বিশ্রী অভিনয় হইয়াছে—তাহা কালি কলমে লেখা যায় না। সেই অভিনেতাকে যদি আবার জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি এ ভূমিকাটী কেন এ ভাবে অভিনয় করিলেন,—তাহার উত্তরে তিনি বলেন, "ওটুকু ভূমিকা, ওর আবার হবে কি? যদি তার উত্তরে বলা যায়, কেন মশাই অর্দ্ধেন্দু বাবু তো এইটুকু ভূমিকাও বেশ সুন্দর অভিনয় করিতেন,—বেশ একটু দেখবার আগ্রহ হতো, আপনাদের তেমন হয় না কেন? তাহার উত্তরে অমনি তিনি বলিয়া ফেলেন,—"আমরা তো আর মশাই অর্দ্ধেন্দু নয়।"

আজকালকার অভিনেতাগণ যে অর্দ্ধেন্দুবাবু নন,—তাহা আমরা জানি। আমি তাঁহাদের অর্দ্ধেন্দুবাবু হইতে বলিতেছি না,—কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর মত চেষ্টা করিতেও কি তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না? কেবল বেতন পাইবার আশায় যাঁহারা অভিনয় করেন,—তাঁহাদের দ্বারা নাট্য-কলার উন্নতি আশা করা একেবারেই যায় না। সাধনা ব্যতীত অভিনেতা হওয়া যায় না, যাঁহাদের প্রাণের একাগ্রতা নাই তাঁহারা কেমন করিয়া অভিনেতা

হইবেন? যাক্ আমরা আসল কথা ছাড়িয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পুস্তকে অর্দ্ধেন্দুশেখর দুইটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—একটীর কথা বলিয়াছি এইবার দ্বিতীয়টীর কথা বলিব। দুর্গেশনন্দিনীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিদ্যাদিগ্‌গজ সাজিতেন। এই বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের দেখিয়াছি ও ইদানীং অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরলোক গমনের পর আরও কয়েক জন অভিনেতার দেখিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই জানিতেন তাহা কত সুন্দর হইত। আহার করিতে করিতে বিমলার ডাকে হুঁ শব্দটুকু পর্য্যন্ত আজও আমাদের কাণে বাজিতেছে। বিদ্যাদিগ্‌গজ আহারে বসিয়াছেন, আহার করিতে করিতে কথা বলিলে আহার নষ্ট হয়, অথচ সাড়া না দিলেও বিমলা ফিরিয়া যায়, এ অবস্থায় সাড়া দিবার সেই হুঁটী কত সুন্দরভাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর আবৃত্তি করিতেন যে সেরূপভাবে আবৃত্তি করা বড় একটা যে সে ক্ষমতার কাজ নয়। এই বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ অভিনয় আর হইবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মুখে সেই মাণিকপীরের গানটী,—"মাণিকপীর ভবপারে যাবার না"গানটী এত সুন্দর হইত যে এক মুখে তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকার অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর যথেষ্ট যশ পাইয়াছেন; যখনই অর্দ্ধেন্দুশেখরের কথা মনে পড়ে তখনই সেই তাঁহার বিদ্যাদিগ্‌গজের ছবিটুকু মনের ভিতর অমনি জাগিয়া উঠে। তাহার পর কতবার কত জনের বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা দেখিলাম, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রাণের ভিতর যে ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়, আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই, তাই যখনই অন্য কোন নিম্নশ্রেণীর অভিনেতার দ্বারা এই ভূমিকার অভিনয় আমরা দেখি, তখন যাহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখেন নাই, তাঁহারা তাহাদের সেই অভিনয় কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের চক্ষে তাহা মহাবিকট ঠেকে।

কবিবর ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকের যখন ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় হয়, তখন এই প্রত্যাদিত্য নাটক তাঁহারই শিক্ষায় গঠিত হয়। প্রতাপাদিত্য নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই চরিত্রটী গ্রন্থকার একভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমিকাটী অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর তাহা অপর ভাবে ফুটাইয়া তোলেন। এই ভাব পরিবর্ত্তনে গ্রন্থকার মহালার সময়ে বিশেষ যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই তাহা নহে, কিন্তু অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা লইয়া যখন অবতীর্ণ হইলেন এবং অভিনয়ে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া যখন সমস্ত দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিলেন, তখন গ্রন্থকার বুঝিয়া ছিলেন অর্দ্ধেন্দুর এই ভাব পরিবর্ত্তনে তাঁহার নাটকের শোভা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতাপাদিত্য নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা ছাড়াও আর একটী ভূমিকা ছিল। তিনি এই নাটকে রডার ভূমিকাও অভিনয় করিতেন। সাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিতে অর্দ্ধেন্দুর

জুড়ী ছিল না, সাহেবের ভূমিকা নিখুঁত অভিনয় কবিবার জন্য তাঁহার নামই সাহেব হইয়া গিয়াছিল কাজেই এ ভূমিকাটী কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা লেখাই বাহুল্য। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে সে ছবি আজও আমাদের প্রাণে অঙ্কিত হইয়া আছে।

ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সেই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে সহসা রাণা প্রতাপ নাটকের অভিনয় হইবার কথা হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন কেবলমাত্র অল্পদিন মিনার্ভা থিয়েটার আসিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে শনিবার রাণা প্রতাপ অভিনয় হয় যে সেই শনিবার রাত্রিতে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ রাণা প্রতাপ নাটক তাঁহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিবেন স্থির করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পর সপ্তাহেই রাণা প্রতাপ নাটক তাঁহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিতে সক্ষম হন। সে সময় যদি মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর না থাকিতেন তাহা হইলে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কিছুতেই এক সপ্তাহের ভিতর অত বড় একখানি নাটক অভিনয় করিতে সমর্থ হইতেন না। এটা বড় একটা কম বাহাদুরীর কর্ম্ম নহে। রাণাপ্রতাপ নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর পৃথ্বিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই ভূমিকার অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিশেষ নাম লইতে পারেন নাই। পৃথ্বিরাজের ভূমিকা গ্রন্থকার যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে হাস্যরসের অংশ খুববেশী নাই। কেহ কেহ বলেন এই ভূমিকায় অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখর হাস্যরসের বাহুল্যের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। এ কথাটা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এই ভূমিকাটী অর্দ্ধেন্দুর মত হয় নাই। অভিনয়ে হাস্যরসের এতই বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছিল যে পৃথ্বিরাজের চরিত্রটী একেবারে লঘু হইয়া পড়িয়াছিল, অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় অভিনেতার নিকট হইতে গ্রন্থকার এরূপ আশা করেন নাই। আমরা শুনিয়াছি, দেখি নাই, একদিন নাকি অর্দ্ধেন্দুশেখর পৃথ্বিরাজের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এমনি তাহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন যে তাহাতে যোশীর ভূমিকা যে অভিনেত্রী অভিনয় করিতেছিল তাহার অভিনয় পর্য্যন্ত মাটী হইয়া গিয়াছিল। যদি সত্যই এরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেটা অর্দ্ধেন্দুশেখরের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক ও গীতনাট্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর বহু ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতি ভূমিকার অভিনয়েই তিনি বেশ একটা নূতন ছবি দেখাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র যখন আবুহোসেন গীতিনাট্যের মহালা দিতে আরম্ভ করেন তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ইচ্ছা করিয়াই আবুর ভূমিকা গ্রহণ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন ভূমিকাটী স্বয়ং চাহিয়া লইতেছেন তখন তাঁহাকে না বলা যায় না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র, যখন অর্দ্ধেন্দু একরকম জোর করিয়া এই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন মনে মনে এই ভূমিকাটীর জন্য বেশ একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের দ্বারা এই ভূমিকাটী কিছুতেই উত্তম অভিনয় হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম রাত্রে যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর এই আবুর

ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন এবং কৌতুক-অভিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিলেন তখন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল, "অর্দ্ধেন্দু তোমার জুড়ী নাই। তোমরা তুলনা কেবল তুমিই।"

অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে যেমন একটা নূতন ভাব ছিল তাঁহার শিক্ষারও তেমনি একটা নূতন পদ্ধতি ছিল। কেহ কেহ বলেন, "গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা ও অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা প্রণালী ভিন্ন প্রকারের ছিল; সেই জন্য গিরিশচন্দ্র শিষ্য শিষ্যারা এক ভাবে অভিনয় করেন, আর অর্দ্ধেন্দুর শিষ্য শিষ্যার অভিনয় প্রণালী অন্য প্রথায়।

"গিরিশ বাবুর দ্বারা ঐ সময়ে যে নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি ষ্টারের বর্ত্তমান প্রবীণ অভিনেতৃগণের উদ্ভব হইয়াছিল। ঐ প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াই মিনার্ভা থিয়েটার হইতে, শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনুকূল বটব্যাল প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছে। * * * * *

এই নবীন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি নবীন যুবক অভিনেতা হইয়া উঠে,—যথা,—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী, বি, এ, শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি। উপরি লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অভিনেতৃনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,—যথা, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী হেনা, শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী প্রকাশমণি, শ্রীমতী কিরণবালা, শ্রীমতী ভূষণকুমারী প্রভৃতি।"

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া যে সকল অভিনেতৃগণ অভিনেতা নাম পাইয়াছেন ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃগণ যাঁহারা অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এই দুই সম্প্রদায়ের অভিনয়ভঙ্গী স্বতন্ত্র। এই দুই তথাকথিত প্রণালীর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে যে বিশেষ কোনও বৈলক্ষণ্য নাই তাহা আমরা পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্রের নিজ বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে এই তথাকথিত দুই প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর ক্ষণজন্মা পুরুষ,—তাঁহার শিক্ষা অদ্ভুত, তাঁহার সাধনা অদ্ভুত। অভিনয় করিয়া, অভিনয় শিখাইয়া আমোদ-আহ্লাদে হাসিয়া নাচিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত

হইয়া গিয়াছে। বঙ্গরঙ্গালয় তাঁহার নিকট চির ঋণী হইয়া থাকিবে। তাঁহার শিক্ষায় অনেকগুলি অভিনেতা অভিনেত্রীর সৃষ্টি,—তাঁহার শিক্ষা পাইয়া তাহারা অভিনেতা অভিনেত্রী নামে পরিচিত হইয়া আজও বঙ্গরঙ্গালয়ের গৌরব বহন করিতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবন রঙ্গালয়ের ভিতর কাটিয়া গিয়াছে,—তাঁহার জীবনের সহিত রঙ্গালয়ের কত স্মৃতিই জড়িত! সে সকল কথা বিস্তৃতভাবে লেখা সম্ভব নহে। আমরা শেষ কয়েকটী কথা লিখিয়া তাঁহার জীবনী শেষ করিব। মানুষকে আনন্দ দিবার জন্যই তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল,—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালীকে নানাভাবে আনন্দ দিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ কথা

অর্দ্ধেন্দুর গুণের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সহিত একদিনের জন্যও যাহার আলাপ হইয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইয়াছে অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত লোক আর হয় না। তাঁহার বাড়ীতে যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাহাদের তিনি এমনভাবে আপ্যায়িত করিতেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা যতক্ষণ তাঁহার বাটীতে থাকিতেন ততক্ষণ অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে নানারূপ মজার কথা বলিয়া এমন আমোদে রাখিতেন যে তাঁহারা তাঁহার বাটী হইতে উঠিতে পারিতেন না। কেহ হয় তো সামান্য একটা কথা বলিবার জন্য সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট গিয়াছেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর নিকট উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে তথাপি উঠিতে পারেন নাই, হয়তো অনেক জরুরী কাজও পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তবুও অর্দ্ধেন্দুর নিকট হইতে উঠিতে পারেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর নিকট যাইয়া লোকে কিরূপে সময় অতিবাহিত করিত সে সম্বন্ধে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের নাট্যপ্রতিভা সিরিজের জন্য স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাঁহারই ভাব নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

'ব্যোমকেশের সঙ্গে আমি প্রায়ই তাঁদের বাগবাজারের বাসায় যেতেম, যখন বৃদ্ধ অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে আমাদের কাছে বসতেন, বুড়ীর পিঠে গড়বার কথা তিনি যে কতবার আমাদের নকল করে শুনিয়েছেন, তার সংখ্যা নেই। বুড়ি জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে কাঁথা ও লেপ মুড়ি দিয়ে যে পিঠে কি করে তৈরী কচ্ছিল তা অর্দ্ধেন্দু বাবু এমনই কণ্ঠস্বর করে বলে যেতেন যে আমরা হাসতে হাসতে মেঝয় গড়াগড়ি দিয়ে পড়তুম। আমরা তাঁর ছেলের বন্ধু, কিন্তু তিনি এমনই ভাবে মিশতেন যেন মনে হ'তো তাঁর সঙ্গে আমাদের বয়স বা পদের কোন পার্থক্য নাই। এক অবাধ সারল্য যেন সকল বাধার গণ্ডী অতিক্রম করে বুড়োকে এনে যুবকের সঙ্গে এক পংক্তিতে মিলিয়ে দিত। গগন বাবুর বাটীতে ষ্টার থিয়েটারের একবার অভিনয় হচ্ছিল—মনে হচ্ছে তা তাঁর বড় ছেলের বিয়ের

সময়—সে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে। অর্দ্ধেন্দুবাবু 'গজপতি দিগ্‌গজ' সেজে এসেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত পোড়া কাঠের মত পা, লম্বকর্ণ দিগ্‌গজ ঠাকুর সেদিন যেমন আমার চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন—এমন তাঁর বই পড়ে কখন হয়নি। দিগ্‌গজ যখন মুসলমান ফকির সেজে মাণিকপীড়ের ছড়া আওড়াচ্ছিলেন, "হপ্তদিনের সরা গরুদন্তে কাটে ঘাস"—তাঁর মুখে সেই দিন শুনেছিলুম, এখনও তা বেশ মনে আছে এবং লাঠী হাতে টুপি মাথায় উদ্ভট ফকির মুর্ত্তি এখনও যেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাঁর অভিনয় মনের উপর এমনই ছাপ মেরে গেছে!"

অর্দ্ধেন্দুশেখরের আর এক গুণ ছিল, তিনি কোন নাটকের সম্পূর্ণ চরিত্রগুলি আয়ত্ত না করিয়া কোন চরিত্র কোন অভিনেতাকে শিক্ষা দিতেন না। তিনি যখন যে থিয়েটারে থাকিতেন, তখন সেই থিয়েটারে নূতন কোন নাটক অভিনয় হইবার কথা হইলে অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথমে সেই নাটকখানি আগা গোড়া পাঠ করিতেন। তিনি এমনভাবে সেই নাটকখানি পাঠ করিতেন যে উহার সমস্ত চরিত্রগুলি তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। নাটকখানি পাঠ করিবার পর তিনি তাঁহার সমস্ত চরিত্রগুলি মনে মনে বিশ্লেষণ করিতেন ও কোন চরিত্রটীতে কোন ঢং দিলে নাটকের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবে তখন কেবল হইত তাঁহার তাহাই চিন্তা। এক একটি চরিত্র লইয়া মনে মনে নানাভাবে কেবলই আবৃত্তি করিতেন। এইভাবে আবৃত্তি করিয়া যে ভাবটা তাঁহার মনঃপুত হইত তিনি সেইভাবেইসেই চরিত্রটী শিক্ষা দিতেন। একবার যদি অর্দ্ধেন্দুশেখর বুঝিতেন যে এই ভূমিকাটীতে এই ঢং দেওয়া উচিত,— এই ঢং দিলে এই ভূমিকাটীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে লোকের কথায় কোন দিনই তিনি তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতেন না। এ সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাঁহারই ভাষায় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

"ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য নাটকের তখন ষ্টার থিয়েটারে মহালা চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন ষ্টার থিয়েটারে। এই নাটকখানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হয় তাহারই জন্য তিনি মহোৎসাহে শিক্ষা দিতে ছিলেন। একদিন রাত্রে ক্ষীরোদবাবুর সহিত আমি প্রতাপাদিত্য নাটকখানির মহালা দেখিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত সমস্ত নাটকখানির মহালা হইল। রিহার্সল দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম নাটকখানি জমিয়া যাইবে। রিহার্সল শেষ হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। রিহার্সল ভাঙ্গিবার পর যখন আমরা বাড়ী ফিরিতে ছিলাম সেই সময় ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, 'সমস্ত চরিত্রগুলিই আমরা মনোমত হইয়াছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের ভূমিকাটী খারাপ হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়। ও ভূমিকাটী ঠিক হয়নি।"

ক্ষীরোদবাবুর এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আপনি কেন এ কথাটা অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বল্লেন না?"

ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! সাহেব তা'হলে চটে লাল হয়ে যেতেন। ওর

ওইটাই হ'লো সব চেয়ে দোষ যে কারুর কথা শোনেন না। যদি ও কথা আমি বলতেম তা'হলে তিনি চটেমটে ও ভূমিকাটা তো ছেড়ে দিতেনই, হয়তো কোন ভূমিকারই অভিনয় কর্ত্তেন না।"

ক্ষীরোদবাবুর এ কথায় আমি কিন্তু সায় দিতে পাল্লেম না। আমি বলিলাম,—"আপনার যদি সাহস না হয় আমি ও কথাটা কাল তাঁকে বলবো।"

পরদিন সকালে আমি অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং বক্তব্যটুকু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি যা বল্লে ভায়া ও কথাটা যে আমি ভাবিনি—তা নয়, কিন্তু একটা ভূমিকা নিয়েই একখানা নাটক হয় না; নাটকের সব চরিত্রগুলিরই সামঞ্জস্য রাখা দরকার। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটা একটু লঘু না কল্লে বসন্তরায়ের ভূমিকাটী কেমন করে ফুটবে?"

অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথাটা আমি বেশ বুঝিলাম,—কাজেই ও সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না। যথা সময়ে ষ্টার থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় হইল। প্রথম রাত্রেই অভিনয় দেখিবার জন্য আমি ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা লইয়াছিলেন। আগাগোড়া তাঁহার অভিনয় দেখিলাম, বুঝিলাম তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। আমারা মনে হইল বিক্রমাদিত্যের ভূমিকাটী তিনি যে ঢঙে অভিনয় করিলেন তাহাই ঠিক। এ ভূমিকার জন্য যে কোন ঢঙে অভিনয় হইত তাহাতে ভূমিকাটীর গৌরব বর্দ্ধিত না হইয়া লঘুই হইত। অর্দ্ধেন্দুবাবুর ঈশ্বর দত্ত এমন একটী ক্ষমতা ছিল যে তিনি ভূমিকাটী একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন, চরিত্রটী কি এবং ইহাতে কিরূপ রং দিলে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। যে রংটী যে ভূমিকায় দিলে সেই ভূমিকাটী ফুটিয়া উঠে তিনি ঠিক সেই রংটী সেই ভূমিকায় প্রদান করিতেন। কাজেই তাঁহার অভিনয় অননুকরণীয় হইত। অর্দ্ধেন্দুশেখর যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেরূপ শক্তি লাভ অতি অল্প অভিনেতার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।"

অর্দ্ধেন্দুশেখর যদি থিয়েটারের আলোচনা করিতে পাইতেন তাহা হইলে আর কোন আলোচনাই করিতে চাহিতেন না। যখনই যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনই তিনি কেবল থিয়েটারের আলোচনা করিতেন। কেমন করিয়া থিয়েটারের উন্নতি হইবে, কি করিলে অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। লঘু, কৌতুকময় ও গম্ভীর, তিনি সকল রকম ভূমিকারই অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তবে গম্ভীর ভূমিকা অপেক্ষা হাস্যরসপূর্ণ ভূমিকারই তাঁহার নাম অধিক, তাহার কারণ আমাদের মনে হয় তিনি হাস্যরসপূর্ণ ভূমিকারই অভিনয় করিতে বেশী ভাল বাসিতেন। সেইজন্য হাস্যরসপূর্ণ ভূমিকারই তিনি অধিক অভিনয় করিয়াছেন। গম্ভীর ভূমিকায় অভিনয়ও তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে অতি অল্প। কাজেই হাস্যরসপরিপূর্ণ অভিনয়েই, তাঁহার নাম অধিক। যোগেশ ও জলধরের ভূমিকার অভিনয়

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শেষ অভিনয়। একটী সুগভীর ও অপরটী হাস্যরসপরিপূর্ণ। যোগেশের ভূমিকার অভিনয় আজও হইতেছে, কিন্তু জলধরের ভূমিকার অভিনয় আর হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্দ্ধেন্দুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমিকার অভিনয়ও শেষ হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর চলিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী ভাল ভাল বড় ভূমিকার অভিনয়ও একেবারে চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গরঙ্গালয়ে সে সকল ভূমিকার অভিনয় হইবার আর আশা নাই। সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেমন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় সেইরূপ অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের একটা দিক একেবারে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে এদেশে যেমনটী যায় তেমনি আর আসে না।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় নিযুক্ত ছিলেন। তখন মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে। বাঙ্গালার সমুদায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশে তখন মিনার্ভা থিয়েটার সর্ব্বোপরি সগর্ব্বে চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে সময় শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—থিয়েটারে রাত্রিজাগরণ তাঁহার শরীর আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সেই সময় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তাঁহার থিয়েটার হইতে অবসর লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। থিয়েটারে স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহার শরীরের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য অবসর লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের সুহৃদগণ সে অনুরোধটা অন্যভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে তাড়াইবার মতলব আঁটিয়াছেন, অতএব তাঁহার অবিলম্বে মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করা উচিত। অর্দ্ধেন্দুশেখর কোন দিনই ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে যেরূপ বুঝাইয়া দিলেন তিনি সেইটাই ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দিয়া নব প্রতিষ্ঠিত কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিলেন। কোহিনুর থিয়েটার তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাজেই সেখানে সবই নূতন। নূতন থিয়েটার, নূতন অভিনেতা অভিনেত্রী, নূতন নাটক। অর্দ্ধেন্দুশেখর সেই অসুস্থ অবস্থায় নূতন নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসুস্থ শরীরে অত পরিশ্রম আর সহ্য হইল না, দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়িত হইলেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"যখন শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়, উক্তরূপ সুহৃদ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে তাঁহাকে (অর্দ্ধেন্দুশেখরকে) বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুর থিয়েটারে গিয়া পীড়ার যতদূর সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সুহৃদ নিকটে ছিল। নাট্য জগতের উজ্জ্বল তারকা খসিল। ঐ সকল কর্ম্মচারীর মুখেই এখন আবার তাঁহার নিন্দা—উনি

কথা শুনিতেন না, কেবল অত্যাচার করিয়াছেন। আমি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলি—"বাপু তোমাদের মঙ্গল হউক, রঙ্গালয় যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা তোমরা স্বপ্নেও কখন বুঝিতে পারিবে না। জলধর ও যোগেশ অর্দ্ধেন্দুর শেষ অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে বহুদিন আর "নবীন তপস্বিনী" অভিনয়ের সম্ভব রহিল না।"

অর্দ্ধেন্দুশেখরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকো বাবু) তাঁহার চিকিৎসা যাহাতে রীতিমত হয়, সেইজন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান এবং তাঁহার সাধ্যাতীত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কালের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়াও থাকোবাবু অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। দুই চারি দিন চিকিৎসার পর তাঁহার অবস্থা একটু ভাল দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন বুধবার। সকালে যিনিই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তিনিই ভাবিয়াছিলেন অর্দ্ধেন্দু এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। থাকো বাবু চিকিৎসকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা আর একটু ভাল হইলেই তিনি তাঁহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কাশী লইয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইল না। সন্ধ্যার পর হইতেই অর্দ্ধেন্দুর অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ হইল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে, যে দিন থিয়েটারে রাত্রি একটার পর অভিনয় হইবে না এই আইন পাশ হইল, সেই রাত্রিতে একটার সময় অর্দ্ধেন্দু সজ্ঞানে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সেই অচেনা দেশে চলিয়া গেলেন যেখানে মানুষ জীবিত অবস্থায় যাইতে পারে না। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুকে শেষ একবার দেখিবার জন্য শত শত লোক থাকোবাবুর বাড়ীতে আসিয়া জমা হইল। যথা সময়ে অর্দ্ধেন্দুর চন্দনভূষিত দেহ নীত হইল। লেলিহান অগ্নি শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অচিরে তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল,—সব শেষ হইয়া গেল।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের যে কোন দোষ ছিল না এ কথা আমরা কিছুতেই সাহস করিয়া বলিতে পারি না, তবে মোটের উপর দোষে গুণে তাঁহার মত লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধেন্দুশেখর বহুদিন চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজও বঙ্গরঙ্গালয় তাঁহার অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। অর্দ্ধেন্দুর অভাবকোন দিনই পূর্ণ হইবে না, পূর্ণ হইবারও নহে।

পরিশিষ্ট

"Art necessarily presupposes knowledge. Art, in any but its infant state, presupposes scientific knowledge; and if every art does not bear the name of a science, it is only because several sciences are often necessary to form the ground work of a single art."—J. S. Mill.

"Art is the right-hand of nature. The latter only gave us being, but 'twas the former made us men. Practical success in art must come from every day ambition and experiment."—Stedman.

অভিনয় সম্বন্ধে এযাবৎ আমরা নাট্যপ্রতিভা সিরিজে যতটুকু বলিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে অভিনয় যে ঢঙ্ কিংবা নানা পোষাকে আবৃত হইয়া যথেচ্ছ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনা করিতে করিতে কতগুলি কথার আবৃত্তি নহে তাহা বোধ হয় আমাদের পাঠকমাত্রকে বুঝাইতে পারিয়াছি। 'পুতুলের নাচ', 'বহুরূপীর সাজ', 'যাত্রার সঙ্গীত' 'হাফআকড়াইয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি', 'বেদীয়ার খেলা' চিত্রাভিনয়,—এগুলি যে একেবারে অভিনয় নহে তাহা বলিবার যো নাই, কেন না অবস্থার অনুকরণ মাত্রই অভিনয়, তবে উহারা ললিতকলার প্রধান অঙ্গরূপী অভিনয় নহে। অবস্থার প্রকৃত অনুকরণই অভিনয়, কল্পিত অস্বাভাবিক অনুকরণ অভিনয় নহে। সেইজন্যই মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বাক্য, সাত্ত্বিকতা ও বেশের অনুকরণে চারি প্রকারের অভিনয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাষা বা নাট্যাদির আত্মা বা জীবন স্বরূপ রসের ঠিক অনুরূপ বাক্যের আবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য, বেশভূষা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা ও সাত্ত্বিকতা হওয়া চাই। যেমন হাস্যরসের অভিনয়ে শোকসূচক বেশভূষা ও বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ করিলে অভিনয় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যে ব্যক্তিকে দেখিলেই হাসি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে তিনি যদি করুণ বা বীররসের অভিনয়ে অগ্রবর্ত্তী হ'ন তাহা হইলে সমুদায় নাটকখানি একেবারে মাটী হইয়া যায়। নট বা অভিনেতার কার্য্য অতি কঠিন। যেমন কবি শুদ্ধ বিদ্যার বলে হয় না, স্বভাবদত্ত প্রতিভা চাই, সেইরূপ অভিনেতাও কেবল শিক্ষায় হয় না, নিসর্গজ প্রতিভা চাই। এই কথাটি সঙ্গীতের অনুশীলনে সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বভাবদত্ত সুর ও মধুর স্বর না থাকিলে শত শিক্ষায়ও সুগায়ক হওয়া যায় না।

সেইরূপ স্বভাবপ্রদত্ত প্রতিভার অভাবে কেবল শিক্ষাপ্রভাবে সাধু অভিনেতা হওয়া যায় না। এই প্রতিভার মূল রসবোধ, সৌন্দর্য্যদর্শনক্ষমতা, স্বেচ্ছানুরূপ স্বরূপ পরিবর্ত্তন এবং অঙ্গাদির প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ক্ষমতা। যেমন সুসার মাটিতে সহজে অঙ্কুর উদগত হইলেও জল, বায়ু, আলো প্রভৃতির দ্বারা উহা ক্রমশঃ প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ স্বভাবদত্ত প্রতিভাবলে অভিনেতা হইলেও শিক্ষা, অভিনয়, সাধনা ব্যতীত একজন প্রকৃত অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনয়কলার ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তের অনুশীলনেও জানা যায় যে উহা কত শতাব্দীর সাধনার তাদৃশ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য, ও সাত্ত্বিক, অভিনয় কত শত বৎসরের অনুশীলনের ফল। প্রথমতঃ নৃত্য, গীত বাদ্য ও চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাগ্রে মানবচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়, তারপর এই সঙ্গীত ও অভিনয়ের কিরূপে অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সঙঘটিত হইয়াছিল, এবং পরিশেষে ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গের পরিপুষ্টি কত শত যুগের একপ্রাণ সাধনার ফল তাহার নির্ণয় দূরে থাক, ভাবিতেও চিন্তাশক্তি অক্ষম।

আমাদের দেশে একদিন সর্ব্ব কলার চরম বিকাশ হইয়া গিয়াছিল। উহার জন্য আমাদের বিদেশীর নিকটে গর্ব্ব করিবার অবসর আছে বটে, কিন্তু ইহার বেশী আর কিছুই নাই—প্রত্নকালের কলাচর্চ্চার আমাদের কিছুই বর্ত্তমান নাই। আমাদের আবার ঐ সব কলার পুনরায় মূল হইতে চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। সুদূর অতীতের শুদ্ধ গর্ব্ব ব্যতীত প্রদর্শনের আমাদের আর কিছুই নাই। সেই পুষ্পকবিমান, তিরস্করণীবিদ্যা, বাষ্পীয়শকট, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি এখন কেবল কতকগুলি পাণ্ডুলিপিগত দুঃস্বপ্ন মাত্র।

বর্ত্তমান নাট্যাভিনয়ও রঙ্গমঞ্চ ইয়োরোপীয় থিয়েটারের অনুকৃতিতে গঠিত। কিন্তু বর্ত্তমান উদীয়মান ইয়োরোপ ও আমেরিকা, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক মতে নাট্যাভিনয়ের অভ্যুন্নতিতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা কত আয়াসে ভারতের, গ্রীসের ও মিশরের সেইসব পুরাতন ছিন্ন, দুর্ব্বোধ্য পাণ্ডুলিপিগুলি আহরণ করিয়া তাহা হইতে দৈনন্দিন নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্বস্ব নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমরা আবার তাহাদের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির আনুকূল্যে নিজেদের ষ্টেজের দিন দিন উন্নতি সাধন করিতেছি।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে অভিনয় ও অভিনেতার বিভাগ অষ্টবিধ রসের বিভাগ অনুসারে হইত। কিন্তু ইয়োরোপে গ্রীসের পুরাতন বিভাগ অনুসারে উহাদের tragic, comic, tragi-comic এই তিন রকমের শ্রেণীভাগ হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের অভিনেতাই ইয়োরোপীয় নাট্য শাস্ত্রের tragic অভিনেতা, শৃঙ্গার, শান্ত ও হাস্যরসের অভিনেতা comic অভিনেতা এবং ইহাদের দুই শ্রেণীর পরস্পর মিশ্র রসের অভিনেতা tragi-comic অভিনেতা। স্থূলতঃ বিয়োগান্ত চরিত্রের অভিনেতাকে 'ট্রাজিক একটর' বলে, মিলনান্ত চরিত্রের অভিনেতাকে comic

actor এবং বিমিশ্র চরিত্রের অভিনেতাকে tragi-comic actor বলে। ইয়োরোপীয় হিসাবে এই তিন শ্রেণীর অভিনেতাদের মধ্যে আবার high, low এবং middle অর্থাৎ গুরু, নিম্ন ও মধ্য শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইয়োরোপীয় মতে high tragic, low tragic, middle tragic, high comic, low comic, middle comic, high tragi-comic, low tragi-comic এবং middle tragi-comic এই নয় শ্রেণীর অভিনেতা আছে। এই বিভাগ অনুসারে অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন অসাধারণ high comic অভিনেতা ছিলেন। শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্ত রসের অভিনয়ে তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। অতঃপর করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎসের কৌতুকানুকরণে একরূপ তাহার তুলনাই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তবিক কোন নাটকেই অবিমিশ্র tragic কিম্বা comic কোনও character ই বড় পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম শ্রেণীর প্রায় নাটকেই বিমিশ্র চরিত্রই পরিদৃশ্য হইয়া থাকে। তবে উহাদের মধ্যে যে ভাবের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিপুষ্টি চরিত্রটি সেই নামেই সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকে। নবীন তপস্বিনীতে "জলধর চরিত্র" অবিকল comic নহে। উহাতে tragic এরও touch আছে। তাহা হইলেও উহা comic চরিত্র বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। সেইরূপ দুর্গেশনন্দিনীর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্র' comic প্রধান বলিয়া comic বলিয়াই সর্ব্বত্র বিদিত। প্রফুল্লে 'যোগেশ' চরিত্রে কি comic কিছু নাই? তাহা সত্ত্বেও উহা একটি high tragic character, কি ট্রাজিক কি কমিক, উভয় চরিত্রেরই প্রকৃত অভিনয় বড়ই কঠিন। পরের চরিত্র নিজের ভিতর লইয়া ফুটাইয়া তুলিয়া দর্শককে অবিকল তাহা দেখান বড় কঠিন কার্য্য। তাই আমরা কলেজের অধ্যাপকগণ অপেক্ষা রঙ্গালয়ের অধ্যাপকগণের কৃতিত্বের অধিকতর সাধুবাদ করি। কলেজের অধ্যাপকগণ মাত্র তাঁহাদের সুবিদ্বান ছাত্রদিগকে দুর্ব্বোধ্য ভাবগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই চরিতার্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু রঙ্গালয়ের অধ্যাপকদিগকে নাটক চরিত্র সমূহ কতকগুলি অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত অভিনেতাকে বুঝাইয়া দিয়া উহাদের প্রতিচরিত্রের অবিকল অনুকরণ অভিনয়ে দেখাইতে হয়। রঙ্গালয়ে নাটকখানির জীবন্ত চিত্র আমরা পরিদর্শন করিয়া তন্ময় হইয়া যাই। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতির তাই এত প্রশংসা, এত সমাদর। প্রকৃত অভিনেতা স্বীয় অভিনয়ে প্রতিরসের জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত করেন বলিয়াই তিনি অনন্যসাধারণ, ক্ষণজন্মা বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি পাঠে পাঠকের চিত্তে যে ভাবের খানিকটামাত্র উন্মেষ হয়, অভিনয় দর্শনে তাহা পূর্ণোদ্বেলিত হইয়া লহরে লহরে সমস্ত চিত্ত-কন্দর ছাপাইয়া ফেলে। অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শক তন্ময় হইয়া যায়। তাই সমগ্র কাব্য সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের স্থান সর্ব্ব প্রথম। এসকাইলাস, সফক্লিস, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মোলিয়র, রেসিনি, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, কল্ডিরন প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যকারগণ বিশ্বপূজ্য, এবং তাঁহাদের দৃশ্যকাব্যগুলির জীবন্ত অভিনেতৃগণ বিশ্বের সাহিত্যিক সমাজে পরম বরেণ্য।

অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন ক্ষণজন্মা অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক। তাঁহার আকৃতি, বাক্য, গতি, চিন্তাস্রোত,—সকলই তাঁহাকে আবাল্য স্বভাবতঃ অভিনয়ের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেননা আজ কাল অভিনয় কার্য্য তত নিন্দার বলিয়া বিবেচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন প্রথমে অভিনয়কার্য্যে যোগদান করেন তখন উহা নিতান্ত নিন্দার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি তাঁহার উচ্চবংশাভিমান, পিতামাতার তিরস্কার, আত্মীয় স্বজনের নিবারণ, সমুদায় উপেক্ষা করিয়া প্রাণের আকর্ষণে স্বীয় জন্মজন্মান্তরের সাধিত অভিনয়ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ইংরাজি সাহিত্যাদিতে শিক্ষিত ছিলেন ও তাঁহার যেরূপ আত্মীয়স্বজন ছিলেন তাহাতে তিনি বিনায়াসে উচ্চ বেতনের কর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারিতেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাই তিনি অহর্নিশ নাট্যালোচনায়ই নিরত থাকিতে ভালবাসিতেন। নাট্য গ্রন্থখানি পাইলেই তিনি উহার চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে তন্ময় হইয়া যাইতেন, সময় সময় এমন হইত যে গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রোতা অর্দ্ধেন্দুর তদীয় নাটকীয় চরিত্রে অধিক দখল দেখা যাইত। গ্রন্থকার একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যেমন অসামান্য অভিনেতা ছিলেন, তাদৃশ অনন্যসাধারণ অভিনয়শিক্ষকও ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ও গিরিশচন্দ্রের পর আর আমরা নূতন চরিত্রের অভিনয় আদৌ দেখিতে পাই না। এক দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' ও 'চাণক্য' চরিত্র একেবারে অভিনব, ও অনন্যসাধারণ। তদ্ব্যতীত আর নূতন চরিত্র কোথায় নাই। যত সব নূতন অভিনয় হইতেছে, সর্ব্বত্র কেবল পুরাতনের ছাপ ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থাকারগণ যে নূতন চরিত্রের অবতারণা করিতেছেন না তাহা ঠিক বলা যায় না, বরং এক্ষণে অনেক সাহসিক নাট্যকারই বিলাতি নামকরা চরিত্রগুলির প্রকাশ্য অনুকরণে নূতন নাটকীয় চরিত্র স্বস্ব গ্রন্থে প্রদান করিতেছেন, কিন্তু উহাদের অভিনয়ে নূতনত্ব কিছুই বিকসিত হইতেছে না, সেই পূর্ব্বভাবই সর্ব্বত্র একটু সংস্কৃত হইয়া প্রদর্শিত হয় মাত্র।

ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল নাটকখানি দেখা, আর অভিনয়ের জন্য 'রিহার্স্যালে' ফেলিয়া দেওয়া। কোন চরিত্রের কিরূপ বিশ্লেষণে নূতনত্ব প্রদর্শিত হইবে, কিসে নাটকখানির অভিনবত্ব বজায় থাকিবে, তাহার প্রতি বড় কাহারও দৃষ্টি থাকে না।

কলেজের একজন অধ্যাপককে একখানি নূতন গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতে হইলে অনন্তঃ দুই কি এক মাস কাল প্রগাঢ় মনোনিবেশের সহিত উহার অধ্যয়ন আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান রঙ্গালয়ের অধ্যাপক মহাশয়দের একখানি নূতনগ্রন্থ পাইলে এমন কি ভাল করিয়া একবার পড়িয়া দেখিবারও প্রায় অবকাশ হইয়া উঠে না। গ্রন্থকার একদিন হয়তো পড়িয়া গেলেন, অমনি সব হইয়া গেল। গ্রন্থের মধ্যে চরিত্রগুলির পরস্পর সামঞ্জস্য, ভাষাবিবেক, দৃশ্যাদির ক্রমবিকাশ, ঘটনাসমাবেশ, মৌলিকত্ব কিছুরই প্রতি কাহারও নজর থাকে না। তাই আজকাল আর কেহ থিয়েটারে নাটকের অভিনয়

দেখিতে যান না, 'অপেরার' নৃত্যগীত ও দৃশ্যাদি দেখিতেই ভূরিপরিমাণে দর্শকসমাবেশ হইয়া থাকে। উহার চরমফলে কলিকাতায় বায়স্কোপ-আগার ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

'গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তাঁহাদের প্রথম জীবনের শিক্ষিত শিষ্যগণ অভিনয় কলায় যাদৃশী অভ্যুন্নতি করিয়া গিয়াছেন ক্রমশঃ দৈনন্দিন যদি তদনুরূপে উহার উন্নতি হইতে থাকিত তাহা হইলে এক্ষণে বাঙ্গালায় ষ্টেজ ভারতের অন্যত্র সর্ব্বত্র আদর্শ হইয়া যাইত। যাহারা জীবনপাত পরিশ্রমে রঙ্গালয়কে ললিতকলাশ্রম করিয়া তুলিতে ছিলেন তাঁহাদের অবসানে রঙ্গালয় আবার সেই 'নাচ ঘর' হইয়া যাইতেছে ভাবিতেও নাট্যানুরাগিমাত্রেরই চক্ষে জল আসে, প্রাণে দারুণ হাহাকার জাগিয়া উঠে।

এক্ষণে রঙ্গালয়ে বিপুল অর্থাগম হয়, এবং নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং কলাহিসাবে অভিনয়ের উন্নতি বিধান এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক। কিন্তু কেবল অলসতাপ্রযুক্ত যে সমাজাভ্যুদয়ের প্রধান উপাদান, সুসাহিত্য শিক্ষার মুখ্য আশ্রয়, রঙ্গালয় ক্রমশঃ দিন দিন 'নাচ ঘরে' পরিণত হইয়া যাইবে, ইহা কি নবীন দেশহিতৈষিগণের সবিশেষ ভাবিবার জিনিষ নহে? ঐক্য, সুশিক্ষা, সুচিন্তা, আত্ম-প্রসার, চিত্ত বৈশদ্য প্রভৃতিই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রধানতম কারণরূপে চিরদিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সমুদায় গুণাবলীর সুপ্রসারক্ষেত্রই রঙ্গালয়। সুতরাং রঙ্গালয়ের অভ্যুন্নতি দেশহিতৈষিবর্গের উপেক্ষণীয় নহে।

যেমন গাত্রালঙ্কার, সাজসজ্জা, বহির্বিজ্ঞাপনা প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক নহে, সেইরূপ দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও বহির্বিজ্ঞাপনা অভিনয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক নহে। যেমন গুণাবলিই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, সেইরূপ রসানুরূপ চতুর্বিধ অভিনয়ই নাটকের প্রকৃত পরিচায়ক। এই অভিনয়ে কেহ কেহ আবার স্বভাব স্বভাব বলিয়া ক্ষেপিয়া যান। তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে, অভিনয় একটী সুকুমার কলা, ঠিক স্বভাব নহে। অবস্থানুকৃতিই অভিনয়, অবস্থাকল্পনা নহে। অননুকরণ হইলেই তাহাতে কৃত্রিমতা কিছু কিছু থাকিবেই। অঙ্গসঞ্চালনার অনুকরণ, বাক্যের অনুকরণ, বেশভূষাদির অনুকরণ, সাত্ত্বিকতার অনুকরণ, সর্ব্বত্রই নকলে কৃত্রিমতার মিশ্রণ থাকিবেই। আবার অনুকরণের কৃত্রিমতা বড় কঠিন, বড় ক্লেশসাধ্য। বাস্তবিক চাষা না হইয়া একটি চাষার অবিকল অনুকরণ, প্রকৃত শোকার্ত্ত না হইয়া একজন সদ্যঃপুত্রে শোকার্ত্তের অনুকরণ কি কঠোর ক্লেশসাধ্য তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন জলধরের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন তখন বস্তুতঃই জলধরের জীবন্ত চিত্র দর্শকের নেত্রপথে বিরাজিত হইত। সেই চেহারা, সেই অঙ্গচালনা, সেই কথার স্বর,—সবই জলধরের। দর্শক তৎকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই 'হোঁদলকুতকুতের' আকৃতিতে পঞ্জর মধ্যে অবস্থিতি। বস্তুতঃ তৎকালে প্রকৃত দৃশ্য ব্যতীত রঙ্গালয় বলিয়া কোন দর্শকেরই মনে থাকিত না। আবার তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে বিদ্যাদিগ্গজের অভিনয়।

আমাদের মনে হয় অর্দ্ধেন্দু বিদ্যাদিগ্‌গজ বঙ্কিমকল্পনাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে যে মুস্তোফি মহাশয় দেহ, মন, বাক্য, এমন কি চেহারার উপরেও এতাদৃশ প্রভুত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমাদের দেশে গুণের প্রকৃত আদর নাই, তাই ঈদৃশ গুণবানের স্মৃতিস্তম্ভ অদ্যাপি, অন্ততঃ বাঙ্গালার রঙ্গালয়গুলিতেও পরম সমাদরে স্থান পাইল না। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে সব অভিনেতার জীবনী শত শত প্রকাশিত হইতেছে, যাহাদের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি ও স্মৃতিসভা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে, গুণপণায় তাঁহাদের কাহার অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখর উন ছিলেন তাহা আমরা জানি না। অথচ অদ্যাবধি তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক একখানি জীবনীও লেখার যোগ্য বিবেচিত হইতেছে না। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়—আমাদের কম মূঢ়তার পরিচয়?

আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর কমিক অভিনেতারই মৌলিক আদর্শ বর্ত্তমান আছে। যেমন—high comic এবং middle tragi-comic অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর, সেইরূপ middle comic এবং high tragi-comic, অভিনয়ে অমৃতলাল, আবার low comic এবং low tragi-comic অভিনয়ে অক্ষয়কুমার (হাস্যার্ণব)। তদ্ব্যতীত সংসারে 'মামা', বলিদানে 'রেমমামা' প্রভৃতি মিশ্র চরিত্রাভিনয়ে মন্মথনাথ (হাঁদুবাবু)। ইঁহাদের প্রত্যেকের অভিনয়ই মৌলিক, নিখুঁত এবং প্রথম শ্রেণীর। যেমন অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'জলধর' 'বিদ্যাদিগ্‌গজ', 'আবুহোসেন', 'বিক্রমাদিত্য', এমন কি 'বরুণচাঁদ' অননুকরণীয়, সেইরূপ অমৃতলালের 'গদাধরচন্দ্র', 'রমেশ', 'বিদূষক', 'নসীরাম', এমন কি খাসদখলের 'নিতাই', ইহাদের প্রত্যেকেই অনভিগম্য, আবার কাপ্তেন বেলের (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) 'অঘোর', 'ধীরব' অননুসরণীয়।

অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কেবল comic ভূমিকারই অভিনয় করিতেন তাহা নহে, তিনি 'যোগেশ' প্রভৃতি গুরুগম্ভীর ভূমিকারও অভিনয় করিয়াছেন। তবে তাঁহার comic অভিনয়ের অপ্রতিম যশোরবি tragic অভিনয়ের গৌরবচন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসন্তের পিককাকলী যেমন অপর সমুদায় সুস্বর পক্ষীর কুজনকে ঢাকিয়া দেয় সেইরূপ অর্দ্ধেন্দুর comic অভিনয়ের বিপুল মাধুরীস্রোত তাঁহার tragic অভিনয় যশোলহরী অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রগাঢ় অভিনয়ানুরাগ আদর্শস্থানীয়। রঙ্গালয়ই তাঁহার আবাস স্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অহোরাত্র তিনি নাট্যালোচনা, অভিনয়শিক্ষা নূতন নাট্যগ্রন্থের ভূমিকাগুলির কোনটীর কিরূপ, অভিনয় হইবে উহার চিন্তা, স্বরপরিবর্ত্তন সাধন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালন, কৌশলপ্রয়োগ, কোন অঙ্কে কিরূপ দৃশ্য ও পরিচ্ছদ হইবে উহার বিবেক অথবা রঙ্গালয়সংক্রান্ত নানাবিধ কথাবার্ত্তায় কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার শিক্ষা অচিন্তিতপূর্ব্ব ছিল না, এবং ক্ষুদ্র হইতে প্রধানতম কোনও অভিনেতারই তাহার ভূমিকার সম্যক শিক্ষালাভ ব্যতীত মুস্তোফী মহাশয়ের নিকট

নিস্তার ছিল না। সেই জন্যই অর্দ্ধেন্দুর আমোলে অভিনয় যেরূপ দোষশূন্য হইত এমন আর কখনও হয় নাই। তিনি প্রকৃতই অভিনয়সাধনা করিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে তাদৃশ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার নাট্যসাধনা ঈদৃশ প্রগাঢ় ছিল যে তিনি যে কোন নাট্যানুরাগী ব্যক্তিকে নিজের সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং থিয়েটারের অভিনেতৃবন্দই তাঁহার সমুদায় স্নেহের অধিকারী ছিল, এমন কি এই নাট্যসাধনার জন্য তিনি স্বগৃহ, স্ত্রী, পুত্র প্রায় সকলেরই সঙ্গ একরূপ ত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়ানিবাসী হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

১২৫৬ সালের ১০ই মাঘ বুধবার তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩১৫ সালে দুই পুত্র বিদ্যমানে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। উনষষ্টি বৎসর পূর্ণ না হইতেই এই মহানাট্য সাধকের ভবলীলা পূর্ণ হয়। গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখর অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসরের বড় ছিলেন এবং তিনি প্রায় ৬৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। রঙ্গালয়ের কর্ম্মে পরিশ্রমাধিক্য ও নিশাজাগরণে লৌহকঠোর স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরও পূর্ণকাল জীবিত থাকা সম্ভব হয় না। তাই বাঙ্গালার নাট্যশিল্পিদিগের কেহই পূর্ণকাল জীবিত থাকিতে পারেন নাই, অনেকেই ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেই ভবধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা সৃষ্টির প্রথম যুগে যে কয়েকটি নাট্যসাধকরত্ন রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে যদি বিধাতার প্রসাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বাণীর সেবা করিতে পারিতেন তাহা হইলে এক্ষণে রঙ্গালয়ে ঈদৃশ রঙ্গশিক্ষকের ও অভিনেতার অভাব হইত না। পুরাতন যুগের মাত্র একটি রত্নস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে ও বার্দ্ধক্যের পীড়নে তাঁহার নিকট হইতেও কেহ কোনও প্রকৃত সাহায্য পাইতেছেন না। আমাদের মনে হয় এখনও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া নব্যতন্ত্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের উপদেশগ্রহণ নিতান্ত কর্ত্তব্য। কেবল গ্রন্থপাঠে practical side of the play সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ সুদুঃসাধ্য। এখনও তাঁহার 'নিমচাঁদের' ভূমিকার অভিনয় যাহা হয় তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় আর দেখিবার ইচ্ছা থাকে না।

আমাদের এই উক্তির ব্যাখ্যা কেহ যেন অন্যরূপ না করেন। বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে অভিনেতা কেহ নাই তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। বস্তুতঃ ইদানীন্তন রঙ্গালয়ে উদীয়মান অভিনেতা অনেকেই আছেন, যাঁহারা পূর্ব্বের শিক্ষকের অধীনে কর্ম্ম করিলে হয়ত পূর্ব্বতনদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের অভিনেতা হইতে পারিতেন। কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষা ও পূর্ব্বের সেই শিক্ষার atmosphere-এর অভাবই আমাদের প্রধানতম বক্তব্য। যে অভিনেতা 'চাণক্য', 'সিরাজুদ্দৌলা' 'শিবাজী' প্রভৃতি অতি জটিল, সুকঠিন চরিত্রের অতি উচ্চাঙ্গের মৌলিক অভিনয় করিতে পারেন, যে অভিনেত্রী 'শৈবলিনী', 'আয়েষা', 'রামানুজ' প্রভৃতি সুজটিল নানাভাবময় চরিত্রের মৌলিক প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করিতে পারে, যাহার 'প্রমীলা', 'মর্জ্জিনা', প্রভৃতি নবভাবময় অভিনয় দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে

নিয়ত জাগরূক, যাঁহার 'দাদামহাশয়', 'সুধন' প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় এখনও সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই প্রাণে চিরজীবিত, তাঁহাদের মত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এখনও যখন বঙ্গরঙ্গালয়ে বিদ্যমান, তখন কে বলিবে যে রঙ্গালয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রী নাই? তবে ঐ সঙ্গে অবশ্য বলিতে হইবে যে এখন আর সে নাট্য সাধনা বা অভিনয়ের একাগ্রতা নাই, কেননা সেই সাধনা নিয়ত জাগরূককারী প্রকৃত-নাট্যসেবী শিক্ষক কেহ নাই। সে গিরিশচন্দ্র, সে অর্দ্ধেন্দুশেখর, সে অমৃত মিত্র, সে অমরেন্দ্র, সে কাপ্তেন বেল, সে কেদার চৌধুরী, সে ধর্ম্মদাস প্রভৃতি সর্ব্বস্বপণ নাট্যসেবিগণ আর ইহ জগতে নাই। সেই সাধনাযুগের যে একজন নাট্যসেবী বসু মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তিনিও কার্য্যতঃ অবসরপ্রাপ্ত। এদেশে কি আবার একদিন প্রকৃত নাট্যকলাসেবীর অভ্যুত্থান হইবে। না? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে সর্ব্বত্র দিন দিন বাঙ্গালা অভ্যুন্নতির অত্যুচ্চ শেখরে উঠিতেছে, কলাশ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয়ানুশীলনে কি বাঙ্গালা পশ্চাৎপদ থাকিবে? গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি আজীবন সাধনা কি তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত হইবে? কৃত্রিম বায়স্কোপ অভিনয় আসিয়া কি দেশ হইতে প্রকৃত কলার অনুশীলনের বিলোপ সাধন করিবে?

এখন আর রঙ্গালয়ের পূর্ব্বের মত অর্থাভাব নাই, দর্শক সংখ্যা দিন দিন আশাতীত বাড়িতেছে; সাজসরঞ্জামও দুষ্প্রাপ্য নহে, বিলাত ও আমেরিকা হইতে সহজেই সব জিনিষ সরবরাহ হইতে পারে; অভিনেতা ও অভিনেত্রীরও অভাব নাই, রঙ্গালয়ে কার্য্যগ্রহণ এখন আর নিন্দনীয় নহে; অভিনেয় গ্রন্থেরও অভাব নাই, প্রতি মাসেই ভূরি ভূরি নাট্যমালা প্রকাশিত হইতেছে। কেবল অভাব এক—সেই সাধনার, সেই উন্মাদনার, সেই অনুপ্রেরণার। সে সাধক নাই, সে জীবনগণ নাট্যসেবী নাই, তাই দিন দিন নাট্যাগার শুদ্ধ 'নাচঘরে' পরিণত হইতেছে, আর বায়স্কোপ আসিয়া নাট্য দর্শকের সংখ্যা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের মনে হয় বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকৃত নাট্যসেবীর আহরণ করা প্রতি রঙ্গালয়াধিকারীর কর্ত্তব্য। স্বদেশে তাদৃশ নাট্যকুশল শিক্ষকের অভাব হইলে বিদেশ হইতে আনাইয়া তাঁহার শিক্ষায় আবার কতকগুলির শিক্ষকের সৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যক। পুরাতনের অনুকরণে আর চলিবে না, নূতনের নিতান্ত দরকার, তাহা না হইলে রঙ্গালয়গুলি অচিরে চিত্রদর্শনাগারে পরিণত হইবে, বাঙ্গালার চির নাট্যকৌশল খ্যাতি একেবারে লোপ পাইবে। যেমন ক্রমে সঙ্গীতের খ্যাতি বাঙ্গালা হইতে একরূপে লোপ পাইয়াছে, সেইরূপ অভিনয়খ্যাতিও যাইবে।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অন্যান্য গতাসু নাট্যরথীদিগের জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথির মহোৎসব, প্রতি রঙ্গালয়ে হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি রঙ্গালয়ে উহাদের চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে বর্ত্তমান অভিনেতৃবৃন্দ নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। প্রতি নাট্যসেবীর সম্মুখে এই সব নাট্যধ্যাপকদিগের জীবনী উন্মুক্ত করিয়া কিরূপে তাঁহারা সুকঠোর নাট্যসাধনায় সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন তাহা অবগত করান নিতান্ত দরকার,

তাহা না হইলে কেবল জীবিকার জন্য অভিনেতা হইয়া অভিনেতাগণ না করিবেন রঙ্গালয়ের উন্নতি, না করিবেন নিজ জীবনের উন্নতি, শুধুই 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' অবস্থান করিবেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কমিক অভিনয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। বিবিধ কমিক ও ত্রিবিধ ট্রাজিকমিক অভিনয় সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমাদের দেশে অভিনয়ের ফটোরাখা হয় না, তাহা হইলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিভিন্ন ভূমিকার বিভিন্নাবস্থার ফটো দেখিয়া তরুণ অভিনেতৃবৃন্দ কত শিখিতে পারিতেন, এবং আমাদের দেশে অভিনয়কলা কত দুর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহাও জগতের নাট্যসেবীদের নেত্রপথে সংস্থাপিত করা যাইত। বিলাতী ও মার্কিণ দেশীয় অভিনয়সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জটিল চরিত্রাভিনয়ের বিশিষ্টাবস্থাগুলির চিত্র প্রদত্ত রহিয়াছে। উহাদ্বারা আমরা সেই সেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠার নমুনা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও 'জলধর', 'বিদ্যাদিগ্‌গজ', 'আবুহোসেন', 'বিক্রমাদিত্য', 'রড়া', প্রভৃতি ভূমিকার জটিল অংশের অভিনয় কালে যেরূপ মূর্ত্তি ও অঙ্গাদির অবস্থান দেখাইতেন উহাদের ফটো থাকিলে আমাদের যে কত উপকার হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্যক্রমে গিরিশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ সুধীগণ তাঁহার কতগুলি ভাবাবেশের ফটো তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমরা উহাদ্বারা তাঁহার অলোকসামান্য অভিনয় প্রতিভায় কথঞ্চিৎ প্রতীতি লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছি। তাঁহার নবরসের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অভিনয়ব্যবসায়িমাত্রেরই সাদরে অনুধাবনীয়। আমরা মনে করি ঐ ফটোগুলি ব্রমাইড এন্‌লার্জমেণ্টদ্বারা লাইফ সাইজ করাইয়া প্রতিরঙ্গালয়ে সংস্থাপিত করা উচিত। ভূগোল শিখিতে যেমন রিলিফ ম্যাপ চাই, বিজ্ঞান ও রসায়ন শিখিতে যেমন যন্ত্রাদি চাই, সেইরূপ অভিনয় শিখিতেও সর্ব্বাগ্রে প্রতিরসের আদর্শ চিত্র চাই। দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া অভিনেতা বুঝিবেন আদর্শচিত্রের কতটা নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছেন। প্রথম হইতে এইরূপ শিক্ষাদ্বারা অভিনেতা সহজেই বুঝিতে পারিবেন তিনি কোনশ্রেণীর অভিনয়ে দক্ষতালাভের প্রকৃত অধিকারী। বস্তুতঃ একজন স্বাভাবিক low comic অভিনেতা বহুচেষ্টাও একজন ট্রাজিক অভিনেতা হইতে পারিবেন না, বরং চ কমিক অভিনয়ের শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ তিনি middle comic ও শেষে high comic ও হইতে পারেন। তেমনি স্বাভাবিক একজন Low tragic অভিনেতা বহু আয়াসেও ভাল কমিক অভিনেতা হইতে পারিবেন না, বরং চ যত্নে ও শিক্ষায় তিনি হয়তো কালে একজন high tragic অভিনেতা হইতে পারেন। বিমিশ্রি tragi-comic অভিনেতা হওয়া আরও কঠিন। সাধারণতঃ আমরা নিম্নশ্রেণীর tragi-comic অভিনেতাই দেখিতে পাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, কাপ্তান বেল প্রভৃতির ন্যায় high tragi-comic actor বড়ই দুর্লভ। গিরিশচন্দ্র অপ্রতিম প্রতিভা ও সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি tragic,

কি comic, কি tragi-comic, সর্ব্বত্র তিনি সর্ব্বোপরিস্থিত অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক।

রঙ্গালয়ে একজন অভিনেতা একটি ভূমিকার একরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উহার অভিনয়ে সহৃদয় সুধীবৃন্দের নিকট বিপুল যশোলাভ করিলেন। রঙ্গালয়ের ভাষায় সে ভূমিকা তিনি 'জ্বালাইয়া' দিয়া গেলেন। বহুকাল পরে আবার সেই ভূমিকা আর একজন অভিনেতা উহার অন্যরূপ যোগ্যতার ব্যাখ্যা করিয়া অভিনয়ে তদ্রূপ বা তাহার চাইতে অধিক যশোলাভ করিতে পারেন। অভিনয়ের পরাকাষ্ঠার কোন ও ঠিক মাপকাঠি নাই। যেমন একটি প্রব্লেমের নানা উপায়ে সমাধান হইয়া থাকে, তেমনি একটি চরিত্রের বিবিধ উপায়ে ব্যাখ্যা হইতে পারে। তবে যাঁহার প্রণালী অধিকতর সামঞ্জস্যকর ও সহৃদয়হৃদয়গ্রাহী তিনি সে ভূমিকার শ্রেষ্ঠবিশ্লেষক বলিয়া কীর্ত্তিত। নাট্যসেবীমাত্রেই সেকসপীয়রের লেডি ম্যাকেবেথ চরিত্রের জটিলতা সম্বন্ধে সুপরিচিত। মিসেস সিডন্‌সের লেডি ম্যাকবেথের অভিনয় বিশ্ববিশ্রুত[১]। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘকায়ে লেডি ম্যাকবেথকে যেরূপ উৎকট চরিত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে ও তৎপরবর্ত্তিকালে সমুদয় শিক্ষিত জগৎ পরমসমাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সকলেরই বুঝিয়া ছিলেন লেডিম্যাক্‌বেথ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা ছবি মিসেস সিডন্ দেখাইয়া গিয়াছেন। তারপর যখন বহুদিন পরে সারাবার্ণার (Sara Barnhardt) একেবারে নূতন ভাবে লেডিম্যাকবেথ চরিত্রের বিশ্লেষণ স্বীর অভিনয়ে দেখাইতে লাগিলেন তখন সকলে একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। যখন লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় সারা পতিপ্রেমময়ী পতির উচ্চপদাভিলাষিণী রমণীরূপে রঙ্গমঞ্চে বিরাজ করিতে থাকিতেন, তখন তাহাকে সর্ব্বস্বার্থ পরিত্যাগিনী পতিস্বার্থে স্বার্থবতী দেখিয়া কে না চমৎকৃত হইয়াছেন? পতির হৃদয়ের উচ্চ হতে উচ্চতর হইবার অতিনিভৃত আশাবন্ধ তাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিদিত ছিল, সুতরাং পতিপ্রাণার পতির জীবনময় বাসনার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যই সব উত্তেজনা, সব অনুপ্রাণনা, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও স্বয়ং অনুতাপিনী অনুতাপদগ্ধ পতিকে প্রেমভরে সান্ত্বনা দিতেছেন। এই স্বপ্নবিচরণের দৃশ্যটিতে সারা শেষে এমন অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করিতেন যেন প্রেমময়ী পত্নী অতিযত্নে ভয়-কম্পিত পতির করধারণ করিয়া শয্যায় লইয়া যাইতেছেন। কি চমৎকার দৃশ্য। পূর্ব্বাপর কিরূপ সুসঙ্গত। অথচ মিসেস সিডন্‌সের অভিনয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই বলি প্রতিভাবলে বিভিন্ন অভিনেতা একই চরিত্রের বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণ প্রদান করিতে পারেন। আমাদের দেশেও এইরূপ পরিবর্ত্তন অভিনব নহে। ষ্টারথিয়েটারে যখন প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় হয় তখন গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর high tragic অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয়

(১) সুবিখ্যাত অভিনেতা কেম্বেলের জ্যেষ্ঠ তনয়া সারা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই ব্রেকণে জন্মগ্রহণ করেন। সারা বাল্য হইতেই, পিতার থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অভিনেতা সিডনস্ এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিসেস সিডনস নামে সর্ব্বত্র খ্যাত হন। জটিল নারীচরিত্রের ইনিই শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষক। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন ৭৬ বৎসর বয়সে ইনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনয়কৌশলে দর্শক বৃন্দের নিকটে অশেষ সাধুবাদ লাভ করিয়াছিলেন। দর্শকগণ বুঝিয়াছিলেন, অমৃতলালের অভিনয় যোগেশ চরিত্রের আদর্শ। ঈদৃশ অভিনয় আর কখনও হইবে না। অতঃপর কয়েক বৎসর পরে যখন মিনার্ভা থিয়েটারে ওষ্টারথিয়েটারে যুগপৎ প্রফুল্লের পুনরভিনয় হয়, তখন মিনার্ভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তাৎকালিক বয়স ও স্বরের পরিবর্ত্তন অনুসারে ঐ চরিত্রের এমন এক অভিনব উৎকৃষ্টতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন যে, অমৃত বাবুর বঙ্গবিখ্যাত চিত্তহারী স্বরমাধুর্য্য ও অভিনয়নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁহাকে গিরিশবাবুর নিকটে সম্পূর্ণ পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, ষ্টারের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রমেশের ভূমিকায় নাট্যচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অননুকরণীয় অভিনয়সত্ত্বেও প্রফুল্লে এবার ষ্টারকে মিনার্ভার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়া ছিল। ঐরূপ মিনার্ভার বিল্বমঙ্গলের পুনরভিনয়ে শ্রীমতী তিনকড়ি পাগলিনীর ভূমিকায়, সঙ্গীতে অনেক নিম্নে থাকিলেও, সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী ও গায়িকা গঙ্গামণিকে পরাজয় করিয়াছিল। গঙ্গামণি তাহার মধুর সঙ্গীতের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দর্শগণকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত বটে, কিন্তু তিনকড়ি গতি, চাহনি, ভাবোচ্ছ্বাস ও বাক্যভঙ্গীতে পাগলিনীকে নূতন জীবন দান করিয়া দর্শকবৃন্দকে তন্ময় করিয়া দিত। তাহার সঙ্গীত- দৌর্ব্বল্য কেহ বড়ো লক্ষ্য করিবারও অবসর পাইতেন না। গিরিশচন্দ্র শেষজীবনে তাঁহার কল্পিত অনেক চরিত্রেরই পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারে স্বীয় অভিনয়ে বিশ্লেষণ করিতেন। তাই তিনি তাঁহার 'অভিনয় ও অভিনেতা' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন—'যে কোন ভূমিকা যতই উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হউক না কেন সে ভূমিকাগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা। এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় করিতে গিয়া নিন্দনীয় হওয়াও শ্রেয়ঃ। ভূমিকাটি সুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্ট করা প্রতি নটের নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাবা খেলোয়াড়েরা, বলিয়া থাকেন 'ভাবিলেই চাল বাহির হয়।' আমরা নট, আমাদের কার্য্যও সেইরূপ, ভাবিলেই চাল বাহির হয়।' মূলতঃ শিক্ষকের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নটও চিন্তা করিলে পূরাতন ভূমিকারও অভিনব ভাবের বিপুল সমাবেশের বিষয় বাহির হয়। মূল রসগুলির সম্যক্ বোধ থাকিলে, চরিত্র যতই জটিল হউক না কেন উহার বিশ্লেষণ অসাধ্য হইবে না। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অদম্য উদ্যম ও মহতী চেষ্টায়, রায় দীনবন্ধু মিত্রের লালীবতী নাটকের সুদীর্ঘ, পয়ারচ্ছন্দে বদ্ধ কথাগুলিও বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে অতিসুন্দর, দর্শকচিত্তহারিরূপে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি গ্রন্থকার স্বয়ং উহার অভিনয় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার 'সধবার একাদশীর' অভিনয় হইতেও লীলাবতীর অভিনয়ের অনেক প্রশংসা করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ প্রতিভার গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। তাই অপ্রতিমপ্রতিভ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলিতেন—"অসম্ভব কথাটি মূর্খের অভিধানে দ্রষ্টব্য, প্রকৃত প্রতিভাবান ব্যক্তির নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই।"

পৃথিবীর সর্ব্বত্র কমিক অভিনয়ের মূল কোর্ট ফুল বা বিদূষক। এই কোর্ট ফুল বা

বিদূষক বিবিধ শ্রেণীর ছিল। কেহ কথায়, কেহ বেশবিন্যাসে, কেহ বা আকৃতিতে ও অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির সঞ্চালনে রাজা ও সদস্যগণের হাস্যের উদ্রেক করিয়া প্রীতি উৎপাদন করিত। এই বিদূষকগণ মনুষ্যজাতীয় হইয়াও পশুপ্রভৃতির ন্যায় জীবনধারণ করিত। ইহাদের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে মানবজাতি কেবল স্বস্ব প্রবৃত্তির ক্ষণিক চরিতার্থতার জন্য কতদূর যে হেয় ও নিন্দনীয় চরিত্র হইতে পারে তাহা অবগত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া বায়। অতিপুরাকাল হইতেই চীনদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ শিল্পকৌশলের জন্য বিখ্যাত। উহারা যেমন শিল্পকুশলী তেমনি আবার আচরণে মনুষ্যত্বশূন্য। উহারাই নানা দেশ হইতে বালক বালিকা নিঃস্ব পিতামাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কিংবা চুরি করিয়া, স্বদেশে লইয়া গিয়া ঔষধ প্রয়োগে তাহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া নানাবিধ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা উহাদের আকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এমন করিয়া গঠিত করিয়া তুলিত যে উহারা দর্শকমাত্রেরই হাসির উদ্রেক করিত। কেবল আকৃতিপরিবর্ত্তন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা সম্পাদনা করিয়াই এইসব নৃশংস চীনশিল্পিগণ ক্ষান্ত হইত না, ঔষধ প্রয়োগে বালকদের বুদ্ধিবৃত্তির গোলযোগ ও উচ্চারণশক্তির ও হানি করিয়া দিত। অতঃপর জাহাজে করিয়া দেশ দেশান্তর লইয়া গিয়া ভূপতি ও অভিজাতগণের নিকটে পশুপক্ষীর ন্যায় বিক্রয় করিত। এই ব্যবসায়িগণকে স্পেনিস ভাষায় কম্প্রাপেকেনো (Comprapequenos or Comprachios) অর্থাৎ শিশু-ক্রেতা বলিত। ইহারা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কুক্কুটের আওয়াজের মত করিয়া দিতে পারিত। তারপর শিক্ষা ও ঔষধ দ্বারা মানুষকে একরূপ কুক্কুটাচার করিয়া, বড়লোকদের নিকটে কুক্কুট বলিয়া বিক্রয় করিত। এইসব কুক্কুটাচার মানুষ বড়লোকদের বাড়ীতে প্রতিঘণ্টায় কুক্কুটের ন্যায় ডাকিয়া সময় নিরূপণ করিয়া দিত। আবার ইহারা অতিশিশুদিগকে মৃন্ময় পাত্রমধ্যে এমনভাবে স্থাপিত করিত যে গ্রীবার উপরিভাগ পাত্রের বহির্ভাগে থাকিত। তারপর আহারাদি দ্বারা উহাদের বর্দ্ধন করিত ও সঙ্গীত শিক্ষা দিত। ক্রমে ২।৩ বৎসর পরে বালকদের আকৃতি পাত্রের আকারের মত হইয়া যাইত। পরিশেষে যখন মনে করিত ঠিক হইয়াছে, তখন পাত্র ভগ্ন করিয়া বালককে বাহির করিয়া লইত। এই সব পাত্রাকার সঙ্গীতকারী বালক বহুমূল্যে রাজারা ক্রয় করিতেন। আবার একরূপ অস্ত্র ক্রিয়াদ্বারা উহারা শিশুদের গ্রন্থিগুলি এমন শিথিল করিয়া ফেলিত যে তাহাদের শরীর একেবারে অবশ ও বিকল হইয়া যাইত। অতঃপর এই শিশুগণকে ক্রমে ক্রমে অষ্টাবক্রের মত গঠিত করিয়া রাজাদের নিকটে বিক্রীত করিত। ইহারাই রাজসভায় বিদূষক হইয়া শোভা পাইত। মানুষের দেহের বিকৃতিকরণে ও বুদ্ধিবৃত্তির জড়তাসম্পাদনে ইহাদের মত নিপুণ আর কোন জাতিই ছিল না। অতি প্রাচীন কাল হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের ব্যবসায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমভাবে চলিত। ইহাদিগের দমনের জন্য ইয়োরোপে কতবার কত কঠোর দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু কেহই কিছুতে ইহাদের ব্যবসায় ক্ষীণ করিতে সমর্থ হন নাই। ছেলেধরাদের কথা এখনও এদেশে বর্ষীয়ান্‌গণ বিদিত আছেন। আরাকাণদেশীয়

মগগণ ও চীনদেশীয়দের সঙ্গে এই ব্যবসায়ে যোগদান করিত। নাট্যাভিনয়ের বিদূষকও এই বালক-বিক্রেতাদের বিরচিত বিকৃতাঙ্গের অনুকৃতি মাত্র। রাজচরিত্র প্রতিফলিত করিতে হইলেই তাঁহার মন্ত্রসচিব, সমরসচিব , ধর্ম্মসচিব, ব্যবহারসচিব প্রভৃতির ন্যায় নর্ম্মসচিবের চিত্রও প্রতিফলিত করিতে হইত। অবশ্য রাজসভার প্রকৃত নর্ম্মসচিব বা বিদূষক প্রায়ই এই সব কমপ্রেসিকোদের বিরচিত মনুষ্য পশুগুলিই থাকিত। কিন্তু থিয়েটারে যাহারা অভিনয় করিত তাহারা ইহাদের অনুকরণ করিত মাত্র। কমিক অভিনয়ে এই বিদূষক জাতীয় চরিত্রই নায়কের প্রধান সহচর, সুতরাং উহার অভিনয়ের উপর নাটকের কৃতকার্য্যতার অনেকটা নির্ভর করিত। বিদূষক চরিত্রের অঙ্গবিকার, বাক্যবিকার, গতিবিকার ও বেশাদিবিকারের প্রদর্শন বড় সহজ ছিল না, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদূষকের ব্যাখ্যানে লিখিত আছে—

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাত্ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ।।

অর্থাৎ বিদূষকের পুষ্প কিংবা বসন্তাদি মধুর ঋতুর নামে নাম থাকিবে; সে কার্য্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বেশভূষা ও ভাষায় হাস্যকর হইবে; তাহার সর্ব্বদা কলহে (অবশ্য কৃত্রিমকলহে) আমোদ হইবে; সর্ব্বোপরি সে স্বকর্ম্মজ্ঞ অর্থাৎ মিষ্টান্ন, লাড্ডু, মতিচুর প্রভৃতি ভোজনে পরম পটু হইবে। বিদূষকের প্রযোজ্য ভাষাবিচারে আলঙ্কারিকগণ পূর্ব্বদেশীয় ভাষার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বিদূষকটি হাস্যরসের পূর্ণাবতার হইবে। বস্তুতঃ যে নমুনা হইতে নাট্যাদিতে বিদূষকচরিত্র গৃহীত হইত, তাহা সর্ব্বতোভাবে হাস্যরসের অবতারই ছিল। চীনদেশীয় কারিগরের হস্তে ভগবানের বিরচিত মানুষটি একেবারে আকারে, গতিতে, উচ্চারণপ্রণালীতে, কর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃতপক্ষে হাস্যরসের অবতার রূপেই পরিণত হইয়া যাইত। সে যে কলহ করিত তাহাও হাস্যময় ছিল। তাহার মূর্খতাও কেবল হাস্যেরই উদ্রেক করিত। ঈদৃশ সচিব বিবিধ কর্ম্মক্লান্ত নরপতির পক্ষে অবকাশকালে বড়ই গ্লানিহর এবং প্রীতিপদ হইত। অদ্যাপি রাজাদের অভিজাতগণের সভায় একটি করিয়া ভাঁড় বিদ্যমান। দাসদিগের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দাসব্যবসায় উঠিয়া গিয়া এক্ষণে স্বভাবজ বিদূষকগণই ভাঁড়রূপে বিরাজিত।

হাস্যরসের উদ্ভাবনা সম্বন্ধে প্রবীণ হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়া গিয়াছেন—"হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্‌টাইয়া আঁকা, আর এক তাহাকে একটু অধিক দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত, অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণ রসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর। হা হা হা হা করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া হাসানোর ভাঁড়ামি এবং ওগো মাগো করিয়া বা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্য মাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণগানমাত্রই ন্যাকামি নহে। স্থানবিশেষে উভয়ই উচ্চ সুকুমারকলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র।"

বস্তুতঃ অসৎ কবির রচনার প্রাচুর্য্যে যেরূপ এক সময়ে সুধী সমাজকে বলিতে হইয়াছিল 'কাব্যালাপংশ্চ বর্জয়েৎ', সেইরূপ অসৎ কবি ও অসৎ অভিনেতার অশ্লীল অভিনয়ের প্রাচুর্য্যে সহৃদয় দর্শকগণকে বলিতে হইয়াছিল 'হাস্যাভিনয়াংশ্চ বর্জয়েৎ।' প্রকৃত কবির নাট্যগ্রন্থের কোথায়ও হাস্যাভিনয়ে শ্লীলতার বহির্ভূত কিছুই নাই। কালিদাসের বিদূষক সর্ব্বদা হাস্যের মূর্ত্তি হইয়াও কখন শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু হাস্যার্ণবে: অধম কবির অক্ষম হস্তে হাস্য অশ্লীলতা পরিপূর্ণ হইয়া অধমাধম হইয়াছে। বাঙ্গালানাট্যেও দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা ক্ষীরোদপ্রসাদের হস্তে হাস্যরস সহৃদয় উপভোগ্য রহিয়াছে।*

প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারগণ হাস্যরসের বড় একটা প্রাধান্য দেন নাই। কিন্তু মৃচ্ছকটিক কার হইতে সর্ব্বত্র সংস্কৃত নাটকে হাস্যরসের প্রাধান্য পরিদৃশ্যমান। ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্‌সপীয়রই স্বীয় নাটকে হাস্যের স্থান অতি উচ্চ করিয়া তুলেন।

এজগতে বৈচিত্র্য ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ্য নহে। 'গাম্ভীর্য্যের' পার্শ্বে 'হাস্য' এবং 'হাস্যের' পার্শ্বে 'গাম্ভীর্য্য' ব্যতীত ইহাদের কোনটিরই সৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট হইবার নহে। যেমন আহারে কেবল পলান্ন, কারি, কোপ্তা প্রভৃতি ভোজন করা যায় না, চাটনি প্রভৃতি উহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ নাট্যাদিতে কেবল গুরুগম্ভীরভাবের উপভোগ অসম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে হাস্য, কৌতুক, রহস্য প্রভৃতির নিতান্ত প্রয়োজন। তবে গুরুভাব যেমন সহজে ফোটে, হাস্য কৌতুক তত সহজে ফোটে না। প্রকৃতহাস্যরসিক অভিনেতা দুর্লভ। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্দ্ধাদিক সফলতা বিদূষকের চরিত্রাভিনয়ের উপর নির্ভর করে। প্রফুল্ল নাটক 'মদন দাদা', 'কাঙ্গালীচরণ' ও 'জগমণি' চরিত্রের প্রকৃত অভিনয় ব্যতীত আদৌ জমিবে না। বিদূষকের চরিত্রের ঠিক অভিনয় হইত না বলিয়াই শেষে শ্রীমতী তিনকড়ি জনার অভিনয়ে তাদৃশ দর্শকাকর্ষণ করিতে পারে নাই। নলদময়ন্তী নাটকে বিদূষকের তাদৃশ সুরম্য অভিনয় না হইলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ও শ্রীমতী বিনোদিনী তাদৃশ অভিনয় দ্বারাও উহা জমাইতে পারিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীতে মুস্তোফীমহাশয় বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা গ্রহণ না করিলে তাদৃশ আদর্শ ওসমান্ ও আয়েষার অভিনয়েও উহা জমিত না। অর্দ্ধেন্দুর অবসানে আর দুর্গেশনন্দিনী কখনও জমে নাই। 'হারানিধি' নাটকখানি এক কাপ্তান বেলের (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) অকাল মৃত্যুতে বন্ধ হইয়া গেল। অনেককাল পরে অমরেন্দ্রনাথ আবার কিছুদিন উহার বেশ অভিনয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে উহা চিরতরে বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল। নাট্যাভিনয়ে কমিকের অংশ কোন মতেই হেয় বা উপেক্ষ্য নহে। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে উহারা উপেক্ষা হইয়াই অনেক সময় নাট্যাভিনয় অনুপভোগ্য করিয়া তুলিয়া থাকে।

* বর্ত্তমান অভিনয়ে যে দুই এক স্থলে অশ্লীলতা প্রকটিত হয়, উহা অভিনেতার অক্ষমতার পরিচায়ক, নাট্যকারের নহে, কেননা অনেক অক্ষম অভিনেতার ধারণা অশ্লীলতা কমিক অভিনয়ের একটি প্রধান অঙ্গ।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কমিক অভিনেতাদের রাজা ছিলেন, ট্রাজিক অভিনয়েও তিনি ঊন ছিলেন না। সুতরাং নাট্যসাম্রাজ্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চ তাহা নাট্যামোদিমাত্রেরই সুবিদিত।

সম্প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে প্রকৃত tragic অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের অবসানে একেবারে লুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত comic অভিনেতা বুঝি অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহার শিক্ষিত যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় কমিক অভিনেতা বর্তমান, তাহাদের অবসানে নূতন আর কোথাও একটি প্রকৃত comic অভিনেতা মিলিবে না। এক্ষণে নব্যতন্ত্রে কমিক অভিনয় আর বুঝি শ্রদ্ধেয় বলিয়া একেবারে গণ্য নহে, তাই যে সে আসিয়া কমিক ভূমিকায় দাঁড়ায়। তাহাদের বোধ হয় ধারণা যে কোনও প্রকারে হাসাইতে পারিলেই কমিক অভিনয়ে কৃতার্থতা লাভ হইল। সঙ্গীতে সর্ব্বপ্রথমে কমিক প্রবেশয়িতা নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের জীবদ্দশাতেই যে তাঁহার উদ্ভাবিত প্রথমশ্রেণীর হাস্যগীতিগুলি ঈদৃশ অপগীত হইবে ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! দ্বিজেন্দ্রলাল পরপারে বসিয়া তাঁহার চির নূতন অফুরন্ত হাসির ডালা 'কৌতুক সঙ্গীতমালা' যে এরূপ অপগীত হইতেছে তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিতেছেন না। বঙ্গরঙ্গালয়ে সর্ব্বাগ্রে হাস্য রসাভিনয়ের সুশিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। রোহিত মৎস্যের কালিয়া একটু খারাপ হইলেও নিতান্ত অখাদ্য হয় না, কিন্তু 'চাটনি', 'ডাল' প্রভৃতি ভাল না হইলে একেবারে অখাদ্য হইয়া থাকে এবং উহারই জন্য সমুদায় ভোজন ব্যাপারের নিন্দা হয়। দৃশ্যাদির সংস্কারের অপেক্ষাও কমিক অভিনয় সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর কমিক অভিনয়ের যেমন উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান কমিক অভিনয় ততদূর উপেক্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অশ্বঘোষ, ভাস হইতে আরম্ভ করিয়া মার্লো, বেনজন্সন্, সেক্সপীয়ার, গ্রীণ, মোলিয়র, রেসিনী প্রভৃতি মহাকবিদের মুক্তাত্মা কমিক অভিনয়ের ঈদৃশ অধঃপাত দেখিয়া নিশ্চয়ই দুঃখে ও ক্ষোভে অশ্রুপাত করিতেছেন। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্বর্গত আত্মা তাঁহাদের প্রাণপাত সাধনার কমিক অভিনয়ের ঈদৃশ অপব্যবহারে নিশ্চয়ই শান্তিতে নাই।

সমাপ্ত